মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ

মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ

মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ

সংগ্রহ ও সম্পাদনা
দিলওয়ার হোসেন

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
অগ্রহায়ণ ১৪০১
ডিসেম্বর ১৯৯৪

বাএ ৩১৪০

পাণ্ডুলিপি
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
পরিচালক
গবেষণা সংকলন ফোকলোর বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১০০০

মুদ্রাকর
আশফাক-উল-আলম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা-১০০০

প্রচ্ছদ
উৎপল দাস

মূল্য
ষাট টাকা মাত্র

MUHAMMADI PATRIKAYA MUSLIM SHAMAJ [Role of the Muhammadi magazine for Muslim community]. Collected and edited by Dr. Dilwar Hossain. Published by Shamsuzzaman Khan, Director, Research, Compilation and Folklore Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First edition : December 1994. Price : Taka 60·00 only.

ISBN 984-07-3149-1

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার প্রথম শিক্ষক পরম শ্রদ্ধেয়
'টাঙ্গাইলে বুলবুল'
হাফেজ মোহাম্মদ আব্দুল্লাহর
পবিত্র করকমলে

www.pathagar.com

ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রদত্ত গবেষণা প্রকল্পের অধীনে 'মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় সমাজ ও সাহিত্য' বিষয়ে আমি প্রথমে কাজ শুরু করি ১৯৮৭ সালে। কিন্তু প্রকল্পটি সম্পন্ন করতে গিয়ে দেখলাম এর শিরোনামের আংশিক পরিবর্তন প্রয়োজন। এ কাজের সময়সীমা পূর্বে ছিল ১৯০৩ থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত। সঙ্গত কারণে এরও সংশোধন করতে হয়েছে। বর্তমানে কাজটির বিষয় দাঁড়িয়েছে "মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ (১৯২৭-১৯৪৭)"।

১৯০৩ সালে ১৮ আগস্ট কলকাতা থেকে মোহাম্মদ আব্বাস আলী কর্তৃক মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকা মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে পত্রিকার স্বত্বাধিকারী হন হাজী আবদুল্লাহ। পঞ্চম সংখ্যার (১৯ জানুয়ারি, ১৯০৪) পর এই পত্রিকা আর বেরিয়েছিল কিনা জানা যায় না।[১]

১৯০৮ সালে মোহাম্মদী পত্রিকা সাপ্তাহিক হিসেবে কলকাতা থেকে আকরম খাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। পরে নাজির আহমদ চৌধুরী ও মোহাম্মদ খায়রুল আনম খাঁ যথাক্রমে পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পাকিস্তান লাভের পরও কলকাতায় এর প্রকাশ অব্যাহত ছিল।[২]

১৯২২ সালে কলকাতা থেকে মোহাম্মদ আকরম খাঁর সম্পাদনায় 'মোহাম্মদী' দৈনিক পত্রিকারূপে আত্মপ্রকাশ করে।[৩]

১৯২৭ সালে ৬ নভেম্বর (কার্তিক ১৩৩৪) খায়রুল আনম খাঁ কর্তৃক মোহাম্মদী প্রেস, ২৯ আপার সার্কুলার রোড, কলকাতা থেকে মোহাম্মদী মাসিক সাহিত্যপত্র হিসেবে নব পর্যায়ে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ আকরম খাঁ অপরিবর্তিত থাকেন। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, পূর্বের কোন সংখ্যাকে প্রথম ধরে ১৯২৭ সালের সংখ্যাকে দ্বিতীয়-তৃতীয় বা চতুর্থ-পঞ্চম কিংবা ষষ্ঠ-সপ্তম বলে গণ্য করা হয়নি। প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ঃ কার্তিক ১৩৩৪—এভাবে নব পর্যায়ের মাসিক মোহাম্মদী প্রকাশ লাভ করে। মনে হয়, সম্পাদক আগের সংখ্যাগুলির তেমন গুরুত্ব দেননি। বর্তমানে সেগুলি দুষ্প্রাপ্য, আমাদেরও দেখার সৌভাগ্য হয়নি। ভারত-বাংলাদেশে কোথাও নেই। ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী, লন্ডনে সংখ্যাগুলি সংরক্ষিত আছে বলে সেখান থেকে খবর পেয়েছিলাম। কিন্তু শত চেষ্টা করেও তা সংগ্রহ করতে পারিনি।

www.pathagar.com

১৯২৮ সালে ডিসেম্বর মাসে নিয়মিত মাসিক মোহাম্মদী ছাড়াও বার্ষিক সংখ্যারূপে কলকাতা থেকে আর একটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এটি সম্পাদনা করেন মোহাম্মদ খায়রুল আনম খাঁ। বর্তমান গ্রন্থে এ সংখ্যা থেকেও প্রয়োজনীয় অংশ সংকলন করা হয়েছে। মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী দীর্ঘকাল স্থায়ী হয়। মাসিক মোহাম্মদী তাঁর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে আমৃত্যু (১৯৬৮) প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলা ভাষায় আর কোন সাময়িকপত্র এত দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। বাঙালি মুসলিম সমাজে মোহাম্মদী পত্রিকা বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছিল।

বাঙালি মুসলিম মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশের ক্ষেত্রে মুসলমানদের দ্বারা সম্পাদিত যে সকল পত্র-পত্রিকা বা সাহিত্য সাময়িকী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে, 'মাসিক মোহাম্মদী' তার মধ্যে অন্যতম। আঞ্জীজন নেহার (১৮৭৪), ইসলাম (১৮৮৫), সুধাকর (১৮৮৯),হিতকরী (১৮৯০),মিহির (১৮৯২),হাফেজ (১৮৯২), মিহির ও সুধাকর (১৮৯৫), নবনূর (১৯০৩), মোসলেম প্রতিভা (১৯০৭), আল-এসলাম (১৯১৫), সওগাত (১৯১৮), মোসলেম ভারত (১৯২০), শিখা (১৯২৭), সমকাল (১৯৫৭) প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার পাশে 'মোহাম্মদী' সগৌরবে আসন লাভ করেছে। মাসিক মোহাম্মদী ছিল মুসলিম সমাজের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। বাঙালি মুসলমানদের অতীত কখনো অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না। তুর্কী-পাঠান-মুঘল যুগে বহু বিদ্যোৎসাহী মুসলমান রাজা-বাদশাহ এ দেশ শাসন করেছেন। যে অকল্যাণকর ও অশুভ চক্রান্তে তাঁদের স্বাধীনতা হারাতে হয়েছিল, তা পুনরুদ্ধার করতে প্রায় দুইশত বছর কেটে গেছে। উনিশ শতকে আধুনিককালে মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ যে তাদের প্রতিভার দীনতা নয়, বিশ শতকের প্রথমার্ধে তা প্রমাণিত হয়েছে। এ বিষয়ে পরে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মোহাম্মদী পত্রিকার পাতায় পাতায় মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান, মুসলিম দর্শন, ইতিহাস-ভূগোল-চিকিৎসা, সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির ব্যাপক পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। বর্তমান কর্মে মুসলিম সমাজ-মানসের ও সামাজিক জীবনের যে সকল ইতিবৃত্ত সংকলন করা হয়েছে, এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

১৯২৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সংকলন-কাজ সীমিত করার কারণ মোহাম্মদী পত্রিকার আদর্শ ও উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টিকে চিহ্নিত করা। পত্রিকাব অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক যুগোপযোগী করে ইসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা প্রদান। অপরপক্ষে, মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্য চেতনার উজ্জ্বল ক্ষেত্র তৈরি করেছিল এই পত্রিকা, যা পাকিস্তান অর্জনের মধ্যদিয়ে ফলপ্রসূ হয়েছিল। ধর্মীয় ও সামাজিক বিতর্কে মাসিক মোহাম্মদী মধ্যপন্থা অবলম্বন করে। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর উদার ও প্রগতিশীল ভূমিকাও কম লক্ষ্যযোগ্য নয়। ইংরেজ শাসনামলের শেষের দিকে এই পত্রিকা মুসলিম সমাজকে সুসংহত করেছিল। ১৯২৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বিশ বছরের যুগকে মোহাম্মদী পত্রিকার স্বর্ণযুগ বলা যায়।

বাংলা সাময়িকপত্রের প্রথম ইতিহাসকার হিসেবে রেভারেন্ড জেমস লঙ-এর নাম স্মরণীয়। তিনি A Descriptive Catalogue of Bengali Works (1855) গ্রন্থে

www.pathagar.com

Periodicals Newspapers অধ্যায়ে এ দেশের সাময়িকপত্রের তালিকা লিপিবদ্ধ করে গেছেন। ১৮১৬ থেকে ১৮৫৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত ৩০৮টি পত্র-পত্রিকার নাম এই তালিকায় স্থান পেয়েছে। বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশনার ইতিহাসে প্রথমেই তিনি লক্ষ্য করেছেন 'the love of something new' exists among the Bengalis as among the Athenians of old.[৪] নতুনত্বের প্রতি এই আকর্ষণ বাঙালি হিন্দু-মুসলিম সমাজকে যুগে যুগে প্রগতির পথে চালিত করেছে। ১৮১৬ সালে প্রকাশিত Bengal Gazette—এদেশের প্রথম সংবাদ পত্র এবং ১৮১৮ সালে এপ্রিল মাসে প্রকাশিত দিগদর্শন (মাসিক) প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র। ১৮১৮ সালে মে মাসে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' বাংলা প্রথম সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। জেমস লঙ্-এর তালিকার মত ক্যালকাটা গেজেটের পরিশিষ্টে মুদ্রিত হত বেঙ্গল লাইব্রেরীর ক্যাটালগ। এই ক্যাটালগে ১৮৬৮ সাল থেকে প্রতি বছর প্রকাশিত গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকার বিবরণ থাকত। ১৯১৭ সালে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত বাংলা সাময়িক পত্রের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস প্রণয়ন করেন কেদারনাথ মজুমদার। তাঁর গ্রন্থের নাম 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য'। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে কৃতিত্বের দাবিদার ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর 'বাংলা সাময়িকপত্র' (১ম, খণ্ড, ১৩৪২; ২য় খণ্ড, ১৩৫৮) গ্রন্থে উনিশ শতকের সহস্রাধিক পত্র-পত্রিকার পরিচয় লিপিবদ্ধ হয়েছে। সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (দুই খণ্ড) গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উন্মেষ যুগের (১৮১৮-১৮৪০) সংবাদপত্রের প্রয়োজনীয় অংশের সংকলন করেন। বিণয় ঘোষ তাঁর অনুসরণে বিশাল পরিকল্পনা নিয়ে পাঁচ খণ্ডে রচনা করেন 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (১-খ ১৯৬২, ২-খ ১৯৬৩, ৩-খ ১৯৬৪), ৪-খ ১৯৬৬, ৫-খ ১৯৬৯)। সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বেঙ্গল স্পেক্টটর, সম্বাদভাস্কর, সর্বশুভকরী পত্রিকা, বিদ্যাদর্শন ও সোমপ্রকাশ পত্রিকার নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ বিভিন্ন খণ্ডে সংকলিত হয়েছে।

মুসলমান সম্পাদিত বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাস রচনায় প্রথম এগিয়ে আসেন আবদুল কাদির। তাঁর 'মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র' (১৯৬৬) গ্রন্থে মোহাম্মদী, আখবার,হিতকরী, মিহির, মিহির ও সুধাকর, হাফেজ, কোহিনুর, প্রচারক, নবনূর, আল-এসলাম, মোসলেমভারত, ধূমকেতু প্রভৃতি সাময়িকপত্রের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। ড: আনিসুজ্জামান রচনা করেছেন 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' (১৯৬৯)। এতে ১৮৩১ সালে বাঙালি মুসলমান সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্রিকা 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' থেকে শুরু করে ১৯৩০ সালে প্রকাশিত 'সেবকের বাণী' পর্যন্ত ১৪০টি পত্র-পত্রিকার নির্ভরযোগ্য ও তথ্যবহুল আলোচনাসহ তালিকা প্রণীত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাসমূহের সূচি ও গুরুত্বপূর্ণ রচনাংশের উদ্ধৃতি সংকলিত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এ বিষয়ে এটি একটি আকরগ্রন্থ। মুসলমান আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে ড: আনিসুজ্জামান গ্রন্থের যে ভূমিকা রচনা করেছেন তা মুসলিম-মানসের সঠিক মূল্যায়ন ক্ষেত্রে এক ঐতিহাসিক প্রতিবেদন। ড: মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' (১৯৭৭) আর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সংবাদপত্রে

www.pathagar.com

বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থের পরিকল্পনা মতে মুস্তাফা নূরউল ইসলাম বাঙালি মুসলিম জনমতের বিকাশধারা মুসলিম সম্পাদিত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় কিভাবে ধরা পড়েছে তার চিত্র তুলে ধরেছেন। উনিশ শতক থেকে শুরু করে প্রধানত বিশ শতকের প্রথম তিন দশক (১৯০১-১৯৩০) পর্যন্ত তাঁর সংকলন-কাজ সীমাবদ্ধ ছিল। বর্তমান গ্রন্থের প্রয়াস এর পরের থেকে। মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকায় বিধৃত মুসলিম সমাজ (১৯২৭-১৯৪৭) জীবনের নানাদিক তুলে ধরাই আমাদের লক্ষ্য।

আলোচ্য বিশ বছরের মধ্যে মোহাম্মদী পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মুসলিম সমাজ যেভাবে অগ্রসর হয়েছে কালানুক্রমিকভাবে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পত্রিকার মূল পাঠ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পাঠ করে সঙ্কলিত অধ্যায়ের শিরোনাম নির্ধারণ করা হয়েছে। বিষয়সূচির শিরোনামগুলি সম্পাদকের দেওয়া। এর একেকটি শিরোনামে তৎকালীন মুসলিম সমাজের মানস-প্রবণতার একেকটি চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এতে সুবিধে হয়েছে এই যে, বিষয়সূচি থেকেই এক নজরে ক্রমঅগ্রসরমান মুসলিম সমাজের নানা ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। সামাজিক চিত্রগুলি চিহ্নিত করে তার শ্রেণীকরণ করা যেত। কিন্তু বর্তমান সম্পাদক সে দিকে না গিয়ে সময়ানুক্রমিক অভিঘাতে সামাজিক সমস্যাগুলি কিরূপ পরিগ্রহ করেছে সে দিকেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। যেমন, বিশ শতকের তৃতীয় দশকে মুসলিম সমাজে ঐক্যের ভাবনার যে সংকট দেখা দেয় মোহাম্মদী পত্রিকায় তা কেমনভাবে আলোচিত হয়েছে তা খুঁজে বের করে সংকলন করা হয়েছে। এ সময়ে নারীর সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও মর্যাদা নিয়ে নানা তর্ক-বিতর্ক উঠেছে। পর্দা প্রথা ও অবরোধ প্রথা নিয়ে তুমুল বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। বেগম রোকেয়া যে অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করেছেন তার সমর্থনে ও বিপক্ষে বহু আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ স্বয়ং ইসলামের আলোকে নারীর অধিকার ও মর্যাদার কথা হাদিস-কোরান দিয়ে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন।

তখন শিক্ষা গ্রহণ করা মুসলিম সমাজের একটি বড় সমস্যা ছিল। নারী শিক্ষার সমস্যার পাশাপাশি জনসাধারণের শিক্ষারও তেমন ব্যবস্থা ছিল না। ইংরেজি শিক্ষার প্রতি মুসলিম সমাজের অবহেলার কারণে মুসলমানরা কিভাবে হিন্দুর তুলনায় পিছিয়ে পড়েছিল তারও বিবরণ আমরা মোহাম্মদী পত্রিকায় দেখতে পাই। মিসেস আর. এস.হোসেন (বেগম রোকেয়া) এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এবং মুসলিম সমাজের অগ্রগতির স্বার্থে ইংরেজি শিক্ষাকে অনিবার্য জ্ঞান করেছেন। সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব পরিহার করে প্রগতিবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে তিনি উপদেশ দিয়েছেন।

হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক বিরোধের সমস্যা চিরকালের। এই বিরোধের ফলে ইংরেজ শাসকচক্র লাভবান হয়েছে। সুযোগমত ইংরেজরাই সেজন্য ষড়যন্ত্র করেছে। মোহাম্মদী পত্রিকায় সে সকল ষড়যন্ত্রের কথা প্রমাণপঞ্জিসহ বর্ণিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির বাণী প্রচার করেছেন। কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন সমন্বয়ধর্মী চেতনার কবি। স্বরাজ আন্দোলনে ইংরেজ বিরোধী চেতনা এভাবে দানা বেঁধে ওঠে।

www.pathagar.com

অনেকে আবার ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের উদ্ধৃতি দিয়ে স্বাধীনতাকামী ঐক্যের পথ প্রশস্ত করে তোলেন।

স্বাধীনতার প্রশ্নে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী ১৩৩৪ সনের (১৯২৭) মোহাম্মদী পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায়(পৌষ) 'এছলাম ও শাসন-অধিকার' শিরোনামে এক মননশীল প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি দেখাতে চান যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ইসলাম ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি এ কথাও প্রচার করেন যে, রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ ঈমানের অঙ্গ এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনে বিমুখ থাকা ইসলাম ধর্মে মহাপাপ। পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করার জন্য ইসলাম ধর্মের বজ্রকঠোর নির্দেশ রয়েছে। আমরা বলতে চাই যে, এ সময়কার মুসলিম সমাজে শুধু দ্বিজাতিতত্ত্বের কাঠ-খড়ি সংগ্রহ করা হয়নি পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়ারও একটা উদগ্র আকাঙ্ক্ষা সমাজে বিরাজমান ছিল। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদীর রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। সমাজের 'কাটমোল্লা ও আকাট পণ্ডিতে'র সংঘর্ষের কথা সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে। উভয়েই অজ্ঞতার জগতে বিচরণশীল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। সঙ্কলিত রচনাসমূহে এসব তথ্যের প্রমাণ মিলবে।

মোহাম্মদী পত্রিকায় নজরুল-বিতর্কের ঝড় ওঠে। রক্ষণশীল মুসলিম সমাজের পক্ষ থেকে বলা হয় নজরুল খোদাদ্রোহী কবি, পয়গম্বরদ্রোহিতাও তাঁর মধ্যে রয়েছে। প্রতিমা ও দেবদেবী পূজার মানসিক প্রবণতা নজরুল কাব্যে দুর্লক্ষ্য নয়। সুতরাং মুসলিম সমাজের উচিত নজরুলের কাব্য-কবিতা থেকে দূরে থাকা। এম. আজিজুর রহমান রচিত 'ইসলাম ও নজরুল কাব্য সাহিত্য' প্রবন্ধে নজরুলের এই বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি ১৩৩৫ (১৯২৮) সনের পৌষ মাসে মোহাম্মদী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, নজরুল-বিতর্ক মুসলিম সমাজে খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ পরিবর্তনেরও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। নজরুল ধীরে ধীরে মুসলিম সমাজের একেবারে দোরগোড়ায় গিয়ে উপস্থিত হন। ইংরেজ হটানো আন্দোলনে নজরুল-সাহিত্য কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সে বিষয়ে সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তাঁর কাব্যের ঐতিহ্যিক বিস্তার এবং মানবতাবাদী চেতনা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এস. ওয়াজেদ আলী লিখেছেন, ধর্মের গোড়ামী প্রকৃত ধার্মিকদের মধ্যে দেখা যায় না। স্বামী বিবেকানন্দের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের কথা উল্লেখ করে আলোচনা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মীয় ঐক্যের এবং সর্বজনীন মানবধর্মের যে বাণী প্রচার করেন মোহাম্মদী পত্রিকায় তা সংগ্রহ করে প্রকাশ করা হয়। ধর্মীয় বিতর্কের প্রশ্নে ধর্ম ব্যবসায়ীদেরকে দোষারূপ করা হয়। 'বিবি তালাক' এবং 'কাফেরী' ফতোয়া দিয়ে যে মুসলিম সমাজ অধঃপতনে যেতে বসেছে কবি গোলাম মোস্তফা তার তীব্র সমালোচনা করেন। মিসেস আর. এস. হোসেন মুসলিম সমাজে আশরাফ-আতরাফ সমস্যার অবসান কামনা করে প্রবন্ধ রচনা করেন।

www.pathagar.com

বাংলা ভাষা চর্চা, বিজ্ঞান চর্চা, ইতিহাস চেতনা, সঙ্গীত শিক্ষা প্রভৃতি আধুনিক যুগোপযোগী জ্ঞান-বিদ্যা গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হয় মুসলিম সমাজে। ড: দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষার উপর মুসলমানদের প্রভাব' প্রবন্ধটি মাসিক মোহাম্মদীর ১৩৩৫ (১৯২৮) সনের চৈত্র মাসের দ্বিতীয় বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় মুদ্রিত হয়। বাংলা সাহিত্য চর্চা ইসলাম ধর্মের জন্য বিগর্হিত কাজ বলে যারা প্রচারণা চালায়, তাদের বিরুদ্ধে সম্পাদক স্বয়ং লেখনী ধারণ করেন। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান কতখানি, তা 'অভিব্যক্তিবাদ ও মুছলমান' প্রবন্ধে মোহাম্মদ আকরম খাঁ দৃষ্টান্ত সহযোগে সবিস্তার করেন। জীব বিজ্ঞানী জ্বাহেজের (মৃত্যু ২৫৫ হিঃ) 'কেতাবুল হায়ওয়ান' গ্রন্থটির দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখান যে, ডারউইন প্রমুখ বৈজ্ঞানিকের মতবাদসমূহ মুসলমান বিজ্ঞানী দ্বারা বহু আগেই আলোচিত হয়েছে। ইতিহাস চেতনার ক্ষেত্রে তিনি সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা ভেঙ্গে নতুনতর সর্বজাতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের মতবাদ আলোচনা করেন শেহাবুদ্দিন আহমদ। তিনি মনে করেন, ইতিহাস-বিজ্ঞান বলে ইউরোপে যে এক প্রকারের নতুন চিন্তাধারার জন্মলাভ ঘটছে 'ইবনে খালদুন এই ইতিহাস-বিজ্ঞানের জনক'। ১৩৩৫ (১৯২৮) সনের মোহাম্মদী পত্রিকার বার্ষিক সংখ্যায় প্রবন্ধটি প্রকাশ পায়। সঙ্গীত সম্পর্কে মুসলিম সমাজে উত্থিত নানা তর্ক-বিতর্কের অবসান ঘটান মোহাম্মদ আকরম খাঁ। তিনি হজরত রসুলের জীবনাচরণ থেকে সঙ্গীতের সিদ্ধতার অনুকূলে রায় আছে বলে জানান। চিত্রকলা সম্পর্কে মোহাম্মদ আকরম খাঁ প্রবন্ধ প্রকাশ করে মুসলিম সমাজের দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতার সমন্বয় সাধন করতে ব্যাপৃত হন। জীবজন্তুর মূর্তি গড়া ও তার ব্যবহার করাও যে ইসলামে নিষিদ্ধ নয় সে কথা তিনি জোর দিয়ে বলেন।

বিশ শতকের ত্রিশের দশকে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির কথা পুনরায় উল্লেখ করা হয়। বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মানুষ মিলেমিশে বাস করবে—এটাই কাম্য। এ সময় রবীন্দ্রনাথ পারস্যে ভ্রমণ করেন। পারস্যবাসী রবীন্দ্রনাথকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। এতে তিনি খুশি হয়ে মুসলমানদের অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তির প্রশংসা করেন। সাম্প্রদায়িকতাকে তিনি এ দেশের এক প্রকার ব্যাধি বলে উল্লেখ করেন। এই ব্যাধি নিরাময় করার জন্য তিনি দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান। তাতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে দেশবাসী সোচ্চার হয়ে ওঠে। আবদুল হক ফরিদী 'সংস্কৃত সাহিত্য ও মুসলমান' প্রবন্ধে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজদরবারে মুসলমান ঐতিহাসিক কর্তৃক রামায়ণ-মহাভারত, ভগবৎগীতা, অথর্ববেদ, যোগবশিষ্ট প্রভৃতি হিন্দু ঐতিহ্য চর্চার বিবরণ দেন। আবুর ফজল, আবদুল কাদের বাদায়ুনী প্রমুখ বিচক্ষণ বিদ্বান ব্যক্তি সংস্কৃত থেকে নানা উপকরণ গ্রহণ করেন।

রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের সুসংহত আত্মপ্রকাশ ঘটে ঢাকা শহরে স্যার সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। সৈয়দ এমদাদ আলী "মুসলিম বাংলার আত্মকথা" প্রবন্ধে বলেন, বেঁচে থাকতে হলে মুসলমানদেরকে অবশ্যই জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে হবে। এই বিজয় ঐক্যের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে মুসলিমলীগের সঙ্গে এ. কে. ফজলুল হকের অসহযোগিতার কথা সমালোচনা করা হয়।

www.pathagar.com

১৩৪৬ (১৯৩৯) সনের পৌষ মাসে মাসিক মোহাম্মদীর ত্রয়োদশ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত মোতাহের হোসেন চৌধুরীর 'স্বাধীনতা ঃ জাতীয়তা ঃ সাম্প্রদায়িকতা' প্রবন্ধটি সমকালীন মুসলিম সমাজের চিত্ররূপ। এতে স্বাধীনতা সম্পর্কে লেখকের সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা অর্জনকে তিনি অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণাধিকারের উপায় হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। স্বাধীনতা কিসের জন্য সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। বঙ্গের শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন, জাতীয়তাবোধের অভাবেই আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি। তাকে পুনরায় পেতে হলে সাম্প্রদায়িকতার মত সামাজিক অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে এবং জাতীয় ঐক্যের ভিত্তিতে আমাদেরকে এগিয়ে যেতে হবে।

রাজনৈতিক সচেতনতায় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন, হিন্দু-মুসলিম মিলিত ভারতের স্বাধীনতাই আমাদের কাম্য। মওলানা আবুল কালাম আজাদকে কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে মহাত্মা গান্ধী সঠিক কাজ করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) প্রেক্ষাপটে জাতি যখন নানা সমস্যায় জর্জরিত, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ তখন স্বদেশ প্রেমের জন্য জাতিকে মুক্তি ও মানবতার বাণী শোনালেন। বাংলার মুসলিম সমাজ সেদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য তাঁর পাশে এসে দাঁড়াতে কুণ্ঠাবোধ করেনি। কবি নজরুলকে পুনরায় মিলনের অগ্রদূত বলে অভিহিত করা হল। আবুল কালাম শামসুদ্দীন নজরুল ইসলামকে বাংলার 'সত্যিকার জাতীয় সাহিত্য রচয়িতা' হিসেবে চিহ্নিত করলেন। নজরুল সাহিত্য জাতীয় আন্দোলনে যেমন অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি হিন্দু-মুসলমান মিলনের ধারাটিও শক্তিশালী করেছে। "নজরুল জয়ন্তী" শিরোনামে আবুল কালাম শামসুদ্দীনের রচনাটি প্রকাশিত হয় মোহাম্মদী পত্রিকার ১৩৪৮ (১৯৪১) সনের আশ্বিন মাসের ১৪শ' বর্ষ ১২শ সংখ্যায়। এ সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমনে দেশে শোকের ছায়া নেমে আসে। কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সৈয়দ এমদাদ আলী লেখেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্য বাংলা ভাষা আজ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে। বাংলা সাহিত্যকে তিনি বিশ্ব সাহিত্যের দরবারে পৌঁছিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশোকে মুহ্যমান হয়ে মাহবুব-উল আলম লিখেছেন, 'জয়তু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মহাপ্রয়াণে পৃথিবীর সর্বত্র যত লোক আত্মীয় বিয়োগ ব্যথা অনুভব করেছে আমাদের জীবনকালে এত বেশি আর কারও মৃত্যুতে করেনি। শুধু তাঁর গানে ও লেখায় নয় বাস্তবজীবনেও তিনি নিজেকে বিশ্বমানবতার মূর্ত প্রতীকে পরিণত করতে পেরেছিলেন।' উল্লেখ্য যে, মাসিক মোহাম্মদী পত্রিকার ১৩৪৮ (১৯৪১) সনের ভাদ্র মাসের ১৪ বর্ষ ১১ শ সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুশোকজনিত এ সব লেখা প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্র স্মরণে কবি নজরুল শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন দীর্ঘ কবিতা রচনা করে। নজরুল লিখেছেন—

কাব্যগীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী
মহাকবি রবি অস্ত গিয়াছে। বীণা, বেণুকা ও বাণী
নীরব হইল।

www.pathagar.com

কালাম ঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও,
উর্ধ্বে থাকি এ পাষাণ জাতিরে রসে গলাইয়া দাও।

রবীন্দ্র প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বলেছেন, 'পৃথিবীর প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সঙ্গেই এরূপ একটি প্রতিভার যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যাবে। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, সেক্সপিয়ার, গ্যেটে, ফেরদৌসী, কালিদাস–বিভিন্ন দেশের অব্যক্ত মনন ও মানস এঁদেরই মধ্যে মূর্তি ও রূপ খুঁজে পেয়েছে। বাঙলাদেশ ও বাঙলা–সাহিত্যের এই শ্রেণীর স্রষ্টা ও প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ।' কবি জসীম উদ্‌দীনের চোখে রবীন্দ্রনাথ অন্য রকম আবেগে ধরা দিয়েছে। তিনি বলেছেন, 'আমার ধ্যানের কবি রবীন্দ্রনাথ আমার মনের কবি রবীন্দ্রনাথ'।

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী বাঙালি মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। পোষাকে–পরিচ্ছদে, ভাবে–ভাষায় সত্যিকার মুসলমান হতে হবে। তাহলেই অপর জাতির শ্রদ্ধা পাওয়া যাবে। আবদুল হামিদ শেখ মুসলিম সমাজের স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নে সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের কথা উল্লেখ করেছেন। মুসলমানদের রচিত সাহিত্য অপেক্ষাকৃত দুর্বল হওয়ার কারণ হিসেবে তিনি পরানুকরণের দোষ–ত্রুটি দেখিয়েছেন। আবুল কালাম শামসুদ্দীন লক্ষ্য করেছেন পরানুকরণ কেবল সাহিত্য–সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নয় রাজনীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রেও এই অনুকরণ চলেছে। তাই পাকিস্তানবাদকে আবুল কালাম শামসুদ্দীন স্বাগত জানিয়েছেন। পাকিস্তানবাদ ভারত–উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক রেনেসাঁস এনেছে বলে তিনি মনে করেন। মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য চেতনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনার উত্তর দেন আবুর মনসুর আহমদ। বুদ্ধদেব বসুর প্রবন্ধের নাম 'সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব'। তাঁর মতে 'মুসলমান লেখক' বা 'মুসলিম সাহিত্যিক' বলা ঠিক নয়। মুসলিম সমাজের এই মনোভাবই পাকিস্তানী মনোভাব। আবুল মনসুর আহমদ মনে করেন, বুদ্ধদেব বসু রাজনৈতিক কারণে এ ধরনের সমালোচনায় ব্রতী হয়েছেন। বেনজীর আহমদ পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলনকে আরো সুদৃঢ় করতে মত ব্যক্ত করেন। তাঁর কাছে পূর্ব–পাকিস্তানের স্বপ্ন মুসলিম সমাজের জন্য মুক্তির স্বপ্নতুল্য। পলাশীর পর এটাই তাঁর কাছে প্রকৃত পথের সন্ধান, সত্যিকার জীবনের আকাঙ্ক্ষা। পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের (পূর্বে যার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁস সোসাইটি) সভাপতি সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন পূর্ব পাকিস্তানের 'পূর্ব' শব্দটি সম্পর্কে আপত্তি তোলেন। এই শব্দ প্রয়োগে নাকি পাকিস্তানের ক্ষুদ্রত্ব প্রকাশ পায়।

রাজনীতি ক্ষেত্রে পাকিস্তান প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত হলেও সাহিত্য ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজ পরানুকরণের শিক্ষা মনে করে কলকাতায় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ স্থাপন করল। এতে মুসলিম সমাজে নবজাগরণের ঢেউ জাগল। যার তরঙ্গধ্বনি পরানুকরণে নয় আত্ম আবিষ্কারে নব–সৃষ্টির উল্লাসে উদ্বেল।

বাংলার মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা হবে কি উর্দু হবে এ নিয়ে খুব জোরেসোরে বিতর্ক ওঠে। ১৩৫০ (১৯৪৩) সনের কার্তিক মাসে ১৬শ' বর্ষ ১ম সংখ্যা মোহাম্মদী

www.pathagar.com

পত্রিকায় 'পূর্ব পাকিস্তানের জবান' শিরোনামে আবুল মনসুর আহমদ এক জোরালো প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এতে তিনি আবুল কালাম শামসুদ্দীন এবং রেনেসাঁ সোসাইটির সম্পাদক মুজিবর রহমান খাঁকে 'হুঁশিয়ার' করে দিয়ে বলেন যে, বাংলাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা হবে। তাতে বাঙালি মুসলিম সমাজ নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবে। নিজেদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দ্বারা জনসাধারণকে উন্নত ও আধুনিক জাতিতে পরিণত করা সম্ভব হবে। এ দেশে উর্দু প্রবর্তনের কোনই প্রয়োজন নেই। ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের পক্ষ থেকে মহাকবি কায়কোবাদকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ১৯৪৪ সালের ১৯শে মার্চ। মুসলিম সমাজের অন্ধকার যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের জন্য মহাকবি কায়কোবাদ নতুন পথ নির্দেশ করেন। একথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। ১৩৫১ (১৯৪৪) সনের আষাঢ় মাসে মোহাম্মদী পত্রিকার ১৭শ বর্ষ ৯ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'পূর্ব-পাকিস্তানের জাতীয় কবি' প্রবন্ধে মুজিবর রহমান খাঁ লিখেছেন, নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন। কিন্তু তাঁর লেখায় যাকে বলা হয় পাকিস্তানবাদ, তারই জয়গান ঘোষিত হয়েছে। নজরুল তাঁর সাংবাদিক ও রাজনৈতিক জীবনের তাগিদে মুখে যে কথা বলেছেন, সেখানে তাঁর পরিচয় ছিল না। পাকিস্তান দাবি মুসলিম ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলা যেতে পারে বলে আবুল মনসুর আহমদ অভিমত প্রকাশ করেন। 'পাকিস্তান' মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবি, সন্দেহ নেই। কিন্তু এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, রাজনৈতিক স্বরাজ তখন অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হবে যখন এ দেশের মুসলিম সমাজ তাদের স্বাধীন স্বকীয় সত্তাকে বিকাশ লাভ করার সুযোগ পাবে। আবদুল মওদুদও মুসলিম সমাজকে আত্মসচেতন হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন।

১৩৫২ (১৯৪৬) সনের চৈত্র মাসে মোহাম্মদী পত্রিকার ১৯শ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় মহিলা সভায় প্রদত্ত কায়েদে আজমের ভাষণ প্রকাশ করা হয়। ভাষণে কায়দে আজম বলেন, পাকিস্তান ব্যতীত ভারতবর্ষের মুসলমান জাতি এবং ইসলাম ধ্বংস হয়ে যাবে। এটাই একমাত্র পথ, এছাড়া ভারতীয় মুসলমানদের অন্য কোন পথ নেই। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে উচ্চারণ করেন, 'আমার বিশ্বাস, আমরা নিশ্চয়ই পাকিস্তান লাভ করিব। পাকিস্তান আমরা আদায় করিবই। ইহা আমাদের জীবনমরণ সমস্যা। ইহা একটি রাজনৈতিক লড়াই। প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, যথাসাধ্য এই লড়াইয়ে অংশ গ্রহণ করা।' এ লড়াইয়ে যোগদানের জন্য দেশের তরুণ সমাজকে এগিয়ে আসার জন্য আহ্বান করা হয়।

ভারত বিভাগের রাজনৈতিক যুক্তি হিসেবে অঞ্চল বিশেষে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার কথা উল্লেখ করা হয়। ১৩৫৪ (১৯৪৭) সনের আষাঢ় মাসের মোহাম্মদীতে (২০ শ বর্ষ ৯ম সংখ্যা) বলা হয় যে, যুক্ত বৈঠকে অধিক সংখ্যক সদস্য অখণ্ড বাংলার পাকিস্তানভুক্তি সমর্থন করেন। কিন্তু বিভক্ত আইন সভায় কংগ্রেসেরই জয় হয়। পশ্চিম বাংলাকে খণ্ডিত করে নেয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়। মুসলিম রাষ্ট্রে বিপুল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ কাশ্মীর ও জম্মুকে ধরার কথা হয়। পূর্বাংশে অবস্থিত মুসলিম অধ্যুষিত বাংলা আসামসহ মুসলিম রাষ্ট্রে মনিপুরের

www.pathagar.com

অন্তর্ভুক্তির কথাও উল্লেখ করা হয়। মোহাম্মদী, ২০শ বর্ষ ৫ম সংখ্যায় ফাল্গুন ১৩৫৩ (১৯৪৭) বৃটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ শেষ পর্যন্ত দু'টি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হল। একটি হিন্দু সংখ্যাগুরু, অন্যটি মুসলিম সংখ্যাগুরু। হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক অনৈক্যের দ্বন্দ্ব নিজ নিজ স্বাধীন পথে এসে শেষ হল। অনেকে আবার অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখা শুরু করল।

মোহাম্মদী পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ আকরম খাঁ সদম্ভে ঘোষণা করলেন , 'আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে মোছলেম-বাংলার জ্ঞান-বিশ্বাস, সংস্কার-ঐতিহ্য এবং তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয় একটা গুরুতর রকমের সাংস্কৃতিক অভিযান। সুযোগ ও সুসময় মনে করিয়া মোছলেম সমাজের পঞ্চম বাহিনীও এই অভিযানের সহায়তা করার জন্য পূর্ণ উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পড়েন। বিশ বছর পূর্বে মাসিক মোহাম্মদীর আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রধানতঃ এই অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য। ... আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মত পাকিস্তানের মূল ভিত্তি হইতেছে মনস্তাত্ত্বিক। মুছলমানের মন ও মস্তিষ্কে এমন একটা পুলক, এমন একটা প্রেরণা এবং এমন একটা ভাবাবেগ জাগাইয়া তুলিতে হইবে, যাহারা অপরিহার্য্য নির্দেশে বাংলা মুছলমান আদর্শ সাধনার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইবে—মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বলিতে মোটামুটিভাবে এই জিনিসটাকেই বুঝাইতে চাহিয়াছি। এই সাধনায় জাতির অগ্রনায়কগণের সহায়তা করার জন্য মাসিক মোহাম্মদীকে অবলম্বন করিয়া আবার এই কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছি'।*

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' (১৮৩১-১৯৩০)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯। পৃ পৃ ১২১-১২২।

২. প্রাগুক্ত, পৃ ১২৪।

৩. মুস্তাফা নূর উল ইসলাম, 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' (১৯০১-১৯৩০)। বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭। পৃ ৪৪১।

৪. J. Long. 'A Descriptive Catalogue of Bengali Works', Calcutta, 1855.

৫. মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মাসিক মোহাম্মদী', ২১ শ' বর্ষ ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৫৪ (১৯৪৭)।

* মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত মাসিক মোহাম্মদী
২১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪ (১৯৪৭)।

www.pathagar.com

বিষয়সূচি

১৯২৭
মুসলিম সমাজে ঐক্যের ভাবনা ১, সমাজে নারীর মর্যাদা ১, প্রাথমিক শিক্ষা ১, কৃষক সমাজ ও শিক্ষা ২, শিক্ষা ও বাঙালি মুসলমান সমাজ ২, কোরআন শরীফের ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ ৩, ইসলাম ও স্বাধীনতা ৩, ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার কুফল ৪, মুসলিম সমাজে নারীর পর্দাপ্রথা ৪, নারী ভিখারিনী ৫, চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানের অবদান ৫, বিতর্ক : রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী ৫, হিন্দু-মুসলমান বিবাদ সৃষ্টিতে ইংরেজের ষড়যন্ত্র ৬, ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত ৬, স্বরাজ : ইংরেজ বিরোধী চেতনা ৭, ইসলামের নারীর মর্যাদা ৭, হিন্দু ও মুসলমান বিরোধ ৭, কাট মোল্লা ও আকাট পণ্ডিতের কাণ্ড ৮।

১৯২৮
ইসলাম ধর্মের শত্রু : নজরুল ইসলাম (প্রসঙ্গ : পৌত্তলিকতা) ৯, নজরুল বিচার : সমাজে রক্ষণশীলতা ১০, উন্নতির নমুনা : নারী ১০, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে : স্বামী বিবেকানন্দ ১১, ধর্মীয় ঐক্যের কথা ১১, অবরোধ প্রথার কুফল ১২, শিক্ষাখাতে ব্যয় ১৩, মুসলিম সমাজের অধঃপতন ১৩, আশরাফ-আতরাফ ১৪, বাংলা ভাষা চর্চা ও ইসলাম ধর্ম ১৪, কার্ল মার্ক্সের কথা ১৪, সমাজ : বিংশ শতাব্দী ১৫, বিজ্ঞানে মুসলমানের অবদান ১৬, বিজ্ঞান চেতনা : ডারউইন ও বিবর্তনবাদ ১৬, ইতিহাস চেতনা ১৭, মুসলিম সমাজের সংকট ১৭, আলেম সমাজের দোষ-ত্রুটি ১৮, উভয় দলের দোষ ১৯, সামাজিক পরিবর্তন ও ইসলাম ১৯, ধর্মীয় বিতর্ক ২০, ধর্ম ব্যবসায়ী ২০, আরবী শিক্ষা ও বৃটিশদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি ২১, সঙ্গীত ও ইসলাম ২১, সঙ্গীতের পক্ষে প্রমাণ ২২, আবুল হুসেনের প্রবন্ধের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ২৩, সাম্প্রদায়িক ভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল আলোচনা ২৪।

১৯২৯
হিন্দু-মুসলিম বিরোধ : কারণ ২৪, শিক্ষা ও পর্দা ২৫, মুসলমানদের সমাজ জীবন ২৬, মুসলমানদের পারিবারিক জীবন ২৭, মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ২৭, শিল্প ২৮, ব্যবসা-বাণিজ্য ২৯।

১৯৩০
হিন্দু ও মুসলমান ৩০, স্বদেশ প্রেমের প্রতি যুব সমাজ ৩০, ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্রকলা ৩১, সঙ্গীতের পক্ষে ৩২, সঙ্গীত ও স্বাধীন চিন্তা ৩৩, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ ৩৩, শিক্ষা : ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ৩৪।

১৯৩১
হিন্দু-মুসলমান ৩৪, পর্দা ও অবরোধ প্রথা ৩৬।

www.pathagar.com

১৯৩২
দাঙ্গা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও দেশবাসীর প্রার্থনা ৩৭।

১৯৩৩
নারী ৩৯, পর্দা প্রথা বিতর্ক ৪০, সতীদাহ প্রথা ৪১।

১৯৩৪
আকবর ও হিন্দু-মুসলমান ৪২।

১৯৩৫
সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ৪৩, দাঙ্গার বিপক্ষে ৪৩, দাঙ্গার কারণ ৪৪, ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে ৪৪, শিক্ষানীতির ত্রুটি ৪৫।

১৯৩৬
রাজনীতি ও মুসলিম সমাজ ৪৫, মুসলিম জাগরণ ৪৬।

১৯৩৭
মুসলিম লীগ ও এ. কে. ফজলুল হক ৪৭, হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ ৪৭, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র ৪৭, ধর্মীয় বিতর্ক ৪৮।

১৯৩৮
কামাল আতাতুর্ক : মৃত্যুশোক ৪৮, নারীহরণ ৪৯, শিল্পী জয়নাল আবেদীন ৪৯, মুসলিম সমাজের রসবোধ : চিত্রকলা ৫০।

১৯৩৯
জলধর সেন : মৃত্যুশোক ৫০, হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলমান ৫১, অসাম্প্রদায়িক চেতনা ৫১, মুসলিম সমাজে নারীর অগ্রগতি ৫২, নারীর অধিকার ৫২, নারীর শিক্ষা ও সামাজিক জীবন ৫৩, সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি ৫৩, সিরাজউদ্দৌলার স্মৃতি : উৎসব ৫৪, সাম্প্রদায়িক সমস্যা ৫৪, স্বাধীনতা ৫৫, সাম্প্রদায়িকতা : সামাজিক অশুভ বিষবাষ্প ৫৬, নারী নির্যাতন ও নারীরক্ষা ৫৭, চিন্তার স্বাধীনতা ৫৮, গান্ধীবাদের বিপক্ষে ৫৮।

১৯৪০
নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন ও মুসলমান ৫৯, হিন্দু-মুসলিম মিলিত ভারতের স্বাধীনতা ৬০, মুসলমানদের প্রতি গান্ধীর মানসিকতা ৬০, বাংলার মুসলমানদের প্রতি ৬১, হিন্দু-মুসলিম অভেদ-ভেদ প্রশ্ন ৬২, শিক্ষাক্ষেত্রে ভাষা সংকট ৬২, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট : মুসলিম সমাজ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ৬৩, ভারত বিভাগ পরিকল্পনা ও মুসলমান ৬৫, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার গোড়ার কথা ৬৬, হিন্দু-মুসলিম : দৃষ্টিভঙ্গি ৬৭।

www.pathagar.com

১৯৪১

নজরুলের অভিভাষণ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ৬৮, মিলনের অগ্রদূত : নজরুল ৬৯, মুসলিম জাগরণ ৭০, সাহিত্য সমাজে নজরুল ৭১, ধর্মের মর্মকথা : সংস্কার ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা ৭২, ইংরেজি শিক্ষার সূত্র : মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি ৭৩, শরৎ সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র ৭৩, প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব ৭৪, লালন ফকিরের জাত বিচার ৭৫, চট্টগ্রামে নজরুল : তরুণ সমাজে আলোড়ন, অভিনন্দন ৭৬, মৃত্যুশোক : রবীন্দ্রনাথ ৭৮, রবীন্দ্রস্মরণে নজরুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি ৭৮, মৃত্যুশোক : রবীন্দ্রনাথ ৮০, মৃত্যুশোক : রবীন্দ্রনাথ ৮০, রবীন্দ্রস্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি ৮০, হিন্দু-মুসলিম মিলিত জাতীয়তার কবি : নজরুল ইসলাম ৮২, মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা ৮২, সোজন বাদিয়ার ঘাট : সমকালীন সমাজের প্রতিফলন ৮৩, জাতি-বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দুই ধর্ম ৮৪, জসীম উদ্‌দীনের চোখে রবীন্দ্রনাথ ৮৫, বল্য বিবাহ ৮৫, ইতিহাস চেতনা ৮৬।

১৯৪২

স্বাতন্ত্র্য চেতনা ৮৬, স্বাতন্ত্র্য চেতনা ৮৭, পাকিস্তানবাদ ৮৮, স্বাতন্ত্র্য চেতনা : বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা ৮৮, পাকিস্তানবাদী ৯০।

১৯৪৩

মহাকবি কায়কোবাদ : সমাজ চেতনা ৯১, পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন ৯২, সাহিত্য সমাজ চেতনা ৯৩, মহাযুদ্ধ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে ৯৪, স্বাধীনতার দাবি আত্মবিকাশের ৯৫, পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি ৯৫, জাগরণের কবিতা ৯৬, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : পরিস্থিতি ৯৬, মুসলমানদের আর্থিক দুর্দশা ৯৭, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ৯৭, গাড়ু ও বদনা ৯৮, চাকুরি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান বৈষম্য ৯৮, মুসলিম সমাজে খাদ্য সংকট ৯৯, বাংলা-উর্দু বিতর্ক ১০০, মৃত্যুশোক : রোমাঁ রোলাঁ ১০১, সমাজ-সাহিত্য বিতর্ক ১০১, দুর্দশার কারণ ১০২, জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদ ১০২।

১৯৪৪

কায়কোবাদ সংবর্ধনা ১০৪, কবির বক্তব্য ১০৪, মুসলিম কৃষক ও জমিদার-মহাজন ১০৫, ঐতিহাসিক সাহিত্য ও ইতিহাস চেতনা ১০৫, দুর্ভিক্ষের কারণ ১০৬, দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ৩৫ লক্ষাধিক ১০৬, বাংলা সাহিত্য ও বাংলার সমাজ ১০৭, নজরুল : জাতীয় কবি ১০৭, বঙ্কিম বিতর্ক ১০৮, আজাদী লাভের সংগ্রাম ১০৮, পাকিস্তানের গোড়ার কথা ১০৯, ধর্ম ও সংস্কৃতি ১০৯, বাঙালি মুসলমান ও আজাদী লাভের সংগ্রাম ১১০, ভাষা সংস্কারের নমুনা ১১০, সর্বজনীন শিক্ষা ১১১, বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি : পল্লী সংস্কৃতি ১১১, আজাদ ও রেনেসাঁ সোসাইটি ১১১, অন্ধকার যুগ : (১৭৫৭-১৯০৬) ১১২, কলকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রভাব ১১২।

www.pathagar.com

১৯৪৫

হিটলার মুসোলিনীর মৃত্যু ১১৩, মন্বন্তরের বিষক্রিয়া : ম্যালেরিয়া ১১৩, দুর্নীতি ১১৪, পতিতা সমস্যা ১১৪, ফিলিস্তিনী সমস্যা ১১৫, যুদ্ধের অবসান অশান্তির অবসান নয় ১১৬, আণবিক বোমা আবিষ্কার আতঙ্কের কারণ ১১৬, মন্বন্তর ক্লিষ্ট দেশ থেকে চাউল রপ্তানি ১১৬, দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস ১১৭।

১৯৪৬

পাকিস্তান-দাবি ১১৭, মুসলিম লীগ : বিজয়োৎসব ১১৮, আণবিক বোমা ও হিরোসিমার ধ্বংসলীলা ১১৮, কর বৃদ্ধির কষ্ট ১১৯, জাগরণের বাণী : (নতুন জাগরণ, পাকিস্তান ও এছলাম, লড়াইয়ের আহ্বান) ১১৯, মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার অভাব ১২০, তরুণের দায়িত্ব ১২০, পল্লী কবির কর্তব্য ১২১, সমাজ কর্মীর কর্তব্য ১২১, দেশবন্ধু সি. আর. দাশ ১২২, শিক্ষা পরিবেশ ১২২, খাদ্য সংকট ১২৩, নারীর সাধনা ১২৩, উন্নতির অন্তরায় ১২৪।

১৯৪৭

মুসলিম রাষ্ট্র ১২৪, জাতীয়তাবাদের দোষ-ত্রুটি ১২৫, ধর্মের অঙ্গীকার ১২৬, স্বাধীনতা দ্বারপ্রান্তে ১২৬, বিভক্ত বাংলা ১২৬, বাংলা ভাষা প্রশ্ন ১২৭, স্বাধীনতা উত্তর সম্প্রীতির প্রশ্ন ১২৭, অখণ্ড ভারত ১২৭, সম্পাদকের নিবেদন ১২৮।

www.pathagar.com

মোহাম্মদী পত্রিকায় মুসলিম সমাজ

মুসলিম সমাজে ঐক্যের ভাবধারা

প্যারিসের একজন বিখ্যাত অধ্যাপক বলিয়াছেন, মুসলমান জগতে সাময়িক পত্রিকার প্রচার খুব বাড়িয়া গিয়াছে, আর সে সকলের বিশেষত্ব এই যে, বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকগণ সকলেই এক সুরে সুর মিলাইয়া জগতের সমস্ত মুসলমানকে এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিতে প্রাণপণে চেষ্টা পাইয়াছেন। পত্রিকাগুলি পড়িয়া দেখিলে মনে হয়, তাহারা সকলে একইভাবে উদ্বুদ্ধ হইয়া সকল মুসলমানের মধ্যে একই ভাবধারা বহাইয়া দিবার উদ্দেশ্যে আসরে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সঙ্কলন : *মোসলেম জগতে সাময়িক পত্রিকা।*
১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৪ (১৯২৭)

সমাজে নারীর মর্যাদা

সমস্ত অবস্থায় ও সকল বয়সের স্ত্রীলোকদিগের ব্যাপক স্বরূপ হইতেছে 'নারী'। তাহার পর এই নারী আবার এক একটা বৈশিষ্ট্য লইয়া জগতের সম্মুখে উপস্থিত হন, যথাক্রমে কন্যারূপে স্ত্রীরূপে ও মাতারূপে। নৃশংসতার সমস্ত ভাবধারাকে প্রতিহত করিয়া এছলাম নারী এবং তাহার এই তিনটি বিশেষ স্বরূপ সম্বন্ধে দুনিয়ার বুকে যে স্বর্গের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, কোরআন ও হাদিছ হইতে তাহার কতকগুলি উদাহরণ প্রথমে উদ্ধার করিয়া দিতেছি।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *ইছলামে নারীর মর্য্যাদা ও অধিকার।*
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭)

প্রাথমিক শিক্ষা

বাংলা মোছলমানপ্রধান দেশ। এখানকার শতকরা ৫৫ জন অধিবাসী মোছলমান। কিন্তু সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি হইলেও মোছলমানেরা শিক্ষা ব্যাপারে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ। ইহা নিশ্চয়ই আক্ষেপের বিষয়। প্রাথমিক শিক্ষার বহুল প্রচার ব্যতীত এই অধঃপতিত সমাজের আশু উন্নতির আশা নাই।

আনোয়ার হোসেন : *বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা।*
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭)

www.pathagar.com

কৃষক সমাজ ও শিক্ষা

সমাজের মেরুদণ্ড হইল অজ্ঞ কৃষক সম্প্রদায়। সাধারণের ধারণা, কৃষিকাজে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন নাই। স্থূলবুদ্ধি মূর্খ যাহারা, তাহাদের উপর এ কাজের ভার দিয়া আমরা নিশ্চিন্ত আছি। কিন্তু আমাদের একটা কথা ভুলিলে চলিবে না যে, শিক্ষা প্রত্যেকের জন্যই দরকারি। মানুষের মনুষ্যত্বটুকু পুরাপুরি ফুটাইয়া তুলিতে হইলে শিক্ষা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। বিংশ শতাব্দীর উন্নত বৈজ্ঞানিক যুগে শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে যাওয়া বৃথা।

আনোয়ার হোসেন : *বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা।*
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭)

শিক্ষা ও বাঙালি মুসলমান সমাজ

শিক্ষা বিষয়ে আমরা বাঙালি মোছলমান কতদূর অনুন্নত, তাহা কল্পনা করিলেও নৈরাশ্যের অন্ধকার আমাদের মনকে ছাইয়া ফেলে। মোছলমান আজ ব্যবসায়, বাণিজ্যে, শিল্প প্রভৃতি অর্থকরী ব্যাপারেও সবচেয়ে পিছনে পড়িয়া আছে। উকিল, ডাক্তার, কেরানী ও নকলনবিশের কাজ হিন্দুরই একচেটিয়া। অফিস আদালতে, মহাজনের গদিতে, সওদাগর অফিসে, রেল-ষ্টীমার ষ্টেশনে আমরা আজ দুই একজন মোছলমান কর্মচারী দেখিতে পাই মাত্র। যেখানে কুলি-মজুর, সেইখানেই মোছলমান দলে দলে দেখা যায়। তাহারা 'hewers of wood and drawers of water' ব্যতীত আর কি ?

আনোয়ার হোসেন : *বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা।*
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭)

মুসলমানের শিক্ষার নমুনা : বিভিন্ন বিভাগ

স্যাডলার রিপোর্ট, ১৯১১

(হাজারকরা শিক্ষিতের হিসাব)

অঞ্চল	হিন্দু		মুসলমান	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
ঢাকা	২৩৮.৮	২৯.৫	৬০.১	১.৫
প্রেসিডেন্সি	২৪৯.৮	৩৫.৫	৯৬.১	৩.২
বর্ধমান	২০৮.৪	১১.৬	১০৫.৪	৭.০
চট্টগ্রাম	২৬২.৭	২০.১	৮০.৩	২.২
রাজশাহী	১৩০.৫	৯.৪	৭৬.৭	১.৭

www.pathagar.com

ইংরেজী শিক্ষার নমুনা (হাজারকরা হিসাব)

ঢাকা	৩৬.৯	.৬	৩.৭	.০৩
প্রেসিডেন্সি	৬২.৫	১.৮	৭.৯	.১
বর্ধমান	২৬.৫	.৬	১২.৪	.৪
চট্টগ্রাম	৩০.৩	.৫	৪.৬	.০৪
রাজশাহী	১৫.৪	.২	৪.৪	.০২

আনোয়ার হোসেন : *বাংলার মোছলমান ও প্রাথমিক শিক্ষা।*
১ম বর্ষ ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭)

কোরআন শরীফের ত্রুটিপূর্ণ অনুবাদ

ফরাসি ও জার্মানি ভাষার তুলনায় সামান্য হইলেও এছলাম, কোরআন, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাএর মোছলেম সভ্যতা সম্বন্ধে ইংরেজি ভাষাতেও অনেক বহু-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইংরাজ পণ্ডিতগণ এছলামের মূল ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস প্রভৃতির অনেক অনুবাদও প্রকাশ করিয়াছেন। ইংরাজ পণ্ডিতগণের এই শ্রেণীর বহি-পুস্তকের বিশেষত্ব এই যে, তাহা অধিকাংশ স্থলে লাটিন, ফরাসি, জার্মানিতে প্রকাশিত অনুবাদের অনুবাদ। অধিকন্তু অধিকাংশ স্থলে এছলামের বিরুদ্ধে 'প্রপাগান্ডা' করিবার একমাত্র উদ্দেশ্যে খ্রিষ্টান মিশনারী বা তাহাদের সহকারীদের দ্বারা লিখিত হইয়াছে। পাদ্রীসেল ও তাঁহার কোরআনের অনুবাদ ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আলোচনা (সম্পাদক): *পাশ্চাত্য গবেষণার নমুনা।*
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৪ (১৯২৭)

ইসলাম ও স্বাধীনতা

ইতিপূর্বে কোরআন শরীফের আয়াত ও তফসিরের বরাত দিয়া সাধারণভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, পার্থিব উন্নতি ও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভ ইসলামধর্মের অঙ্গীভূত। এখন আমরা ধর্মগ্রন্থের স্পষ্ট উক্তির দ্বারা সপ্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইব যে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা এছলাম ধর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রীয় অধিকারলাভ ঈমানের অঙ্গ ও এছলামের অংশবিশেষ এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, পার্থিব উন্নতি বিশেষতঃ রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জনে বিমুখ থাকা, বিপদের আশঙ্কায় বা আলস্য জড়তা নিবন্ধন শাসনাধিকার লাভে উদাসীন ও নিশ্চেষ্ট থাকা এছলামধর্মে মহাপাপ এবং এই পাপ হইলে অভিশপ্ত ও আল্লাহতায়ালার গজবের ভাগী হইতে হইবে। পাঠক কোরআন শরীফের অনুবাদ ও বর্ণনা হইতে বেশ বুঝিতে পারিলেন

www.pathagar.com

ইসলাম রাষ্ট্রীয় অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন ও পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করিবার জন্য কিরূপ উৎসাহ ও বজ্রকঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছেন।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান এছলামাবাদী : *এছলাম ও শাসন-অধিকার।*
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪

ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ না করার কুফল

৬০/৭০ বৎসর পূর্বে পুরুষের পক্ষেও ইংরাজি শিক্ষা নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজি পড়িলেই লোকে কাফের হইত। এখন কর্তারা তাহার ফল ভোগ করিতেছেন। স্বাস্থ্য, শক্তি, সামর্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিভাগের দ্বারই মুসলমানের জন্য অযোগ্যতার অজুহাতে রুদ্ধ হইয়া আছে। কলিকাতা করপোরেশনে শতকরা ৫০টি চাকুরি লাভের জন্য চেঁচামেচি করিয়া মুসলমানগণ ভারতের নিকৃষ্ট শ্রেণীর (Depressed class) তালিকাভুক্ত হইয়াছেন। আমি বলি, তাঁহারা নিশ্চয়ই 'অযোগ্য'। মুসলমানেরা স্বীকার করুন বা না করুন, তাহারা যে অযোগ্য ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, সুশিক্ষিতা সুযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান অপেক্ষা মুসলমানের ন্যায় অশিক্ষিত অযোগ্যা মাতার গর্ভজাত সন্তান যে নিকৃষ্ট হইবে, ইহা ত অতি স্বাভাবিক। 'অযোগ্য' বলার জন্য রাগ না করিয়া 'যোগ্য' হবার চেষ্টা করাই শ্রেয়।

মিসেস আর. এস. হোসেন : *নারী ও ইসলাম : রাণী ভিখারিণী।*
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪

মুসলিম সমাজে নারীর পর্দা প্রথা

আমাদিগের মতে, এই পর্দার অনুকূলে কোথাও দলিল নাই,—বরং কোরআন হাদিস, খাইরুল কোরান বা স্বর্ণযুগের ইতিহাস, সমগ্র মোছলেম জগতের অতীত ও বর্তমান আচার, এক বাক্যে ইহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতেছে। এই প্রবন্ধে যে কয়টি হাদিছ বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও পাঠকগণ প্রকৃত অবস্থার কতকটা সন্ধান পাইতে পারিবেন। প্রবন্ধের উপসংহার ভাগেও তাঁহারা ইতস্ততঃ বর্তমান অবরোধ-প্রথার বহু প্রতিকূল নজির দেখিতে পাইবেন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *এছলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার।*
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪

www.pathagar.com

নারী ভিখারিনী

'ভারত মাতা' লেখিকার সহিত ভারত পিতাগণ 'চুলোচুলি' করিতেছেন। এই সুযোগে মুসলিম সমাজ (?) আপনারা ঐ দর্পণে নিজের মুখ দেখিয়া লউন। দেখুন ত আপনারা নিজ সমাজের রানীকে কিরূপ ভিখারিণী সাজাইয়াছেন।

মিসেস আর. এম. হোসেন : *নারী ও ইসলাম : রাণী ভিখারিণী।*
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুসলমানের অবদান

পাশ্চাত্য-সভ্যতার মধ্যযুগে আরবি দর্শনের ন্যায় আরবি চিকিৎসাশাস্ত্রও ইউরোপের বিদ্যালয়সমূহে রীতিমত পাঠ্য তালিকাভুক্ত ছিল। জকেরিয়া রাজী, বুআলী সীনা, এবনে জহর, এবনে তোফেল ও এবনে মস্‌কোওয়ায়হ প্রভৃতি মোসলেম পণ্ডিতগণের লিখিত গ্রন্থাবলীই সে সময় চিকিৎসাশাস্ত্রের গভীর গবেষণাপূর্ণ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত। চিকিৎসা বিজ্ঞানের বর্তমান উন্নতির যুগেও ক্যানন (Cannon) বা বুআলী সীনার 'কানুন' গ্রন্থের উল্লেখ বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই গ্রন্থখানি ফ্রান্স ও রোমের চিকিৎসা বিদ্যালয়সমূহে পাঠশ্রেণীভুক্ত ছিল।

সঙ্কলন : *আরবী চিকিৎসাশাস্ত্র ও পাশ্চাত্য জগতে তাহার প্রভাব।*
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪

বিতর্ক : রক্ষণশীল ও প্রগতিবাদী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক কাজী আবদুল অদুদ ছাহেব 'নব পর্য্যায়' নামক একখানা পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। এই পুস্তকে সাধারণভাবে এবং তাহার 'সম্মোহিত মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে বিশেষরূপে এমন কতকগুলি অভিমত প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা যুক্তির হিসাবে অপ্রমাণ্য, ইতিহাসের হিসাবে ভিত্তিহীন এবং ধর্মের হিসাবে মারাত্মক।

কিছুদিন পূর্বে কাজী ছাহেব সংবাদপত্রের সাহায্যে নিজের প্রতিপক্ষকে তাঁহার রচিত এই 'নব পর্য্যায়' এবং তদীয় বন্ধু অধ্যাপক আবুল হোছেন সম্পাদিত 'শিখা' পাঠ করিয়া দেখার জন্য সদর্প উপদেশ দিয়াছিলেন। বিশেষ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও এতদিন আমরা নানা কারণে তাঁহার অনুরোধ পালন করিয়া উঠিতে পারি নাই। সম্প্রতি 'শিখার' একটা প্রবন্ধ এবং কাজী ছাহেবের পুস্তকখানা পড়িয়া দেখার সৌভাগ্য আমাদের ঘটিয়াছে। কাজী ছাহেবের ও অন্যান্য কএকজন বন্ধুর পরামর্শমতে আমরা নবপর্য্যায়ের 'সম্মোহিত মুসলমান' প্রবন্ধটি বিশেষ মনোযোগ সহকারে পড়িয়াছি- এবং পড়িয়া এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত

www.pathagar.com

হইয়াছি যে, কাজী ছাহেব নবপর্য্যায়ের নামে বস্তুতঃ এছলামের বিপর্য্যয় সাধন করারই চেষ্টা করিয়াছেন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *নব-পর্য্যায় না নব-পর্য্যয়।*
১ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৪ (১৯২৭)

হিন্দু-মুসলমান বিবাদ সৃষ্টিতে ইংরেজের ষড়যন্ত্র

ভারতকে শাসন-সংস্কারের আর এক কিস্তি দান করা যাইতে পারে কিনা, তাহার তদন্ত করার জন্যও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট একটা কমিশন নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহা লইয়া দেশে ঘোর অসন্তোষের সৃষ্টি হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন সমাজের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমস্ত নেতা একবাক্যে কমিশন বয়কট করার প্রস্তাব করিয়াছেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হিন্দু-মুসলমানের বর্তমান বিবাদ-বিসম্বাদ হইতে উপকারলাভের জন্য যে কিরূপ প্রলুব্ধ হইয়া পড়িয়াছেন এইসব ব্যাপারে তাহাও দুই প্রহরের সূর্য্যের মত দেদীপ্যমান হইযা উঠিয়াছে। গত দুই বছর হইতে মুসলমান সম্বন্ধে গবর্ণমেন্টের শাসননীতির যে শোচনীয় পরিবর্তন আরম্ভ হইয়াছে এবং হিন্দুসভার মনতুষ্টির জন্য তাহারা ক্রমাগত যে সকল কার্য্যপদ্ধতির অবলম্বন করিয়া আসিয়াছেন, সেগুলিকে লাট সাহেবের ঘোষণার সহিত একত্রে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টত জানা যাইবে যে, কমিশনকে সামাল দিবার জন্যই কর্তৃপক্ষ ইচ্ছাপূর্বক বর্তমান নীতি অবলম্বন করিয়াছেন।

আলোচনা : *রয়েল কমিশন।*
১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা : অগ্রহায়ণ ১৩৩৪

১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত

বিদ্রোহ দুইটি কারণে ঘটে। প্রথম ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক ভারতের সমস্ত প্রদেশকে নিজেদের রাজ্যভুক্ত করিয়া লওয়া। দ্বিতীয়, চর্ব্বিযুক্ত কার্তুজের প্রচলন। মিরাটের ৩নং রেজিমেন্টের ৮৫ জন সিপাহীকে উক্ত চর্ব্বিযুক্ত কার্তুজ (শূকরের চর্বি) ব্যবহারে অস্বীকার করায় কোর্টমার্শাল করা হয়। বলা বাহুল্য যে, এই কার্তুজ ব্যবহারের জন্য তখন দাঁতের সাহায্য গ্রহণ করা হইত। এই ৮৫ জন সিপাহীকে যেভাবে হত্যা করা হইয়াছিল, তাহা এতই নির্মম ও হৃদয়বিদারক যে, তদ্দৃষ্টে সমস্ত সৈন্যদল মধ্যে বিদ্রোহের ভাব প্রবল হইয়া উঠে এবং সে সময় তাহারা সাময়িকভাবে তোপ ও বন্দুকের সম্মুখে নীরব থাকিতে বাধ্য হইলেও পরে সকলেই ইংরেজের বিরুদ্ধাচরণে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। ইহাই বিদ্রোহের কারণ। মি. এ্যানসেন সে সময় প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন, আমি স্বচক্ষে এই সন্দেহযুক্ত কার্তুজ দেখিয়াছি, এই বিষয়ে সৈন্যগণের বিদ্রোহ ন্যায়সঙ্গত।

মোহাম্মদ আবদুর রজ্জাক খাঁ : *সিপাহী বিদ্রোহ ও চিত্রের অপর দিক।*
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪

www.pathagar.com

স্বরাজ : ইংরেজ বিরোধী চেতনা

আমার মতে ইংরাজ জাতি দেবতাও নহে, ফেরেস্তাও নহে। সোজাসুজি একটা মানুষ সমাজ। মানুষের সমস্ত স্বার্থপরতা ইংরাজের মধ্যেও ষোলআনাভাবে বিদ্যমান আর ভারতকে কার্য্যতঃ সম্পূর্ণ অধীন করিয়া রাখাই হইতেছে ইংরাজ জাতির প্রধানতম স্বার্থ। এই স্বার্থ ত্যাগ করিতে ইংরাজ যে কস্মিনকালেও সহজে স্বীকৃত হইবে না, এ কথাটা আমাদিগকে সর্বদা খুব ভাল করিয়া স্মরণ রাখিতে হইবে। তাহা হইতেই 'স্বরাজ সাধনা'র প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারিবে। ইংরাজের নিকট হইতে স্বরাজ আদায় করিয়া লইতে হইলে সেজন্য বহুদিন ধরিয়া আমাদিগকে যে কি কঠিন তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে- নিজেকে, নিজের সমাজকে এবং নিজের দেশবাসীকে সেজন্য কিভাবে উদ্বুদ্ধ, কি চেতনায় জাগ্রত এবং কি সাধনায় তদগত করিয়া তুলিতে হইবে, তাহার আন্দাজ কেবল এই অবস্থায় করা যাইতে পারে।

আলোচনা : *স্বরাজ সাধনা।*
১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৪ (১৯২৭)

ইসলামে নারীর মর্যাদা

দুনিয়ার সর্বপ্রথম মুসলমান, একজন নারী— বিবি খদিজা।
এছলামের সর্বপ্রথম মোজ্‌তাহেদ, একজন নারী— বিবি আয়েশা।
এছলামের সর্বপ্রথম শহীদ, একজন নারী— আম্মার জননী বিবি ছমিয়া।
এছলামের সর্বপ্রথম হাসপাতালের সর্বপ্রথম পরিচালিকা, একজন নারী—বিবি রাফিজা আছলামিয়া।
এসলামের ইতিহাসে জলযুদ্ধ যাত্রার সর্বপ্রথম আগ্রহশালিনী ছিলেন, একজন নারী—বিবি উম্মে হারাম। অবশেষে হজরত ওছমানের খেলাফত কালে সাইপ্রাস অভিযানে বীর সৈনিকের বেশে যুদ্ধের ময়দানে ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া ইনি শাহাদৎ প্রাপ্ত হন।

আর কত বলিব? কাহাকে বলিব? মোছলেম বঙ্গের এই জীবন গন্ধহীন শূন্য গোরস্থানে এ আর্তনাদের কোন সার্থক প্রতিধ্বনি জাগিয়া ওঠা কখনও সম্ভবপর হইবে না কি?

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *এছলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার।*
১ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৪

হিন্দু ও মুসলমান বিরোধ

ইংরাজি শিক্ষা তথা পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং বিভিন্নমুখী শিক্ষা ও সভ্যতার আলোচনায় এই মুছলমানগণ হিন্দুদের তুলনায় যে নিতান্ত নগণ্য, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে

www.pathagar.com

হইবে না। এখন মজা দেখুন, কলিকাতায় হিন্দু ছাত্রেরা ব্রাহ্ম কলেজে স্বরস্বতী পূজা করিবার জন্য যখন হিন্দু আকাশ-পাতাল তুমুল আন্দোলনে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে—ঠিক সেই সময় ঢাকার ন্যায় একটা মুছলমানপ্রধান শহরে জোর করিয়া প্রকাশ্যভাবে রমজানের ন্যায় এছলামের একটা পবিত্র সাধনাকে অবমানিত করিবার একমাত্র উদ্দেশ্যে সেখানকার কযেকজন শিক্ষিত এবং মুছলমান নামধারী ছাত্র ও অধ্যাপক আদালতের আশ্রয় লইতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না।

আলোচনা : *কাটমোল্লা ও আকাট পণ্ডিত।*
১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৪ (১৯২৭)

কাটমোল্লা ও আকাট পণ্ডিতের কাণ্ড

একদিকে তাহারা নিজেদের ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, অন্যদিকে বাঙালা ও ইংরাজিতে তাহারা ক্রমাগত পড়িয়া আসিয়াছে ভারত ও ইউরোপের উত্তেজনাকর ইতিহাস। তাহার উপর এই সময় সোনায় সোহাগা করিয়া দিতে লাগিলেন—মোছলেম বঙ্গের কুসংস্কার জর্জরিত অদূরদর্শী ও জাহের পরস্ত মৌলভী সমাজ। তাঁহারা এই সময় এছলামের যে স্বরূপ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া স্বধর্মজ্ঞ শিক্ষিত যুবকগণ লজ্জায় মাথা হেঁট করিয়া লইল, ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত করিতে লাগিল। তখন আরম্ভ হইল—এ পক্ষের কথার বহর আর ফৎওয়ার শাসন। স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনা করিয়া কথা বলা তাঁহারা এক প্রকাশ জানেনই না, তাহার উপর জমাট বাঁধা তকলিদ এবং সম্পূর্ণ অনৈছলামিক বোজর্গানে দিন পূজায় বা সেই পূজার বাহানায় স্বর্গের স্বাশত বাণী পবিত্র কালামুল্লার আর হজরত রসুলে করিমের প্রচারিত মূল ধর্মশাস্ত্র হইতে তথা প্রকৃত এছলাম হইতে এই আলেম সমাজ নিজেরাই দূরে সড়িয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এই শ্রেণীর কাটমোল্লা ও আকাট পণ্ডিতের মধ্যে তখন একটা তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়া গেল। এবং একদিকে যেমন আকাট পণ্ডিতের প্রত্যেক কথাকে "নউজ বিল্লা—কুফরী কালাম—বিবি তালাক" ইত্যাদি যুক্তি প্রমাণের দ্বারা কাটমোল্লার দল 'হাবা আম্-মনছুরা' করিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিলেন, অন্যদিকে ইউরোপের ও হিন্দু সমাজের অনুকরণ মাত্রকে সম্বল করিয়া আকাট পণ্ডিতের দল কাটমোল্লার কুসংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন। অথচ এই উভয় দলই পরের অনুকরণে অন্ধ। এছলামের প্রকৃত স্বরূপ কাটমোল্লার নিজের দেখিবার ও দেখাইবার শক্তি ছিল না। আকাট পণ্ডিতও তাহার সন্ধান করিয়া দেখার কোন আবশ্যকতা অনুভব না করিয়া—যেহেতু মোল্লারা তাহার সমর্থন ও সাহেব লোকেরা তাহার প্রতিবাদ করিতেছে—চোখ বন্ধ করিয়া হিন্দুদের অবলম্বিত ভাষা ও পরিভাষাগুলির গলাধঃকরণ উদগারণ ও চর্ব্বিত চর্ব্বণ আরম্ভ করিয়া দিলেন। তাঁহারা এতটুকু কথা চিন্তা করিয়া দেখার অবকাশ পাইলেন না যে, খ্রিষ্টান বা হিন্দুধর্ম্ম সভ্যতা ও উন্নতির আলোক সহ্য করিতে পারে নাই বলিয়া এছলামও যে পারিবে না, তাহার কোন মানে নাই। তাহাদের দেখা ও দেখান উচিত ছিল যে,

www.pathagar.com

এছলামের অমুক বিশ্বাস বা অমুক অনুষ্ঠান মানুষের উন্নতির বর্তমান সভ্যতার পরিপন্থী। তাহা তাঁহারা করেন নাই এবং করিতে পারিবেনও না।

আলোচনা : *কাটমোল্লা ও আকাট পণ্ডিত।*
১ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৪

ইসলামধর্মের শত্রু : নজরুল ইসলাম (প্রসঙ্গ : পৌত্তলিকতা)

এ সম্বন্ধে কোন কবিতা উদ্ধৃত না করাই সঙ্গত। কারণ, যাঁহারা নজরুলের কাব্য-সাহিত্যের সহিত পরিচিত, তাঁহারা সকলেই এ কথা অবশ্য স্বীকার করিবেন যে তাঁহার অধিকাংশ allusion ও reference রামায়ণ-মহাভারতের দেব-দেবী সংক্রান্ত। কাজেই তাঁহার চিন্তাধারা ও আদর্শও পৌত্তলিক ভাবাপন্ন হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি। পৌত্তলিকতার সন্ধান করিব শুধু এই লক্ষ্যটুকু মনের ভিতর করিয়া—নজরুলের লেখা পাঠ করিলেই পাঠক যেখানে সেখানে তাঁহার এই পৌত্তলিক মনোভাবের পরিচয় পাইবেন। তাই এ সম্বন্ধে আমরা কোন কবিতা উদ্ধৃত করিয়া বৃথা সময় ও স্থান নষ্ট করিতে চাই না। নমুনা স্বরূপ আমরা পাঠকবর্গকে মাত্র তাঁহার "রক্তাম্বর ধারিণী মা" এবং "আগমনী" কবিতাদ্বয় হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি :

করবো মায়
ডরবো কায়?
ধরবো পা'য় কার সে আর
বিশ্ব-মা'ই পার্শ্বে যার।
....
ঘরে ঘরে আজি দীপ্ জলুক
মার আবাহন গীত চলুক।
(আগমনী)।
দেখ মা আবার দনুজ-দলিনী
অশিব-নাশিনী চণ্ডী-রূপ
ইত্যাদি।
(রক্তাম্বর ধারিণী মা)।

ইসলাম-সন্তান নজরুল ইসলাম ত এইরূপ দুর্গা-কালীর অর্চনা করিয়াছেন, কিন্তু হিন্দুকুলোদ্ভব রবীন্দ্রনাথ এই পৌত্তলিকতা সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন, পাঠক তাহা একবার দেখুন :

মুগ্ধ ওরে স্বপ্নঘোরে
যদি প্রাণের আসন-কোণে
ধুলায় গড়া দেবতারে

www.pathagar.com

লুকিয়ে রাখিস আপন মনে,
চিরদিনের প্রভু তবে
তোদের প্রাণে বিকল হবে
বাহিরে সে দাঁড়িয়ে রবে
কত না যুগ যুগান্তরে।

এম. আজিজুর রহমান : *ইসলাম ও নজরুল কাব্য-সাহিত্য।*
২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৫ (১৯২৮)

নজরুল বিচার : সমাজে রক্ষণশীলতা

আমরা অতি সংক্ষেপে ইসলামের আলোকে কবি নজরুল ইসলামকে একবার দেখিয়া লইলাম। আশাকরি পাঠকবর্গ ইহা দ্বারা নিজেরাই প্রশস্ততর আলোচনার সুযোগ পাইবেন এবং নিজেরাই বিচার করিয়া দেখিবেন—কবি যে ভাবধারা প্রচার করিয়াছেন এবং যে আদর্শ সমাজের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন, তাহা অনুসৃত বা গৃহীত হইলে ইসলামের এবং তথা মুসলমান জাতির সমূহ অকল্যাণ ঘটিবে কি, না। স্বীকার করি তাঁহার যথেষ্ট কবি প্রতিভা আছে, স্বীকার করি তিনি বাঙলা সাহিত্যে একটা নতুনত্ব আনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে প্রতিভা, সে শক্তি যদি ইসলামের মূলোৎপাটনের জন্যই ব্যয়িত হয়, তবে তাহা লইয়া গৌরব করিবার কিছু থাকে কি? মুসলমানের প্রাণ-শক্তির সমস্ত উৎসমুখ তিনি রুদ্ধ করিয়া দিতেছেন, অথচ মুসলমান তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছেন না। সমাজকে আজ জিজ্ঞাসা করি—খোদাদ্রোহিতা, পয়গম্বরদ্রোহিতা, প্রতিমা ও দেবদেবী পূজা, জন্মান্তরবাদ, অবতারবাদ, জেনা, চুরি, ডাকাতি, মিথ্যা—এই সমস্তই যদি তাঁহার বাণী হইলে তবে ইসলামের কিছু রহিল কি ? হায় মূঢ় সমাজ।

এম. আজিজুর রহমান : ইসলাম ও নজরুল কাব্য সাহিত্য।
২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৫

উন্নতির নমুনা : নারী

বোঁ বোঁ করে প্লেন উন্নতির পথে ছুটছে- এখন দেখি কি, সেই তূরাণী তরুণের কথাই সত্য, অর্থাৎ প্লেনটা চক্রাকার পথে ঘুরে ঘুরে ক্রমে কালিদাসের বর্ণিত শকুন্তলার যুগে—যখন মুনি কন্যারা গাছের বাকল পরতেন, তাও আবার সব সময় লম্বায় চৌড়ায় যথেষ্ট হত না বলে টেনেটুনে পরতে হত—সেই যুগে এসে পড়েছে। তরুণীদের দিকে আর চাওয়া যায় না।

আমি নিতান্ত মিনতি করে বললুম,—ভায়া তরুণ। দয়া করে তোমার প্লেনটা থামাও, আমি এইখানে নেমে পড়ি। ইরানী তরুণ হাসতে হাসতে বললে, "দাদা। এখনই কি হয়েছে—কোলভীলের যুগ দেখেই ভয় পাচ্ছ? এখনও ত গায়ে রঙ মাখার যুগে এসে পৌছায় নি।

www.pathagar.com

আমি কাকুতি করে বললুম,—দোহাই ভায়া তরুণ। আর না। আমি বুঝতে পেরেছি—তোমরা এখানে আদিমাতা হজরত হাওয়ার যুগে এসে পড়বে। আদিপিতা অভিশপ্ত হয়ে স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে গাছের তিনটা পাতা চেয়ে নিয়ে—একটায় তহবন্দ, একটা দিয়ে জামা আর একটা দিয়ে মাথা ঢাকবার টুপি করেছিলেন। আর আদিমাতা তাঁর লম্বা চুল খুলে দিয়ে সমস্ত গা ঢেকেছিলেন। কিন্তু এখনকার তরুণীদের মাথায় ত চুলও নেই—এরা কি দিয়ে গা ঢাকবে?

মিসেস আর. এস. হোসেন : *উন্নতির পথে।*
২য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৫ (১৯২৮)

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে : স্বামী বিবেকানন্দ

ভারতের জাতীয় জীবন গঠনে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ। তিনি আর্য্য সমাজ নেতাদের মত আদৌ মোসলেম বিদ্বেষী ছিলেন না,—বরং ইসলামের অনুরাগী ছিলেন। অ-হিন্দুদেরকে ম্লেচ্ছরূপে অভিহিত করার তিনি কঠোর প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন, "যেদিন হইতে ভারতে ম্লেচ্ছ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে সেইদিন হইতে ভারতের পতন আরম্ভ হইয়াছে।" তরবারী দ্বারা ভারতে ইসলাম প্রচার হইয়াছিল বলিয়া যে মিথ্যা দুর্নাম রটাইয়া একদল লোক ইসলামকে জগতের চক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করিতে সদাই উৎসুক তাহার তিনি তীব্র প্রতিবাদ করতঃ জলদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন,

The Mahommedan conquest of India came as salvation to the downtrodden, to the poor. That is why one-forth of our people have become Mahommedans. It was not the sowrd that it did at all. It would be the height of madness to think that it was all the work of sowrd and fire. (Swami Vivekamanda's works, Vol. III, Page 652.)

সংবাদিকা।
২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুণ ১৩৩৫

ধর্মীয় ঐক্যের কথা

সকল সত্যই মূলতঃ সেই একই ঈশ্বরে গিয়া পর্য্যবসিত হয়। সেই সত্যের উপলব্ধি মানবের চরম আকাঙ্ক্ষা এবং সেই আকাঙ্ক্ষা প্রকাশই ধর্ম। সেহেতু সাম্প্রদায়িকতা মানবের মধ্যে ভেদ সংঘটনের জন্য ধর্মকেই অস্ত্রস্বরূপ গ্রহণ করে—ঈশ্বরোপসনার অঙ্গ-স্বরূপ তাহারা মানব-ভ্রাতার সঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিবার জন্য তরবারী শাণিত করে। সাম্প্রদায়িকতা পার্থিবতার একটা মারাত্মক মূর্ত্তি। তাহা তাহার নিজের স্বাধীন সীমার মধ্যেই আধ্যাত্মিক আলোকসম্পাতের একমাত্র অধিকারী বলিয়া দাবি করে। আর ঈশ্বরের দোহাই দিয়াই সার্ব্বজনীন ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস করিতে অঙ্গীকার করে।

www.pathagar.com

মানবের ইতিহাস ও মানব অধ্যুষিত বিশ্বজগতের ইতিহাস একই বস্তু। মানুষের কর্ম্মাবলীর মধ্যে যাহা কিছু মহৎ। তাহাই মানবধর্ম এবং ইহা নিশ্চিন্তরূপে প্রতিপন্নও হইয়া গিয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা যতই বৃদ্ধি পাইতেছে ততই এক বিরাট মহাধর্ম গঠিত হইয়া উঠিতেছে। এই ধর্মের সহায়তায় বিশ্বব্যাপী আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের বাণিজ্যে মানবাত্মা তাহার চরম উৎকর্ষ লাভ করিবে।

সংগ্রহ : *রবীন্দ্রনাথের অভিভাষণ।*

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফালগুন ১৩৩৫

অবরোধ প্রথার কুফল

এছলামের নির্ধারিত পর্দ্দা জিনিসটা যে খুবই ভাল এবং দরকারি, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশে সাধারণতঃ পর্দ্দার পরিবর্তে অবরোধ প্রথার সৃষ্টি করিয়া স্ত্রীলোকদিগকে তথা সমাজটাকে যে দিন দিন কিভাবে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর করিয়া দেওয়া হইতেছে, চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক হইতে এই প্রবন্ধে আমরা সেই বিষয়েই আলোচনা করিব।

পর্দ্দা বলিতে আমরা ইহাই ধরিয়া লইয়াছি যে, স্ত্রীলোকদিগকে এমনভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, যাহাতে তাহারা একেবারে 'অসূর্য্যম্পশ্যা' উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হয়। অর্থাৎ মানুষ ত দূরের কথা সূর্য্যের আলোকও যেন তাহারা দেখিতে না পায়। শুধু ইহাই নহে, যেভাবে তাহাদিগকে রাখা হয় তাহাতে একটু মুক্ত বাতাস হইতেও তাহারা বঞ্চিত থাকে। ইহারই ফলে তাহাদের জীবনীশক্তি (power of resistance) ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া আসিতেছে এবং তাহারা কোন না কোন রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে প্রাণ হারাইতেছে।

যে সমস্ত ব্যাধি দ্বারা এইসব স্ত্রীলোকেরা সাধারণতঃ আক্রান্ত হইয়া থাকে, তন্মধ্যে ক্ষয়কাশই (Phthisis) হইতেছে সবচেয়ে বেশি। কেননা, মুক্ত বাতাস এবং সূর্য্যের আলোকই হইতেছে ক্ষয়কাশ জীবাণুর (Tubercle Bacillis) পরম শত্রু। কিন্তু এই অভিনব পর্দ্দার খাতিরে আমাদের স্ত্রীলোকেরা সে দুইটি জিনিস হইতেই বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। ফলে তাহারাই এই দুরন্ত ব্যাধি দ্বারা সহজে আক্রান্ত হইয়া পড়িতেছে। প্রমাণস্বরূপ স্বাস্থ্যতত্ত্ব (Hygience) হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করা হইল।

"The Purda system by excluding the Indian women from the free gifts of nature (Air & light) is to a large extent responsible for the increased incidence of Tuberculosis amongst them". (Das's Hygiene, P. 559, 1925 (edn.)

ডাঃ এ. মালেক : *অবরোধ প্রথার অপকারিতা।*

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফালগুন ১৩৩৫

www.pathagar.com

শিক্ষা খাতে ব্যয়

বাঙলাদেশে শিক্ষার ব্যয় কত কম হয়, তাহা নানা সুপ্রসিদ্ধ দেশের শিক্ষার ব্যয়ের সহিত তুলনা করিয়া দেখান যাইতে পারে। আমরা তাহা না করিয়া একটি ছোট এবং অপেক্ষাকৃত অল্পজ্ঞাত দেশের শিক্ষার ব্যয়ের সহিত বাঙলার শিক্ষার ব্যয়ের তুলনা করিব। দক্ষিণ আমেরিকা চিলি দেশের লোক সংখ্যা ৩৯ লক্ষ মাত্র। আমাদের শুধু ময়মনসিংহ জেলারই লোক সংখ্যা ৪৮ লক্ষ। বঙ্গের লোক সংখ্যা ৪ কোটি ৬৭ লক্ষ। ১৯২১ সালে চিলিতে উহার গর্বমেন্ট শুধু প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেড় কোটি টাকা খরচ করিয়াছিল এবং অন্যবিধ শিক্ষার জন্য এক কোটির উপর—মোট আড়াই কোটি টাকার উপর। বাংলাদেশে ১৯২৪-২৫ সালে গবর্ণমেন্ট সব রকম শিক্ষার জন্য ১৩,৩৩,৮২,৯৬২ টাকা খরচ করিয়াছিল। অর্থাৎ চিলিতে ৩৯ লক্ষ লোকের শিক্ষার জন্য আড়াই কোটি টাকার উপর সরকারি খরচ হইয়াছে। বাংলাদেশে তার প্রায় বারো গুণ লোকের জন্য এক কোটি চৌত্রিশ লক্ষ টাকা খরচ হইয়াছে।

আলোচনা।

২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফালগুন ১৩৩৫

মুসলিম সমাজের অধঃপতন

ঘোর ঘনঘটা; আঁধার গগন, বিজলী হাসিছে অট্টহাসি,
নিখিল বঙ্গ-মুসলিম আজি ধ্বংস ভেলায় যেতেছে ভাসি।
কূলে কূলে ঐ ডাকে শিবাদল, কুকুর গৃধিনী বিকট রবে,
সমাজ শবের আশায় আশায় দিন গণিতেছে বসিয়া সবে।

... ...

পীর মোল্লা ও নবীন-প্রবীণ রাজনীতিবিদ ডাকুর দলে
সমাজ অঙ্গ ঘায়েল করিছে দেশ ও জাতির সেবার ছলে।

... ...

পীর খুলিয়াছে মুরিদ ব্যবসা, খোশ তবিয়তে রয়েছে বেঁচে
মৌলভী আর মোল্লা খেতেছে আল্লার পাক কালাম বেচে।
'বিবি তালাক আর 'কাফেরী' ফতোয়া হরদম তারা করিছে জারী,
মানুষ মারিয়া মানুষের সাথে করিছে মানুষ ব্যবসাদারী।

গোলাম মোস্তফা : একখানি চিঠি। (হজযাত্রী মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেবের প্রতি)

২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৫

www.pathagar.com

আশরাফ-আতরাফ

কিছুদিন হইল মাসিক 'সওগাত'-এর কোন সংখ্যায় 'আশরাফ-আতরাফ' শীর্ষক একটি ছবি দেখিয়াছিলাম। ছবির বিষয় এই যে, আশরাফ ঘৃণায় নাক ছিটকাইয়া আত্‌রাফকে বলিতেছেন, 'তুমি দূরে থাক, আমার নিকট আসিও না।" আশরাফের এই ব্যবহারে বড্ড রাগ হইল—এত বড় আস্পর্দ্ধা। মানুষকে ঘৃণা; ইচ্ছা হইল, তখনই আশরাফদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া দেই, কিন্তু তাহাতে একটু অসুবিধা ছিল। অসুবিধা এই যে, আমি নিজে আশরাফ-এর তালিকায় নাম লিখাইয়া ফেলিয়াছি। সুতরাং জেহাদ ঘোষণা করিলে যদি প্রথম তরবারি আমারই গলায় পড়ে তবে ত সমাজ সংস্কারের ইচ্ছা, আকাঙ্ক্ষা সবই সাফ হইয়া যাইবে।

মিসেস আর. এস. হোসেন : *পঁয়ত্রিশ মণ খানা।*
২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৫

বাংলা ভাষা চর্চা ও ইসলাম ধর্ম্ম

'তরুণ জামাতের' এক অধিবেশনে সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্র রায় মহাশয় "বঙ্গভাষার উপর মুসলমানের প্রভাব" শীর্ষক যে গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধটি সম্প্রতি পাঠ করেন তাহার সারাংশ মাসিক মোহাম্মদীর এই সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। শ্রদ্ধেয় দীনেশবাবু নানাদিক দিয়া বিষয়টির সবিস্তার আলোচনা করেন। আমাদের সমাজে এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন যাঁহাদের ধারণা যে, বাঙলা সাহিত্যের চর্চ্চা করা এসলামধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য। ইহা যে কতদূর ভ্রমাত্মক তাহা আলোচ্য প্রবন্ধটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অনায়াসে বুঝিতে পারা যাইবে।

আলোচনা (সম্পাদক) : *বঙ্গভাষায় মুসলমানের দান।*
২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৩৫

কার্ল মার্ক্সের কথা

১৮১৮ সালে ৫ই মে ট্রাভে নগরে কার্ল মার্কস জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩৬ সালে তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৮৪২ খ্রিষ্টাব্দে কার্ল মার্কস তাঁহার বিখ্যাত কাগজ Rheinische Zeitung বাহির করেন। ১৮৪৭ খ্রি. অ. প্রথম লন্ডনে সাম্যবাদীদের এক কংগ্রেস্ বসে। সেই কংগ্রেসেই মার্কস ও তাঁহার সহকর্মী বন্ধু এঙ্গেল্‌স্ একটি কার্য্যপদ্ধতি তৈয়ারি করেন। তাহাই জগতে Communist manifesto বলিয়া বিখ্যাত। এই কার্য্যপদ্ধতিতে আছে সামাজিক বিবর্তনের ফলে সমাজের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রেণী বিভাগ; সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ এবং শ্রমজীবী বিপ্লবের কথা; সাম্যবাদীদের আন্তর্জাতিক বিপ্লব-

www.pathagar.com

ঘোষণা; অন্যান্য সাম্যবাদী মত খণ্ডঠ। মার্কসের শেষ জীবন নির্ব্বাসনে ও চরম দারিদ্যে অতিবাহিত হয়। ১৮৮৩ খ্রি. অ. নির্ব্বাসিত অবস্থাতেই তিনি লন্ডনে দেহত্যাগ করেন।

আলোচনা : *বিংশ শতাব্দীর কাহিনী (সাম্যবাদ ও কার্ল মার্কস)।*
বার্ষিক মোহাম্মদী : ১৩৩৫ (১৯২৮)

সমাজ : বিংশ শতাব্দী

বর্তমান যুগের প্রবর্তনের মুখে দুইটি পুস্তক দেখা যায়। এই দুইখানিই প্রায় এক সময়ই লেখা হয়। এই দুইখানি পুস্তকে পূর্ব্বজগতের চিন্তাধারাকে ছিন্ন করিয়া বর্তমান যুগের প্রধানতম চিন্তাধারাগুলির জন্ম হয়। একটির নাম 'Origin of species', অপরটির নাম 'Das Capital'. একটির লেখক ডারউইন- অপরটির লেখক কার্লমার্কস। বিবর্তনের মধ্য দিয়া মানব অভিব্যক্ত হইয়াছে—তাহার এই অভিব্যক্তির মধ্যে কোথাও রহস্যের স্তর নাই—ডারউইনের এই মতবাদের উপর বর্তমান জগতের মনোজগৎ প্রতিষ্ঠিত। আজ সমগ্র জগতের মধ্যে যে সংগ্রাম জাগিয়াছে—প্রতিমানুষের জন্মস্বত্ব দাবি করিয়া জগৎজোড়া যে তুমুল আন্দোলন চলিয়াছে—সমগ্র দেশে এবং সমগ্র জাতির মধ্যে, তাহার মূল কার্ল মার্কসের Das Capital এর মধ্যে অন্তর্নিহিত।

ডারউইন যেমন বিশ্বসৃষ্টির জগতে বিবর্তনবাদ আনিলেন, মার্কসও সেই রকম মানবের সৃষ্ট জগতে এক নূতন বিবর্তনবাদ আনিলেন। তিনি বললেন যে, মানব সমাজ যাযাবর অবস্থার পর হইতে আপনার অজ্ঞাতসারে দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক ভাগের নাম দিয়াছেন Capitalist—মূলধনওয়ালা আর এক দলের নাম দিয়াছেন Proletariat—সর্বহারা। মূলধনওয়ালাদের হাতে জগতের অধিকাংশ সম্পত্তি ও সমস্ত দ্রব্য সৃষ্টির ক্ষমতা ও অধিকার। আর সর্বহারাদের একমাত্র মূলধন তাহাদের শ্রম। মার্কস অতীত ইতিহাস হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত সমাজের ইতিহাসকে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী বিভাগে বিভক্ত দেখাইয়াছেন। একেই মার্কসের Class Society বলে এবং এই দুইটি বিভিন্ন শক্তি এক সঙ্গে থাকার দরুন যে সংঘর্ষ সমাজের মধ্যে চলিয়াছে মার্কসের পরিভাষায় তাহাকে Class-struggle বলা হয়।

মার্কস নীতির আর একটি মূল কথা হইতেছে যে, অর্থনৈতিক কারণই জগতের সমস্ত সামাজিক বিবর্তনের মূল। সমাজের ভাঙ্গাগড়া, এক স্তর হইতে অন্যস্তরে যাওয়া এ সবই অর্থনৈতিক কারণেই সংঘটিত হয়। মার্কস প্রচার করেন যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্রম-বৃদ্ধি মানবতার দিক দিয়া নিতান্ত অকল্যাণকর এবং অচিরেই জগতে এক তুমুল আন্দোলন আসিবে যাহাতে এই অর্থলোলুপ সাম্রাজ্যবাদী সভ্যতা ভাঙ্গিয়া গিয়া এক নূতনতর সর্ব্বজাতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবে।

আলোচনা : *বিংশ শতাব্দীর কাহিনী (সাম্যবাদ ও কার্ল মার্কস)।*
বার্ষিকী মোহাম্মদী : ১৩৩৫ (১৯২৮)

www.pathagar.com

বিজ্ঞানে মুসলমানের অবদান

ডারউইন ও ওয়ালেসের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে মুসলমান পণ্ডিতেরা এই ক্রমবিকাশ তত্ত্বের এবং তাহার আনুষঙ্গিক অন্যান্য বহুতত্ত্বের বিষয় সম্যকরূপে অবগত ছিলেন এবং তাঁহারা দুনিয়াকে ঐ সকল তত্ত্বের সংবাদ যথেষ্ট স্পষ্ট ভাষায় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। মুছলমানের কপাল পুড়িয়াছে—নিজের অতীত সম্বন্ধে সে আজ সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাই ডারউইনকে এই মতবাদের প্রথম আবিষ্কারক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইতে তাহারাও আজ কুণ্ঠিত হইতেছে না। আত্মবিস্মৃত জাতির পতন এইরূপেই ঘটিয়া থাকে। ... আমাদের মনে হয়, বিখ্যাত পণ্ডিত জ্বাহেজই সর্বপ্রথমে এই বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন। জ্বাহেজ জীববিজ্ঞান সম্বন্ধে 'কেতাবুল হায়ওয়ান' নামক একখানা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। প্রাণীও উদ্ভিদ জগতের বিভিন্ন স্তর এবং আধার ও পারিপার্শ্বিকতাভেদে তাহাদের বিকাশ ও বিবর্তনের বিভিন্নতা ঐ পুস্তকে বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। ২৫৫ হিজরীতে জ্বাহেজ পরলোকগমন করেন। 'এখ্ওয়ানছ-ছাফা' পুস্তকের কথা আমাদের পাঠকগণের অনেকেই অবগত আছেন। ইহার উদ্ভিদ সংক্রান্ত খণ্ডে স্পষ্ট ভাষায় এই দাবি করা হইয়াছে যে, জড়, উদ্ভিদ, সাধারণ জীব ও মানুষ, একই ক্রমবিকাশ ধারার বিভিন্ন পর্য্যায় ব্যতীত আর কিছুই নহে।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *অতিব্যক্তিবাদ ও মুছলমান।*
বার্ষিক মোহাম্মদী : ১৩৩৫ (১৯২৮)

বিজ্ঞান চেতনা : ডারউইন ও বিবর্তনবাদ

ডারউইনের প্রবর্ত্তিত বিবর্তনবাদ বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার জড়বাদের মূল কারণ। ডারউইন বিজ্ঞানের সহায়তায় প্রমাণ করিয়াছে যে জীব সৃষ্টি অথবা এই বিশ্ব সৃষ্টির মধ্যে কোনও রহস্য নাই। সমস্ত বস্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বশে অজ্ঞাত স্বরূপ প্রোটোপ্লাজম হইতে বিবর্তনের অনুযায়ী দেশ, কাল, পাত্র ভেদে বিভিন্ন আকার ধারণ করিয়াছে। সমস্ত জিনিস জড় পদার্থ হইতে সৃষ্ট এবং সেই জন্য তাহার মধ্যে অপরিজ্ঞেয় অনন্ত বলিয়া কিছুই নাই। রূপে হইতে রূপে অনন্ত পরিবর্তনের মধ্য দিয়া নিছক বৈজ্ঞানিক নিয়মে এই জগৎ চলিয়াছে। বর্তমান যুগের সকল কর্ম্মের মধ্যে যে জড়বাদ ও নাস্তিকতা আসিয়াছে—তাহার মূল ডারউইনের এই বিবর্তনবাদ। এই দেহকে অণুপরমাণুতে ছিন্নভিন্ন করিয়া বৈজ্ঞানিক দেখিয়াছে—ইহা রহস্য রহিত। আত্মা বলিয়া ইহার মধ্যে কিছুই নাই। এবং এই সৃষ্টিকে চালাইবার জন্য কোনও পরম বিধাতা পুরুষের অস্তিত্বের কোনও প্রয়োজন নাই। কারণ ইহা আপনা হইতে উদ্ভূত এবং সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক নিয়মে চলিতেছে। জড়বস্তুর জীবন ইহজগতেই মৃত্যুতে সমাপ্ত হইয়া যায়—অর্থাৎ রূপান্তর গ্রহণ করে। বস্তুর মাত্রা জগতে নির্দ্দিষ্টই থাকিয়া যায়। যেমন জল মরিয়া গিয়া বাষ্প হয়, বাষ্প মরিয়া গিয়া পুনরায় জল হয়। ডারউইনের

www.pathagar.com

বিবর্তনবাদের ফলে বর্তমান জগতে আত্মার অবিনশ্বরতা ও পরলোকের স্থলে বস্তুর অবিনশ্বরতা ও অভিব্যক্তিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আলোচনা : *বিংশ শতাব্দীর কাহিনী (ডারউইন ও বিবর্তনবাদ)।*

বার্ষিক মোহাম্মদী : ১৩৩৫ (১৯২৮)

ইতিহাস চেতনা

ইবনে খালদুন বলেন যে, ইতিহাসকারের প্রধান কর্তব্য হইতেছে সমস্ত ঘটনার মধ্য দিয়া এই মহাসত্যকে রূপ দেওয়া যে, সময় অনন্ত ও অবিচ্ছিন্ন, অতীত ও বর্ত্তমান বলিয়া আমাদের সুবিধামত আমরা সময়কে ভাগ করিয়া লইয়াছি মাত্র। সমগ্র মানব সমাজ এক এবং পরস্পর পরস্পরের মুখাপেক্ষী। যে সমস্ত অতীতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা নিত্য তাহার মাটির কবরের উপর মমতায় ফুল বিছাই, তাহা মরে নাই। ইতিহাসকারের কর্ত্তব্য মানুষকে বলা, অতীত মরে না—মানবাত্মার মতই সময় অমর। বহু অদৃশ্য নক্ষত্র যেমন আমাদের অজ্ঞাতসারে এই পৃথিবীতে আলো দান করে, সেই রকম আমাদের অতীত আমাদের অজ্ঞাতসারে জীবনের যাত্রা-পথের সাথে সাথে আছে। আমার কাছে যাহা অজ্ঞাত—ইতিহাসকারের কর্ত্তব্য তাহাকে পরিস্ফুট করিয়া দেওয়া। ইতিহাসকার ঘটনার সাহায্যে প্রমাণ করিয়া দেন যে অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান তাহা শুধু মানুষের অজ্ঞতার সৃষ্টি। ইবনে খালদুন ইতিহাসকে এই বিরাট দর্শনের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। ইবনে খালদুনের মতে ইতিহাস ঘটনার পুঁথি নয়। যে সমস্ত চেষ্টা, যে সমস্ত সাধনা, মানুষ অতীতে অর্জ্জ করেছে, বর্ত্তমানের অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাহার যোগসাধন করিয়া দেওয়াই ইতিহাসকারের মুখ্য উদ্দেশ্য। আজ সমগ্র ইউরোপে এইরূপে ইতিহাস রক্ষা করা হইতেছে। ইতিহাস-বিজ্ঞান বলিয়া এক প্রকারের নূতন চিন্তাধারাও ইউরোপে দেখা দিয়াছে। ইবনে খালদুন এই ইতিহাস-বিজ্ঞানের জনক।

শেহাবুদ্দিন আহমদ : *ইবনে খালদুনের মতবাদ।*

বার্ষিক মোহাম্মদী : ১৩৩৫ (১৯২৮)

মুসলিম সমাজের সংকট

মুসলমানের জ্ঞানগত পতনের সূত্রপাত হইয়াছে এই পথ ধরিয়া। এই সর্বনাশটা পাকাপাকিভাবে জমিয়া ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানের মন ও মস্তিষ্কের উপর স্থবিরতার একটা হিমালয় পাহাড় স্থায়ী আসন জমাইয়া বসে। তখন এই হিমালয়ের চাপে মুছলমানের জাতীয় মস্তিষ্ক এমন নিষ্পেষিত ও হিমাড়ষ্ট হইয়া পড়ে যে, তখন—ধর্মশাস্ত্র ত অনেক দূরের কথা, তৎকালীন প্রচলিত ন্যায় দর্শন ও বিজ্ঞানকেও তাঁহারা চরম এবং চিন্তা ও বিচারের অতীত

www.pathagar.com

বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইলেন। ইতিহাস প্রভৃতি জ্ঞান-সেবার প্রত্যেক বিভাগেই মুছলমানের এই দুর্দশা উপস্থিত হইল। আমাদের 'হযরত সাহেবেরা' বড় বড় আছা ও কাফেরী ফৎওয়া লইয়া সমাজের মাথার উপর প্রকট হইয়া জোর গলায় ঘোষণা করিতে লাগিলেন—এই স্থবিরতার নামই প্রকৃত এছলাম। অবশ্য এই হিমালয়কে ঠেলিয়া ফেলার জন্য সময় সময় চেষ্টা চরিত্রও যে কিছু কিছু হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলিতে হইতেছে যে, এই চিন্তার নায়কেরা মশাল ধরিয়া ছিলেন নিজেরা চোখ বন্ধ করিয়া। ফরে নিজেদের এই অজ্ঞতার অবস্থার সহিত অন্যকে পথ দেখাইবার অস্বাভাবিক ব্যবস্থাটা খাপ খাইয়া উঠিতে পারিল না। বর্তমান যুগে এই স্থবিরতার ফলে অবস্থা যে কিরূপ শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে,তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। একদিকে আমাদের আলেম সমাজ সত্যকার এছলামকে নিজেদের সংস্কার ও খেয়ালের আবরণে চাপা দিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছেন। সত্যকার এছলাম অপেক্ষা এই খেয়ালগুলির মর্যাদা যে তাঁহাদের নিকট অধিক, তাহা প্রত্যেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরীক্ষা দ্বারাই প্রমাণিত হইয়া যাইতেছে। অন্যদিকে মূলতঃ অসুদদ্দেশ্যে প্রবর্তিত ইংরেজি শিক্ষার ফলে এবং যুগের সর্বব্যাপী সাধারণ আবহাওয়ার প্রভাবে ধর্মের প্রতি একটা অনাস্থার ভাব দেশময় সংক্রমিত। এই ভাবের প্রভাবে অভিভূত হইয়া মোছলেম-বঙ্গের ইংরেজী শিক্ষিত যুবকগণ একটু বেসামাল হইয়া পড়িয়াছিল। ভাষা সমস্যার ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রণালীর কল্যাণে এদেশে সে সময় হিন্দুস্থানের মত এমন মনীষীর উদ্ভব হইল না, যাঁহারা হিন্দুস্থানের আলেম ও ইংরাজি শিক্ষিত পণ্ডিতগণের মত এই অনাস্থার মূলোৎপাটন করিতে সমর্থ হইতেন। বরং তাঁহারা পূর্বকথিত আছা ও কাফেরী ফৎওয়ার উপর নির্ভর করিয়া যে জিনিসটাকে এছলামরূপে তাহাদিগের সম্মুখে উপস্থাপিত করিলেন,তাহা দেখিয়া নব্য সমাজের মনের অজ্ঞাত অন্তস্থলে একটা অস্ফুট আর্তনাদের সৃষ্টি হইল—ধর্ম আর বিবেককে এক সঙ্গে অন্তরে স্থান দান করা তাহারা যেন কষ্টকর বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পক্ষান্তরে যে সহজিয়া ও স্বেচ্ছাচারীর দল ধর্ম ও নীতির ভয়ে একদিন আড়ষ্ট হইয়া বসিয়া ছিল, চিরন্তন নিয়ম অনুসারে এই সুযোগে তাহারা কোমর বাঁধিয়া ময়দানে আসিল। আলেম সমাজের দ্বারা উপস্থাপিত এই তথাকথিত এছলামকে দেখাইয়া ইংরাজি শিক্ষিত যুবকগণকে তাহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাহারা নিজেদের সমস্ত দুষ্ট প্রতিভা ব্যয় করিয়া ফেলিতে কুণ্ঠিত হইল না।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *সমস্যা ও সমাধান।*
১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫ (১৯২৮)

আলেম সমাজের দোষ-ত্রুটি

এদেশের আলেম সমাজের যে অনেক দোষ-ত্রুটি আছে এবং মঙ্গলের জন্য সেগুলির প্রতিকার যে নিতান্ত আবশ্যক, একথা আমরা অনেকদিন হইতে বলিয়া আসিতেছি। এই সব দোষ-ত্রুটি, তাহার কার্য্য-কারণ ও সেগুলির প্রতিবিধানের উপায় সম্বন্ধে, নিজেদের সামান্য জ্ঞান অনুসারে, আমরা বারম্বার বিস্তারিতরূপে আলোচনা করিয়াছি- এবং সেজন্য

www.pathagar.com

আমাদিগকে অন্ধ-বিশ্বাসী ও সংস্কার বিরোধী আলেম সমাজের যথেষ্ট বিরাগভাজনও হইতে হইয়াছে। সুখের বিষয় বাঙলার কএকজন আলেম নিজেদের মারাত্মক অবস্থা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার মূলীভূত কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া সে সমুদয়ের প্রতিকারের জন্য তাঁহারা যথাসাধ্য চেষ্টারও ত্রুটি করেন নাই।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : সমস্যা ও সমাধান।
১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫

উভয়দলের দোষ

আসল কথা কোন জাতির যখন পতন হয়, তখন সেই পতনের কারণগুলি তাহার সমস্ত অঙ্গে সমানভাবে সংক্রামক হইয়া উঠে। মুছলমানের জাতীয় দুর্দ্দশার মূলীভূত পাপগুলিও সমাজের সমস্ত শাখা-প্রশাখার মধ্যে সমানভাবে সংক্রামিত হইয়া পড়িয়াছে, ইংরেজি-ওয়ালা আর আরবিওয়ালার কোন পার্থক্য এখানে নাই।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : সমস্যা ও সমাধান।
১ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৫ (১৯২৮)

সামাজিক পরিবর্তন ও ইসলাম

ব্যক্তির বিষয় যা বলা গেল সমাজের বিষয়ও ঠিক তাই বলা চলে। Pastural (পশুপালক) সমাজের পক্ষে যে ব্যবহারিক নিয়ম উপযোগী এবং যথেষ্ট, Agricultural (কৃষিজীবী) সমাজের পক্ষে সে নিয়ম সম্পূর্ণভাবে উপযোগী এবং যথেষ্ট নয়। পক্ষান্তরে, Agricultural সমাজের পক্ষে যে ব্যবহারিক নিয়ম বিশেষ উপযোগী, Industrial (বাণিজ্য প্রধান) সমাজের পক্ষে সে নিয়ম খুব সম্ভব যথেষ্ট নয়। প্রশ্ন হচ্ছে—ব্যষ্টির এবং সমষ্টির এই অপরিহার্য্য পরিবর্ত্তনশীলতার মধ্যে ইসলামিক শরিয়তের স্থান কোথায় ?

নব্যতান্ত্রিকেরা বলেন, এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে অপরিবর্ত্তনীয় কোন বিধি-নিষেধ সমষ্টিকে আঁকড়ে ধরে থাকা মঙ্গলপ্রসূ হতে পারে না। সুতরাং ইসলামিক ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। পক্ষান্তরে প্রাচীনপন্থীরা বলেন—ইসলামের শরিয়ৎকে সর্ব্বকালের এবং সর্ব্ব-সময়ের উপযোগী করেই আল্লাহ্‌তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। মানুষ যে অবস্থাতেই থাকুক না কেন, আমাদের শরিয়ৎ তার মঙ্গলের জন্য এবং তার জীবনের সুনিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট। পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন সে শরিয়তের মধ্যে নাই।

আমরা কি এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদের মধ্যে কোন একটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য? যুক্তির কোন মঙ্গলময় মধ্যপথ আবিষ্কার করা আমাদের ক্ষমতার অতীত?

এস. ওয়াজেদ আলী : ধর্ম্ম ও সমাজ।
১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫

www.pathagar.com

ধর্মীয় বিতর্ক

ধর্ম্মের কুৎসা করা আমাদের দেশে একটা Fashion হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুএক জন অপরিপক্ক-মস্তিষ্ক বাঙালি মুসলমানের লেখা পড়লে মনে হয়, ইসলামই আমাদের সর্ব্বনাশ করেছে। ইসলাম না-থাকলে আমরা (বাঙালি মুসলমানেরা) রোমানদের মতো দুনিয়ার উপর বাদশাই করতুম, না হয় গ্রীকদের মতো আর্ট, সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে অতুলনীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভরাজির সৃষ্টি করতুম। ইসলামের বিষময় নিশ্বাসই আমাদের অমূল্য প্রাণ-শক্তিকে নষ্ট করে দিয়েছে।

এসব লেখকেরা ভুলে গেল যে আরবেরা ইসলামের প্রেরণাতেই পৃথিবী জয় করেছিল, তারা ভুলে গেল যে, এই ইসলামের প্রেরণাতেই মধ্যযুগের মুসলমানেরা সাহিত্যে এবং বিজ্ঞানে জগতের দীক্ষা-গুরুর পদলাভ করেছিলেন; তারা ভুলে গেল যে এই ইসলামের প্রেরণাতেই পারস্যবাসীরা জগতের শ্রেষ্ঠ কাব্যসাহিত্যের সৃষ্টি করেছেন। তাঁরা ইসলামের এবং মুসলিম জাতির গৌরবের এবং কীর্ত্তির কথা ভুলে গেল। তাঁরা কেবল মনে রাখেন বাঙালি মুসলমানের দৈন্যের কথা, আর বাঙালি মুসলমানের দুর্দ্দশার কথা।

ইসলাম যদি ভারতবর্ষের তথা বঙ্গদেশে না আসতো তাহলে আজ যারা বাঙালা দেশে নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দেন তাদের সাধারণ অবস্থা যে কিরূপ হতো সে কথা কি লেখক সাহেবদের খেয়াল শরিফে কখনও এসেছে। কল্পনার সাহায্য নিতে তাঁদের আমি বলছি না। একবার তাঁরা মাদ্রাজে গিয়ে অব্রাহ্মণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করে আসুন। আর ব্রাহ্মণেতর জাতির বিষয় মনুসংহিতার বিধানগুলি একবার তাঁরা পড়ে দেখুন। এই দুটি কাজ যদি তাঁরা করেন, তাঁদের জ্ঞান-চক্ষু তাহলে খুলে যাবে। ইসলামকে তাহলে বাঙালি মুসলমানের শত্রুরূপে না দেখে আল্লার প্রেরিত মুক্তির দূতরূপেই তাঁকে দেখতে শিখবেন। ইসলামই বাঙালী মুসলমানকে মনুষ্যত্বের অধিকার দিয়েছে; আর ভবিষ্যতে এই ইসলামের বুনিয়াদে সুপ্রতিষ্ঠ হইয়া বাঙালি মুসলমান উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে।

এস. ওয়াজেদ আলী : *ধর্ম্ম ও সমাজ।*
১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫ (১৯২৮)

ধর্ম ব্যবসায়ী

ধর্ম্মের গোঁড়ামি প্রকৃত ধার্ম্মিকদের মধ্যে দেখা যায় না, সেটা দেখা যায়, ধর্ম্মকে যারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে, সেই বক-ধার্ম্মিকদের মধ্যে। উন্নতির পরিপন্থী ধার্ম্মিকরা নয়, উন্নতির পরিপন্থী হচ্ছে ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী বক-ধার্ম্মিকেরা। অশিক্ষিত এবং অনুন্নত সমাজে যে এই ভণ্ড ধর্ম্ম ব্যবসায়ীদের প্রভাব অত্যন্ত বেশি এবং সে প্রভাব যে জাতীয় উন্নতির বিষম পরিপন্থী সে কথা অবশ্য সত্য। এই ধর্ম্ম ব্যবসায়ী ভণ্ডদের হাত থেকে সমাজকে মুক্ত করা

www.pathagar.com

যে এখন আমাদের একটি প্রধান কর্ত্তব্যের মধ্যে সে বিষয় আমার মনে কোন সন্দেহ নাই। তবে তার জন্য অবশ্য ধর্মকে ত্যাগ করবার কোন দরকার নেই।

এস. ওয়াজেদ আলী : *ধর্ম্ম ও সমাজ।*
১ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৩৫

আরবি শিক্ষা ও ব্রিটিশদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি

বাঙলার মুসলমান সমাজের বর্ত্তমান অধঃপতনের মূলে যে কয়টি রাজনৈতিক কারণ, ওতপ্রোতভাবে লুকাইয়া আছে, এ দেশের আরবি শিক্ষার উপর ব্রিটিশ রাজের বিশেষ কৃপা দৃষ্টি তাহার মধ্যকার একটা প্রধান কারণ। এই শিক্ষাপ্রণালী এবং তাহার ভিতরকার গূঢ় রহস্যগুলির কথা যতই চিন্তা করিয়া দেখা যায়, ততই ইহার সর্ব্বনাশকর রূপটা চোখের সম্মুখে প্রকট হইয়া উঠিতে থাকে। বস্তুতঃ এক শতাব্দী ধরিয়া এই হলাহল মিশ্রিত শরবৎকে বাঙালার মুছলমান আবেহায়াত মনে করিয়া পরমানন্দে পান করিয়া আসিতেছে। দেশের সাধারণ বিষয়প্রণালী সম্বন্ধে আজকাল চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রই একমত—এই বিকৃত শিক্ষাপ্রণালীর মূলে যে সব কূটীল রাজনৈতিক অভিসন্ধি প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করিয়া আসিয়াছে—এখন তাহা কাগজে কলমে পর্য্যন্ত ধরা পড়িয়া গিয়াছে।

এইসব শিক্ষাপ্রণালীর আমূল সংস্কার হওয়া বাঙলার মুছলমান সমাজের পক্ষে বিশেষ করিয়া আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে এই শিক্ষাপ্রণালীই হইতেছে জাতির প্রকৃত জীবনকাঠি মরণকাঠি। এদিকে অবহেলা করিয়া বাহিরের ফলাফল লইয়া আলোচনা করার বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই।

আলোচনা : *ধর্ম্ম ও সমাজ।*
১ম বর্ষ, ১২ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৩৫ (১৯২৮)

সঙ্গীত ও ইসলাম

সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস এই যে, এছলাম ধর্ম্মে সকল প্রকারের সমস্ত সঙ্গীতকেই নিষিদ্ধ বলিয়া আদেশ দেওয়া হইয়াছে। আমাদের দেশের আলেম সমাজ সাধারণভাবে সঙ্গীতের বিরুদ্ধে যেসব কঠোর অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাতেও জনসাধারণের উপরোক্ত বিশ্বাসের যথেষ্ট পোষকতা হইয়া আসিতেছে। কিন্তু, এ সম্বন্ধে যথাসাধ্য অনুসন্ধান করার পর, আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, জনসাধারণের এই বিশ্বাস বা আলেম সমাজের এই অভিমত মূলতঃ এছলামের অর্থাৎ কোরআন হাদিছের দলিল-প্রমাণের সহিত আদৌ সামঞ্জস্য নহে।

এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্ব্বে জানিয়া রাখিতে হইবে যে, কোন কাজের সিদ্ধতা ও অসিদ্ধতা সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইলে, যাঁহারা সেই কাজকে অসিদ্ধ বলিয়া দাবি

www.pathagar.com

করিবেন—প্রমাণের ভার পড়িবে তাঁহাদের উপর। অর্থাৎ তাঁহাদিগকেই সপ্রমাণ করিতে হইবে যে, আলোচ্য কার্য্যটি অমুক আইনের অমুক ধারা মতে অপরাধজনক বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে। হোরমতের বা অসিদ্ধতার প্রমাণ না থাকিলেই তাহা সিদ্ধ বা জাএজ বলিয়া পরিগণিত হইবে। এক্ষেত্রে জওয়াজের বা সিদ্ধতার প্রমাণ উপস্থিত করার জন্য অপর পক্ষকে বাধ্য করা যাইতে পারে না। ফলতঃ সঙ্গীত হারাম বা নিষিদ্ধ হওয়ার সন্তোষজনক প্রমাণ যদি বিদ্যমান না থাকে, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, ইহাই তাহার সিদ্ধতা বা জাএজ হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ।

"অমুক কাজ এছলামে নিষিদ্ধ'—এরূপ দাবি যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, কোরআনের অমুক আয়াতে হজরতের অমুক হাদিছে সেই কাজকে হারাম বা নিষিদ্ধ বলিয়া স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে। এছলামে সকল প্রকারের সঙ্গীত সর্ব্বোতভাবে নিষিদ্ধ এই দাবি যাঁহারা করিবেন, তাঁহাদিগকেও ঐ প্রকারে কোরআনের আয়াত বা হজরতের হাদিছ উদ্বৃত করিয়া স্পষ্টভাবে নিজেদের দাবি সপ্রমাণ করিতে হইবে। আমরা দাবি করিয়া বলিতেছি- ত্রিশ পারা কোরআনের মধ্যে এরূপ একটি আয়াতও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, যাহাতে সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলিয়া ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে। পক্ষান্তরে, হজরত রছুলে করিম সঙ্গীত মাত্রকেই নিষিদ্ধ বা না-জাএজ বলিয়া আদেশ প্রদান করিয়াছেন—এরূপ একটিও ছহী হাদিছ আজ পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। অধিকন্তু এই প্রকার কোন ছহী হাদিছ বিদ্যমান না থাকার কথা বহু সর্ব্বজনমান্য আলেম ও এমাম একবাক্যে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

সঙ্গীত নিষিদ্ধ নহে—ইহা প্রতিপন্ন করার জন্য এইটুকুই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু, এই আলোচনাকে পূর্ণ পরিণত করার জন্য অধিকন্তু হিসাবে আমরা ইহাও দেখাইব যে, সঙ্গীত নিষিদ্ধ হওয়ার প্রমাণ নাই—শুধু ইহা নহে, বরং হজরতের কাজ ও কথা দ্বারা সঙ্গীতের সিদ্ধতা বা জাএজ হওয়ার Positive প্রমাণ বিদ্যমান আছে।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : সমস্যা ও সমাধান (সঙ্গীত সমস্যা)।
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫ (১৯২৮)

সঙ্গীতের পক্ষে প্রমাণ

উপসংহারে আবার বলিয়া রাখিতেছি—সঙ্গীত সম্বন্ধে আমরা যে কথা বলিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, বস্তুতঃ তাহা আদৌ আমাদের কথা নহে, ইহা বর্ত্তমান যুগের কোন অভিনব আবিষ্কারও নহে। আমরা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিয়া দেখাইব যে—

(১) হজরত রছুলে করিম স্বয়ং সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন ও তাহার অনুমতি এমনকি আদেশ প্রদান করিয়াছে।

(২) হজরতের বহু ছাহাবী সঙ্গীতচর্চ্চা করিতেন।

www.pathagar.com

(৩) এমাম আবু হানিফা, এমাম মালেক, এমাম শাফেয়ী, এমাম আহমদ-বেন-হাম্বল প্রভৃতি এমামগণ সঙ্গীতকে জাএজ বলিয়া মনে করিতেন এবং নিজেরাও সঙ্গীত শ্রবণ করিতেন। এমাম মালেক ত নিজেই একজন সঙ্গীতশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ছিলেন।

(৪) এমাম এবনে হাজম, কাজী ঈছা, এবনুল আরবী, এমাম মাওদ্দী, আবু তালেক মক্কী, এমাম গজালী প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া এমাম শওকানী, শাহ আবদুল আজিজ, মোল্লা আলী কারী, কাজী ছানাউল্লা পানিপতী, মওলানা আবদুল হক মোহাক্কেক দেহলবী, প্রভৃতি শত শত এমাম ও মোহাদ্দেছ একবাক্যে সদ্ভাবপূর্ণ বা নির্দ্দোষ আনন্দদায়ক সঙ্গীতকে সিদ্ধ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *সমস্যা ও সমাধান (সঙ্গীত সমস্যা)।*
২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৩৫ (১৯২৮)

আবুল হুসেনের প্রবন্ধের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

স্বনামখ্যাত মৌলবী আবুল হুসেন সাহেব "বাঙলার বাণী" নামক ঢাকার একখানি হিন্দুপত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া মোছলেম নারী সমাজের চরিত্রের উপর অতি জঘন্য আক্রমণ করিয়াছেন। লেখক প্রবন্ধের এক স্থানে বলিতেছেন—"নারীকে পর্দ্দায় রাখা হয় এই উদ্দেশ্যে যে তার প্রতি পুরুষের দৃষ্টি না পড়ে এবং তার সতীত্ব নষ্ট না হয়, অর্থাৎ তার দ্বারা এমন কোন সন্তান সন্ততির সৃষ্টি না হয় যাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়ার জন্য তাদের জন্মদাতাকে খুঁজে বের করতে কষ্ট না হয়। এই সতীত্ব রক্ষার উপায় পর্দ্দা।" ইহার পর তিনি মুসলমানের জাতীয় চরিত্রের, বিশেষতঃ মোছলেম কুল ললনাদিগের সতীত্বের উপর যেরূপ নীচ ও ঘৃণ্য ভাষায় আক্রমণ করিয়াছেন, তাহা অকথ্য অশ্রাব্য ও অসহ্য। সে আক্রমণ যে কতদূর জঘন্য, ঐ পত্রিকার হিন্দু সম্পাদকের মন্তব্য পাঠ করিলে তাহার কতকটা আভাষ পাওয়া যাইতে পারিবে। সম্পাদক মহাশয় বলিতেছেন—"লেখক মুসলমান হইয়া মুসলমান নারী সম্বন্ধে যে উক্তি করিয়াছেন, হিন্দু হইয়াও তাহা বিশ্বাস করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হয় না।"

মিস মেও তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান লইয়াও, মোছলেম নারী চরিত্রের অপবাদ রটাইবার মত কোন উপকরণ খুঁজিয়া পান নাই। হিন্দুপত্রের সহায়তায় মিথ্যা মাতৃনিন্দা রটনা করিয়া হুসেন সাহেব সে অভাবটা পূরণ করিয়া দিলেন। হিন্দু হইয়াও যে জঘন্য অপবাদ বিশ্বাস করিতে সম্পাদক মহাশয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই, মুছলমান হইয়াও তাহা নীরবে সহ্য করিতে মোছলেম-বাঙলা প্রস্তুত হইবে কিনা, তাহাই এখন দেখার বিষয়। মৌঃ আবুল হুসেন ছাহেব এই শ্রেণীর অপকর্মগুলির জন্য ইতিপূর্বে অনুতপ্ত হইয়া তওবানামা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এত অল্প সময়ের মধ্যে সেসব কথা কি তিনি ভুলিয়া গিয়াছেন না এত দিন পরে আবার তিনি স্বরূপ প্রকাশের সুযোগ পাইয়াছেন, অথবা প্রবন্ধটি তাঁহার অগোচরে ঢাকায় প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলে বাধিত হইব। আলোচ্য প্রবন্ধে এছলাম

www.pathagar.com

ধর্ম্মের উপরও যেরূপ আক্রমণ চালান হইয়াছে, তাহাতে আর্য্যসমাজী ও খ্রিষ্টান মিশনারীরা তাঁহার নিকট হার মানিতে বাধ্য হইবে। মজার কথা এই যে, এই শ্রেণীর লোকদিগকে বাছিয়া বাছিয়া, আমাদের ভাবী বংশধরদিগের শিক্ষক ও আদর্শরূপে নির্ব্বাচন করা হইয়া থাকে—মুছলমান বলিয়া।

আলোচনা : *"ঢাকার বাণী"*

২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৩৬ (১৯২৮)

সাম্প্রদায়িকভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল আলোচনা

বাঙলার মুছলিম সমাজ-দেহে গয়ের-ইছলামী ব্যাধি যেভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্য আমাদের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দেরা একেবারে চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। বাস্তবিকই মুসলিম সমাজ যেভাবে দিন দিন ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে, এখনও সময় থাকিতে তাহার প্রতিকারের উপায় বাহির না করিলে, অচিরেই বাঙলা হইতে মুছলিম কালচারের অস্তিত্ব লোপ হইবার বিশেষ আশঙ্কা জন্মিয়াছে। মুছলিম-বঙ্গ যেভাবে হিন্দু-কালচারের ভিতরে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও অস্তিত্ব ডুবাইয়া দিতেছে, তাহার পরিণাম ফল যে কি হইবে, চিন্তা করিয়া কোন কিনারা পাওয়া যায় না। মাথায় টুপী না দেওয়া ব্যাধি, নামাজ-না পড়া, রোজা-না-রাখা ব্যাধি, বিজাতীয় অনুকরণ-প্রিয়তা প্রভৃতি কত রকমের ব্যাধি আসিয়া মুসলিম সমাজকে আক্রমণ করিয়া একেবারে সম্মোহিত করিয়া ফেলিয়াছে। আমাদের এই জীবন-মরণ সমস্যার দিনে হকিমুল কৌমেরা বিবিধ নুছখা লিখিয়া দিতেছেন। কেহ বলিতেছেন- স্বরাজ ও স্বাধীনতাই এই রোগের একমাত্র মহৌষধ। অন্যজন বলেন—দেশে শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই এই রোগ আপনা আপনি সারিয়া যাইবে। আবার অন্যজন বলেন—না, তাহা নয়, হিন্দুদের সহিত প্রতিযোগিতায় অধিকাংশ চাকুরি লাভ করিয়া দেশের শাসন বিভাগে অধিকার লাভ করিতে পারিলেই, আমাদের সুবিধা আবার ফিরিয়া আসিবে। কিন্তু কৌমের নাড়ি টিপিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে,—জাতীয় সাহিত্যের অভাবই আমাদের অধঃপতনের মূল কারণ। গত একশত বৎসর ব্যাপিয়া পৌত্তলিক হিন্দুয়ানী ও মুছলিম বিদ্বেষী সাহিত্যই আমাদের কৌমকে এত গয়ের ইছলামী করিয়া ফেলিয়াছে।

মোহাম্মদ আহবাব চৌধুরী : *আমাদের জাতীয় ব্যাধি ও তাহার প্রতিকার*

২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৬ (১৯২৮)

হিন্দু-মুসলিম বিরোধ : কারণ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (প্রবাসী সম্পাদক) মহাশয়, প্রবাসী কার্য্যালয় হইতে শিবনাম শাস্ত্রী মহাশয়ের 'আত্মচরিত'-এর (দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশ করিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয় এই

www.pathagar.com

'আত্মচরিত' নামক পুস্তকখানায় ৩০৬ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "ইহার পরে তাহারা মোহাম্মদের অনুকরণে বিরুদ্ধ দলের প্রতি গালাগালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন।" শিবনাথ শাস্ত্রী একজন সরল প্রকৃতির ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক ও দেশ হিতৈষী বলিয়া সকলেই তাঁহার প্রশংসা ও সম্মান করিতেন। কিন্তু এমন অ-রাজনৈতিক লোকের বোচকায়ও মুসলিম বিদ্বেষ লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাজ্জব হইলাম।

সংগ্রহ : *আত্মচরিতে মুসলিম বিদ্বেষ।*
২ বর্ষ,৮ সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ (১৯২৯)

নারী

বিশ্ব-রচনার মধ্যে নারী এক বিরাট সৃষ্টি। নারীর জীবন কর্ম্মবহুল ও দায়িত্বপূর্ণ, সৃষ্টি যে মন্ত্র 'ত্যাগ' তাহারই মাধুর্য্যে নারী কল্যাণমধুর। গৃহে, সমাজে, কিংবা দেশে সর্ব্বত্রই নারীর স্থানটি যে ঠিক কোথায় তাহা কেন মানব কোনদিনই স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। তাহার সহিত গৃহ, পরিবার ও সমাজের সকল উন্নতিই এমন গভীরভাবে সংশ্লিষ্ট যে, তাহার প্রকৃত রূপটি আদর্শস্থানীয়া না হইলে কেন পৃথিবীর শত সমস্যা অনিরূপিত থাকিয়া যাইবে। ... নারী বিশ্বজননীয় প্রতিনিধি। যে দুইটি ভিন্ন জীবকে লইয়া মানব-সমাজ গঠিত তাহার অস্তিত্ব নারী ভিন্ন সম্ভব হয় না। নারী যেমন সন্তানের জননী, তেমনি জাতি গঠনেরও সহায়। তিনি সমস্ত সমাজকে ও দেশকে ইচ্ছামত গঠন করিতে পারেন, কারণ যে পুরুষ প্রধানতঃ সকর কার্য্য পরিচালনা করেন, সমাজ ও দেশের মধ্যে আধিপত্য করেন, তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষা যাহা কিছু সকলই জননীর ক্রোড়ে আরম্ভ হয় এবং বাল্যের শিক্ষা চিরজীবনই এক অভিনব প্রভাব বিস্তার করে।

শ্রীমতী সুবোধবালা বিশ্বাস : *নারীত্বের আদর্শ।*
২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৬ (১৯২৯)

শিক্ষা ও পর্দ্দা

বাদশাহ আমানুল্লাহ খাঁটি পর্দ্দার বন্দোবস্ত করিতেছিলেন, কারণ মানুষ যদি যথার্থ শিক্ষিত হয় তাহা হইলে সে তাহার নৈতিক চরিত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। এবং এই জ্ঞানপূর্ণ শিক্ষাই তাহার আবরু তাহার পর্দ্দা। অশিক্ষিত অজ্ঞ লোকেরা পর্দ্দার ভিতরে থাকিলেও যে ফল, বাহিরে গেলেও সেই একই ফল। অশিক্ষিত লোকদেরকে শুধু তালাবদ্ধ সিন্দুকে রাখিলেও তাহারা নৈতিক চরিত্রের যে কিছুমাত্র উন্নতি লাভ করিতে পারিবে তাহা মনে হয় না। কিরূপে নিজের চরিত্র ভাল রাখা যায় সেরূপ কোন শিক্ষা না দিয়া, শুধু শুধু ধরে বন্দিনী করিয়া রাখা পর্দ্দা নহে। খাঁটি শিক্ষা দিলে তাহার আত্মসম্মান বোধ হইবে। এবং তাহা

www.pathagar.com

হইলেই সে তাহার নিজের পর্দ্দা নিজেই রক্ষা করিতে পারিবে; এবং তাহার আত্মসম্মান রক্ষা করিতে সে সমর্থ হইবে। বেপর্দ্দার সঙ্গে একজন লোকের সম্মুখে যাওয়া যে পাপ, দশটা লোকের সম্মুখে পর্দ্দার সহিত যাওয়া কদাচ পাপ নহে। শরিয়তের পর্দ্দা- বাহিরে ও ভিতরে সব স্থলেই এক প্রকার। কতকক্ষণের জন্য নাক, মুখ চোক বন্ধ করিয়া বেড়ান, (এবং এইরূপ পর্দ্দায় পর পুরুষের ঘাড়ে পড়া সম্ভবপর)—উহা ইসলামের বাহিরের পর্দ্দা। এই অনৈসলামিক পর্দ্দা আমানুল্লাহ ভাঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মিথ্যা ধর্ম্মান্ধতা ও পৌরোহিত্যের গৌরবে যাহাদের মস্তিষ্ক গরম, তাহারা বাদশাহ আমানুল্লার কার্য্যের ভাবী ফল যে শুভ তাহা বুঝিব কেমন করিয়া। ঠিক সময়ে যখন তিনি সমগ্র মুসলমান জাতির উপর কৃপা চক্ষে চাহিয়াছিলেন, তখনই গুরুদের বিষদৃষ্টি পড়িল তাঁহার উপর। গোঁড়ামি যে মুসলমানদেরকে অদূর ভবিষ্যতে একেবারে অধঃস্থলে লইয়া যাইবে, তাহা অবিশ্বাস করিবার উপায় নাই। তাই বলি দুর্ভাগ্য, দরিদ্র পতিত মুসলমান জাতি—তোমাদের আসন্ন পরীক্ষা উপস্থিত। আর ঘুমাইও না—মোহ ত্যাগ কর। শিক্ষিত উন্নতমনা মোসলেম যুবকবৃন্দ! এই গোঁড়ামি যাহাতে প্রশ্রয় না পায় তাহারই চেষ্টা কর। কিন্তু অতিরিক্ত কিছু করিও না, গণ্ডির বাহিরে যাইও না। তাহা হইলে পুনরায় তুমি সেই অন্ধকারেই থাকিবে। মস্তিষ্ক ঠাণ্ডা রাখিয়া কাজ করিও, তাহা হইলে ভুল পথে যাইবে না। খাঁটি ইসলামের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া অগ্রসর হও। মিথ্যা ও কুসংস্কার দূর কর। দেখিবে ভাগ্যলক্ষ্মী একদিন তোমারই গলে বরমাল্য পরাইবেন।

আমিনা খাতুন : *আমাদের অবনতির কারণ*

২য় বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৬ (১৯২৯)

মুসলমানদের সমাজ-জীবন

মুসলমানদের সামাজিক রীতিনীতি অতীব আশ্চর্যজনক—যাহার ফলে নানা অভাব-অভিযোগ ও প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তাহারা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারে। হিন্দুর সমাজ-জীবন শতধা বিচ্ছিন্ন, মুসলমানদের ভিতর উচ্চ-নীচ ভেদ জ্ঞান এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। অতি বড় বিদ্বান, অর্থশালী মুসলমানও সাধারণ দরিদ্র মুসলমানের সহিত ভ্রাতৃভাবে অবস্থান করিতে পারে। উচ্চ নীচ ভেদে একই স্থানে ভগবদারাধনা, একই আসনে উপবেশনে তাহাদের কোন বাধা নাই। মুসলমানদের ভিতর পাঠান, সৈয়দ, মিঞা প্রভৃতি উপাধিধারী মুসলমানগণ বংশ মর্যাদায় শ্রেষ্ঠ। শুনা যায় উহারাই নাকি বঙ্গের আদিম মুসলমান এবং অন্যান্য সকলেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া মুসলমান হইয়াছে। এখনও ঐ সমস্ত আদিম মুসলমানদের বিবাহাদি তাহাদের নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তবে সাধারণ মুসলমানদের সহিত পান ভোজনে অন্তরায় প্রায়ই দেখা যায় না। যে কোন মুসলমান শাস্ত্র-পারদর্শী হইয়া মুন্সী, মৌলভী হইতে পারে এবং পৌরহিত্যের কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে।

www.pathagar.com

এইরূপে লোকালয়হীন মাঠে ৪/৫ ঘর মুসলমান ১০/১২ বৎসরের মধ্যেই জনপূর্ণ পল্লী সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয়।

সংগ্রহ : *বঙ্গের মোসলেম শক্তি : সমাজজীবন*

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬ (১৯২৯)

মুসলমানদের পারিবারিক জীবন

এক পত্নী বর্ত্তমানে বহু বিবাহ প্রচলন থাকায় পত্নীবিদ্বেষ প্রসূত কোলাহল প্রায় সর্ব্বত্রই শোনা যায়। 'বহু গোষ্ঠী দরিদ্রতা' এই প্রবাদ বাক্যের সত্যতা মুসলমানের পারিবারিক জীবনে স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। বহু সন্তানের জনক হওয়ায় পুত্রাদি প্রতিপালনের বিশেষ কোন সুব্যবস্থা প্রায়ই দেখা যায় না—স্থানে স্থানে অর্থ-সম্পদে ধনী হওয়ার প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, পিতার অবর্ত্তমানে বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদের গৃহবিবাদের ফলে অতি বড় সম্পদশালী মুসলমান পরিবারও শীঘ্রই দরিদ্র অবস্থায় নীত হওয়া থাকে। স্বামীর অবর্ত্তমানে সম্পদশালিনী মুসলমান-গৃহিণী পুত্র বর্ত্তমানেও 'নিকা' করিতে পারে। স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়া কোন কোন স্থলে পৌঢ়া পুত্রবতী নারীকেও বলপূর্বক লইয়া গিয়া বিবাহ করিতে দেখা যায়। মুসলমান আইনানুসারে মেয়েও সম্পত্তির অধিকারিণী বলিয়া মুসলমান সম্পত্তি বহুধা বিভক্ত হইয়া পড়ে। এরূপ স্থলে সম্পত্তির লোভে বিবাহ লইয়া প্রায়ই জোর জোবরদস্তি ও বিবাদাদি হইতে দেখা যায়। বিবাহাদিতে ১৫/২০ টাকায়ও কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে; অবস্থায় কুলাইলে সাধ্যমত খরচের আপত্তি নাই। পাল পার্ব্বণ খুবই কম। পিতামাতার শ্রাদ্ধ সুবিধা-সুযোগ-মত যে কোন সময়ে যথাসাধ্য খরচ করিতে পারে। এজন্য সমাজে কোন বাধ্য-বাধকতা, নিন্দা চর্চ্চা বা 'একঘরে' হইয়া থাকিবার কোনও ভয় ভাবনা নাই।

সংগ্রহ : *বঙ্গের মোসলেম শক্তি : সমাজজীবন।*

২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬ (১৯২৯)

মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা

পল্লীতে অধিকাংশ মুসলমানই চাষাবাদ করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, কিন্তু জীবন-সংগ্রামে উহারা শীঘ্র বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে না। অনেক মুসলমান পরিবারে দেখিয়াছি—উহারা বৎসরে ২/১ মাস শাঁক-আলু, রাঙ্গা আলু, কাঠাল, বীচিকলা প্রভৃতি খাইয়া জীবন ধারণ করে। কাহারও কাহারও একবেলা ভাতের সংস্থান থাকিলেও, ভাতের সহিত শুধু পাট শাক ব্যতীত আর কিছুই জুটাইতে পারে না। চাষের কাজে বহু গোষ্ঠীরই প্রয়োজন। মুসলমানের আর্থিক অবস্থা যতই হীন হউক না কেন, রোগকাতর হইয়া শারীরিক শ্রম দিতে অসমর্থ না হইলে অন্নাভাব প্রায়ই হয় না। বিনা মূলধনে যেভাবে উহারা চাষ করে, তাহা বড়ই আশ্চর্য্যজনক। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে চাষের

www.pathagar.com

কাজে অর্থ না হইলে চলে না। সে ক্ষেত্রে নানারূপ কায়িক শ্রম দিয়া উহারা চাষের অর্থ সংগ্রহ করে এবং নিজেরা একবেলা আধ-পেটা খাইয়া, এমনকি রাঙ্গা আলু প্রভৃতি খাইয়াই জীবন ধারণ করে। স্ত্রীদিগকে উহারা বসিয়া খাইতে দেয় না। সামর্থ্য হইলে, পুরুষ এক মণ ধান্য খরিদ করিয়া বাড়িতে ভানিতে দেয় এবং প্রতি হাটে ঐ চাউল বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ দ্বারা বাজার খরচ বা চাষের খরচ জোগায় ও মূলধন নষ্ট না করিয়া পুনরায় ধান কিনিয়া থাকে। যাহার ধান কিনিবারও অর্থের সংস্থান নাই, সে কোন অবস্থাপন্ন মুসলমান অথবা হিন্দুর বাড়ি হইতে চাউল ভানিয়া দিবার জন্য ধান লইয়া যায় এবং চাউল ফেরত দিয়া পারিশ্রমিক বাবদ চাউল বা ধান গ্রহণ করে স্বামী কর্তৃক পরিত্যক্তা মুসলমান রমণী ২/৩ টি ছেলে মেয়ে লইয়াও এইভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে মুসলমান রমণীরা সঙ্গতিপন্ন বাড়িতে গিয়াও ধান ভানা, চিড়াকুটা, মুড়ি খৈ ভাজা কাজে আত্মনিয়োগ করিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। ইহাতে সমাজে কোনই নিন্দা হয় না বা লোকচক্ষে হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হইতে হয় না। যাহার হালের গরু নাই, চাষের জমি নাই, তাহারও কোন ভাবনা নাই। ২/৩ বৎসর বার্ষিক ৩০/৪০ টাকা বেতনে চাকুরি করিয়া ঐ টাকায় হাল গরু কিনিয়া মনিবের জমিতেই আধি বর্গায় (ভাগে) চাষ আরম্ভ করিয়া দেয়। চাকুরিকালে মনিবের বাড়িতেই খাওয়া মিলে। পরিধানের জন্য ২/৩ টাকার বেশি খরচ হয় না। কেননা, অধিকাংশ সময়েই উহারা গামছা পরিয়াই সময় কাটায়। চাকুরির বাকি সমস্ত টাকা মনিবের গৃহেই মজুত রাখে। ঘরে স্ত্রীপুত্র থাকিলে, ৪/৬ বৎসরের পুত্রকে নিকটেই কোথাও চাকুরীতে নিযুক্ত করে। মনিবের বাড়ি হইতে ধান লইয়া স্ত্রীকে ধান ভানার কার্য্যে লাগাইয়া মনিবের বাড়িতে তিন বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় বলিয়া মুসলমান বালক সানন্দে চাকুরি স্বীকার করিয়া থাকে। অবসর সময়ে উহারা খালে বিলে মাছ ধরে। তাছাড়া ছাগল মুরগি পুষিয়া, বা তরীতরকারী বিক্রয় করিয়াও একটা উপরি আয়ের সংস্থান করিয়া থাকে। কাজেই জীবন-সংগ্রামে কোন অবস্থাতেই উহারা বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়ে না বা বংশ বৃদ্ধি হেতু অভাবের তাড়নায় হিন্দুর মত তাহাদের বিপন্ন হইতে হয় না।

সংগ্রহ : *বঙ্গের মোসলেম শক্তি : সমাজজীবন*
২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬ (১৯২৯)

শিল্প

অভাবের তাড়াতেই হউক অথবা অদম্য প্রাণশক্তির উন্মাদনাতেই হউক, মুসলমানেরা ধীরে ধীরে পল্লীর সমস্ত শিল্প বাণিজ্যগুলিকে নিজদের কুক্ষিগত করিয়া লইতেছে। পল্লীতে আজকাল সর্ব্বত্রই মুসলমান কলু গৃহস্থের ঘরে তৈলের জোগান দেয়। মুসলমান মাঝিরও অভাব নাই। পূর্ব্ববঙ্গের মুসলমান মাঝি শুঁট্‌কী মাছের ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হইতেছে। ঢাকার মুসলমান চামড়া ব্যবসায়ীর ঐশ্বর্য্য দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়- হাড়ের ব্যবসায়েও প্রায় তাহাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি। তদুপরি ইমারতের কাজ প্রভৃতি নানাপ্রকার গৃহশিল্পের

www.pathagar.com

কার্য্যে তাহারা যেভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে, তাহাতে স্পষ্টই অনুমান হয়—কিছুদিন পরে হিন্দু গৃহশিল্পীদের চিহ্ন ধরাপৃষ্ঠ হইতে একেবারেই মুছিয়া যাইবে। বর্ত্তমান চরকা আন্দোলনে মুসলমানই শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মুসলমান কাটুনীর তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য। ময়মনসিংহ ও উত্তরবঙ্গের এন্ডি ও মুগা সুতার চাষ একরূপ ষোল আনাই মুসলমানদের হাতে।

সংগ্রহ : *বঙ্গের মোসলেম শক্তি : সমাজ জীবন।*
২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৩৬ (১৯২৯)

ব্যবসা বাণিজ্য

মুসলমান ব্যবসায়ী যেরূপ অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, তাহাতে অতি বড় বড় ব্যবসায়ীকেও চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছে। চাউল, পাটের ব্যবসায়েও মুসলমান অপ্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইতেছে। তাহারা ২৫/৩০ মাইল দূরে ধান চাউলের আড়ৎ হইতে ধান চাউল খরিদ করিয়া, ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া হাটে-বাজারে বিক্রয়ার্থে উপস্থিত করে। এতদুদ্দেশ্যে, এক এক জনের প্রায় ৪/৫ টি করিয়া ঘোড়া থাকে। ১টি ঘোড়া দিয়াও কেহ কেহ ব্যবসা চালাইয়া থাকে, তবে উহাতে পরিশ্রমের তুলনায় লাভ কম হয়। এক একটি ঘোড়ায় ২ মণ হইতে ২৷৷৷০ মণ বহন করিতে পারে। মণ প্রতি ৷৷০ আনা হইতে ৷৵০ আনা লাভ অনিবার্য্য। শ্রাবণ হইতে অগ্রহায়ণ মাস পাটের ব্যবসায়ে ঐ মূলধন খাটাইতে পারে। নিজেরা মাথায় মোট বহিয়া, নৌকা চালাইয়া, ওজন কম দিয়া, জল মিশাইয়া যেভাবে পাটের ব্যবসা করে, কোনও হিন্দুর পক্ষে ঐভাবে ব্যবসা চালান একেবারেই অসম্ভব। মুসলমান আত্মশক্তির সাধনা করে। তাহাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসও অতি প্রবল। হিন্দু এবং মুসলমান সম-ব্যবসায়ীর মধ্যে মুসলমান ব্যবসায়ী যেখানে ২০০০/- দুই হাজার টাকা লাভ করে, হিন্দু ব্যবসায়ীর সেখানে লাভ কিছুই দাঁড়ায় না। যেহেতু তাহার নৌকা ভাড়া, গরুর গাড়ি ভাড়া, মুটে খরচ প্রভৃতিতেই ২০০০/- টাকা বাহির হইয়া যায়। অথচ হিন্দু সামাজিক প্রতিষ্ঠা-হানির ভয়ে স্বহস্তে ঐ সমস্ত কার্য্য করিতে নারাজ—বিশেষতঃ, বর্ত্তমানের নবজাগ্রত নব উন্নতিশীল সভ্যতা-গর্ত্তে অধঃপতিত হিন্দু। হিন্দু সমাজ শতধাবিচ্ছিন্ন বহু উপজাতিতে বিভক্ত। কাজেই অশনে, ব্যসনে, জীবনের সর্ব্বত্রই বিরোধের চিহ্ন বেশ সুপরিস্ফুট। মুসলমান নামে উচ্চ নীচ সকলের মনে প্রাণে যে সাড়া, যে স্পন্দন তোলে, হিন্দু বলিতে তার শতাংশের একাংশও কোথাও দেখা যায় না।

সংগ্রহ : *বঙ্গের মোসলেম শক্তি : মোসলেম শক্তি।*
২য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৬ (১৯২৯)

www.pathagar.com

হিন্দু ও মুসলমান

"ভারতের সাধনা" নামক পত্রিকার ১৩৩৬ বাংলা অগ্রহায়ণ সংখ্যার ৫৪৫ পৃষ্ঠায় বাবু প্রমথনাথ বসু মহাশয় বলেন- "মুসলমান ধর্ম্মের নিরাপোষ একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্ম্মের উপর সজোরে প্রভাব বিস্তার করিতে লাগিল। তাহারই ফলে চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরিয়া দলে দলে সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্ম সংস্কারকগণ হিন্দু সমাজে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই পরমেশ্বরের একত্ব প্রচার করিতে লাগিলেন। জাতি-ভেদের উচ্ছেদে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। রামানন্দ, কবির-নানক, ও চৈতন্যের নাম ইহাদের মধ্যে প্রধান।"

সুবার্য হিন্দু মহাসভার সভাপতি ও মডার্ণ রিভিউ ও প্রবাসীর সম্পাদক বাবু রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৯২৯ ইং সেপ্টেম্বর মাসের মডার্ণ রিভিউ ৩৫০ পৃষ্ঠায় বলেন :

> "It was under Muslim ouspices that the dress and the etiquette of the upper classes became substantially of the same kind almost through out India. Many arts and crafts, including the fine art of Music influenced over the greater part of India. Some reforms in popular Hinduism and Hindu social polity are due to Islamic influence."

ব্রাহ্ম ধর্ম্মের প্রচারক রাজা রামমোহন রায় ইসলাম ও কোরআন হইতেই প্রেরণা লাভ করিয়া কিভাবে হিন্দু সমাজ সংস্কার করিয়াছিলেন তাহা ১৯১৯ ইং বৈশাখ মাসের "বঙ্গবাণী"তে বাবু বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেন—"তাহার জীবনের প্রথম প্রেরণা আসে মুসলমান যুক্তিবাদী মতাজোল সম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি পড়িয়া। রামমোহন তখন অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বলিলেও হয়। পাটনায় পারসি ও আরবি পড়িতে যাইয়া মুসলমান সাধনার সংস্পর্শে তাঁহার অন্তরে দেশের প্রচলিত দেববাদ ও প্রতিমা পূজার বিরোধী ভাবের সঞ্চার হয়।"

কবি কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের জীবন-চরিতের ৫৮পৃষ্ঠায় বাবু ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, "ফির্দ্দোসি, সাদি, ওমর খৈয়াম, জামি, জালাল উদ্দিন রুমী প্রভৃতি পারস্যের বাণীপুত্রগণও তাঁহার সখা ছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র বাহ্যিক আচারে হিন্দু হইলেও অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে তিনি ভক্ত সুফী হইয়া উঠিয়াছিলেন।"

মোহাম্মদ আহ্বাব চৌধুরী বিদ্যাবিনোদ : *কালচারের লড়াই*
৩য় বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৭ (১৯৩০)

স্বদেশপ্রেমের প্রতি যুব সমাজ

তুমি তোমার কুৎসিৎ মন নিয়ে দেশভক্তি দেখাতে চাও? যাও, যাও, দেশে ও দেশের বাহিরে যত পার জ্ঞান কুড়িয়ে আন। জ্ঞানের মণি-মাণিক্যে তোমরা মাথা ভূষিত কর। তারপর দাও সে মাথা লুটায়ে দেশের জন্য, দশের জন্য। এই প্রকৃত মস্তক-দান। পড়, পড়, নতুন পুরানো সকল বড় মনের সঙ্গে তোমার মন মিলিয়ে তোমার মনকে বড় কর। সমস্ত

www.pathagar.com

মনীষীদের ভাবের সৌন্দর্য্য লুট করে তোমার মনকে সুন্দর কর। তারপর সঁপে দাও সেই মন দেশের সেবায়, দশের সেবায়। এই প্রকৃত দেশ-ভক্তি। দেখ নাই কি তরুণ, তোমার প্রেয়সী তোমার জন্য কত বেশভূষা করে কত রকমে সুন্দর মনোমত হতে চায়। তোমার যদি স্বদেশের প্রতি প্রেম থাকে, তবে তুমি কেমন করে কুৎসিৎ নিরাভরণ হয়ে থাকতে পার। "হুব্বুল ওয়াতেন মিনাল ঈমান"—স্বদেশ-প্রেম ঈমানের অন্তর্গত। এই স্বদেশ-প্রেমের জন্য যেমন ছোট বড় দেশবাসীকে আলিঙ্গন দিতে হবে, তেমনই দেশের জিনিসকে ভালবাসতে হবে। আমি দীর্ঘ দুই বৎসর ফরাসীদের সঙ্গে কাটিয়েছি। তাদের দেশের সঙ্গে আমার কেমন একটা ভালবাসা জন্মে গেছে। তবুও আমি পারত পক্ষে তাদের দেশের জিনিস ব্যবহার ক'রব না, কেন না আমার দেশের ভালবাসা সকল দেশের ভালবাসার উপর। এই স্বদেশ প্রীতিতেই, বিদেশ বিদ্বেষে নয়, তোমাদের দেশের জিনিস ব্যবহার করতে হবে। আমি খদ্দরের দার্শনিক তত্ত্ব বুঝি না। আমি শুধু বুঝি কলের হ'ক হাতের হ'ক, দেশের জিনিস ব্যবহার করতে হবে। যে এইটুকুও পারে না, তার গলায় দড়ি।

ডঃ মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ : *যুবক মোস্‌লেম*

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

ইসলামের দৃষ্টিতে চিত্রকলা

কোন প্রকার জীবজন্তুর ছবি আঁকা বা মূর্ত্তিগড়া অথবা ছবি বা মূর্ত্তি ব্যবহার করা, এছলামের বিধান অনুসারে সিদ্ধ কিনা, বিগত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে মোসলেম জগতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সে সম্বন্ধে বিভিন্ন প্রকারে আলোচনা চলিয়া আসিতেছে। আমি যতদূর অবগত আছি, মিছরের স্বনামখ্যাত আলেম মুফ্‌তী আবদুহু মরহুম সর্ব্ব-প্রথমে যুক্তি-প্রমাণের দিক দিয়া এ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা করেন। ইহার পর মুফ্‌তী ছাহেবের প্রধান শিষ্য আল্লামা রশীদ-রেজা তাঁহার আল্-মিনার পত্রে বিভিন্ন সময় এ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় বিচারে প্রবৃত্ত হন। ইহা ব্যতীত, মিসর, সিরিয়া, তিপলী প্রভৃতি মোছলেম রাজ্যগুলির কতিপয় বিখ্যাত আলেম, চিত্রকলা সম্বন্ধে কয়েকটা বিস্তারিত ফৎওয়া প্রচার করেন। ইহা লইয়া ঐসব দেশে মুছলমানদিগের মধ্যে সাধারণভাবেও অনেক বিচার আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এবং অবশেষে তাঁহারা সকলে মোটের উপর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে—জীব-জন্তুর ছবি তোলা, আঁকা, ছাপা বা সেগুলির ব্যবহার করা এছলামের বিধান অনুসারে কখনই নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এমনকি, জীবজন্তুর মূর্ত্তি গড়া ও তাহার ব্যবহার করাও তাঁহাদের অনেকের মতে অসিদ্ধ নহে।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *চিত্রকলা ও এছলাম*

৩য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭

www.pathagar.com

সঙ্গীতের পক্ষে

ইসলামে সঙ্গীত যে বিল্‌কল্ হারাম—এতকালে এই কথাই শুনে আস্‌ছি। অনেক স্থলে হাতে কলমেও এর পরিচয় পেয়েছি। আপনাদের এখানে গান গাইলে আমি সমাদর লাভ করি বটে, কিন্তু তাই ব'লে মনে করবেন না যে সর্ব্বত্রই এক রকম। অনেক স্থলে গান গেলে আমাকে বেশ অপ্রস্তুতও হ'তে হয়েছে। তাই ঠেকে শিখে আত্মরক্ষার জন্য একটু প্রস্তুত হয়েছি। কোন অস্ত্র দিয়ে নিজেকে রক্ষা করব, তাই আজ আপনাদিগকে খুলে বল্‌ছি। শাস্ত্রের দোহাই দিয়েই যখন সঙ্গীতকে নিষিদ্ধ বলা হয়। তখন সেই শাস্ত্র সম্বন্ধেই প্রথমে আলোচনা করা যা'ক। কোরান ও হাদিছ (অবশ্য সহী হাদিস) আমাদের মাথার মণি। তাদের বিধি-নিষেধকে উল্লঙ্ঘন করবার ঔদ্ধত্য আমার নাই। কোরান ও হাদিছে বাস্তবিকই যদি থাকে যে, সঙ্গীত একেবারেই হারাম, তবে তাহা হারামই। সে সম্বন্ধে আর কোন দ্বিরুক্তি নাই। কিন্তু আমরা পরিষ্কার ক'রে জান্‌তে চাই—কোরান-হাদিছে সেরূপ নিষেধাজ্ঞা আছে কি না। যারা সঙ্গীতকে হারাম বলে ফতোয়া দেন, এ প্রমাণ-ভার তাঁদের উপর। পরিষ্কার করে তাঁরা দেখিয়ে দিন যে, কোরানের অমুক আয়াতে, বা অমুক হাদিছে সঙ্গীতকে হারাম বলে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে। তাহলেই সব গণ্ডগোল চুকে গেল। হজরত মোহাম্মদের আবির্ভাব কালে লাম্পট্য, মদ্যপান প্রভৃতি দুর্নীতির সঙ্গে সঙ্গীতও জড়িয়ে ছিল। সুতরাং সঙ্গীত সর্ব্ব অবস্থায় নিষিদ্ধ হলেও, সে সম্বন্ধে কোরান শরীফে কোনও আয়াত থাকা খুবই স্বাভাবিক যেমন নাকি অন্যান্য দুর্নীতি সম্বন্ধে আছে আমরা চাই সেই আয়াতও সেই হাদিস। কোরান হাদিস সম্বন্ধে আমার যে সামান্য জ্ঞান আছে, তাতে ত মনে হয়—কোরান হাদিসে ওরূপ কোন নিষেধাজ্ঞা নাই। কোরান শরীফে ত নাই-ই, তবে কোন আয়াত বিশেষকে অনুমানিক ও দূরাগত একটি অর্থ দিয়ে বিপক্ষ-পক্ষ তাঁদের উদ্দেশ্য হাসিল করে থাকেন। হাদিস থেকেও তারা ২/১ টি হাদিস উদ্ধৃত করেন বটে, কিন্তু তাও তত সুস্পষ্ট নয়। সঙ্গীতের বিপক্ষে তারা যেরূপ ২/১টি হাদিস দেখিয়ে থাকেন, আমরাও স্বপক্ষে সেরূপ দু'একটি হাদিস দেখাতে পারি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ দু'টি হাদিসের উল্লেখ এখানে করছি :

"একটি হাবশী বালিকা একদিন বিবি আয়েষার গৃহে গান গাচ্ছিল, হজরত রসুলে করিম বিবি আয়েশার সঙ্গে সেই গান শুন্‌ছিলেন। এমন সময় হযরত ওমর এসে গৃহ-প্রবেশের এজাজত চেয়ে দ্বারে দাঁড়িয়ে রইলেন। হজরত ওমর ছিলেন 'বাগরেশে' পুরুষ। তাঁর নামে সকলের প্রাণে আতঙ্ক উপস্থিত হ'ত। হাবশী-বালিকা ওমরের কথা শুনেই পালিয়ে গেল। ইত্যবসরে হজরত ওমর গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি দেখলেন হজরত রসুল ও বিবি আয়েষা হজরত ওমরকে লক্ষ্য করে মৃদু মৃদু হাস্‌ছেন। তা দেখে হজরত ওমর তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তখন হজরত রসুল বল্‌লেন—একটা হাবশী বালিকা গান করছিল, আমরা শুন্‌ছিলাম। কিন্তু তোমার আসার কথা শুনেই সে পালিয়েছে।" তা শুনে হজরত ওমর বল্‌লেন—'রছুলুল্লাহ্ আপনি যা শুন্‌তে পারছেন, আমি তা পারব না? কই?

www.pathagar.com

মেয়েটি কোথায়? ডাকুন তাকে, সে গান করুক।' তখন মেয়েটিকে আবার ডাকা হল এবং তিন জনে বসে তার গান শুনলেন।"

গোলাম মোস্তফা : *ইসলাম ও সঙ্গীত*
৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৭

সঙ্গীত ও স্বাধীন চিন্তা

রাজ্য-হারার পর হইতে মোসলমানগণ সাধারণতঃ সঙ্গীত সম্বন্ধে যে ভ্রান্ত ধারণা সোৎসাহের সহিত পোষণ করিয়া আসিতেছেন তাহার অপনোদন করিয়াছেন এ যুগের এমাম্ গাজ্জালী—হাজী উল্ হার্‌মায়েন ওয়াশ্‌শরীফায়েন মহামনীষী ও সত্যের একনিষ্ঠ সাধক মাওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব। তিনি তাঁহার অশেষ গবেষণাপূর্ণ ধারাবাহিক প্রবন্ধরাজিতে অকাট্য যুক্তি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, সঙ্গীত ইসলামে হারাম ত নহে বরং জায়েজ (সিদ্ধ), এমনকি হানাফী সম্প্রদায়ের শিরোমণি এমাম আবু হানিফাও সঙ্গীত অনুমোদন করিয়া গিয়াছেন। যে স্বাধীন চিন্তার অসীম প্রভাবে একদা মোসলমান উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং যাহার অভাবে তাহাদের উন্নতির গতি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, মাওলানা আকরম খাঁ সাহেবের অশেষ সাধনার ফলে (বিশেষ করিয়া তাঁহার যুগপ্রবর্ত্তক গ্রন্থ "মোস্তফা চরিত" ও "কোর-আনের তফসির" ফলে) আজ বাঙ্গালি মোসলমান রূপকথার সেই "জাদু-কাঠির" মতই স্বাধীন চিন্তার রস আস্বাদন করিতে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইয়াছে।

মঈন উদ্দীন হোসায়ন : *সঙ্গীত সম্বন্ধে আরবি পাণ্ডুলিপির অবিষ্কার*
৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৩৭

অতীত ঐতিহ্যের প্রতি আকর্ষণ

গত আশ্বিনের আগের আশ্বিনে দিল্লী গিয়াছিলাম। দিল্লীর বর্ণনা কাগজে লিখিতে অনেক আত্মীয় বন্ধু অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু যে কলিজা-ছেঁচা লহুর হরফে হৃদয়দ্রাবী অশ্রুময়ী ভাষায় সে বর্ণনা লিখিতে হয়, তাহা আমার নাই, সে চেষ্টা করি নাই, আজও করিব না। শুধু এই বলিব যে, সেই সমাধির শহরে দিনের পর দিন অগণিত সমাধি দেখিলাম। মোগল-দিল্লী হইতে পাঠান-দিল্লীর সুদীর্ঘ পথের দুই পার্শ্বে পাঠানদের কবরের সারি চলিয়াছে। পাঠান-দিল্লীর বুকে কবরের পর কবর, তাহার পর কবর—কবরের অবধি নাই; পাথরের বাঁধা সমাধি কতক আংশিক বিনষ্ট হইয়াছে, কোনটীই নিশ্চিহ্ন হয় নাই। পাঠানদের কেল্লা, মসজিদ, ইমারত-ভগ্ন, বিরান : ঐ সমাধির মত নিস্তব্ধ। কৌতূহলী দর্শকের কোলাহল, বিষণ্ন পথিকের দীর্ঘশ্বাস—পরিত্যক্ত প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে পেচকের চীৎকার মাত্র। আর মোগল-দিল্লী? একদিন এই গরবিনী নগরী ভূতলে বেহেস্‌তকে আহ্বান করিয়াছিল। আজ

www.pathagar.com

তাহারও বুকে শুধু সমাধির অস্থি, কীর্তির কঙ্কাল, গত গৌরবের মর্ম্মরময়ী স্মৃতিচিহ্ন। পাঠান-দিল্লী বিরান; মোগন-দিল্লী হিন্দুপ্রধান—এখানে বহু মুছলিম-মহল্লা উঠিয়া গিয়াছে; তথায় হিন্দু মহল্লার পত্তন হইয়াছে। জেবুন্নিছা মসজিদের চারিদিকে হিন্দুর বসতি; বিদুষী দিল্লীশ্বর-দুহিতার এই বিরাট সুন্দর মছজিদে আজ মুছুল্লি সমাগম নাই। নগরে মুছলিম বাসিন্দা, বাজারে মুছলিম দোকানদার, বিদ্যালয়ে মুছলিম ছাত্র, ময়দানে মুছলিম খেলোয়ার কোথাও সন্তোষজনক সংখ্যায় দেখিলাম না।

অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ : *দিল্লীর গৌরব।*
৪র্থ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৩৭

শিক্ষা : ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক

আনন্দই জীবন। আনন্দকে বিসর্জ্জন যে শিক্ষা সে শিক্ষা কোনক্রমেই বালকের মঙ্গলদায়ক হয় না। যে শিক্ষকের মুখাকৃতি দেখিয়া বালকের অন্তরাত্মা শুকাইয়া যায়, শিক্ষাক্ষেত্র হইতে বিদায় লওয়াই তাঁহার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। শিক্ষককে সহানুভূতিসম্পন্ন ও স্নেহ-প্রবণ হওয়াই সবচেয়ে বেশি দরকার, বিশেষতঃ যেখানে কোমলমতি শিশুটাকে লইয়া চলিতে হইবে। বিদ্যালয় ও তাহার পারিপার্শ্বিক বা তৎসংলগ্ন সমস্ত জিনিসের এমন একটা আকর্ষণ বা মোহ থাকা দরকার, যাহার জন্য বালকগণ তাহার প্রতি আকৃষ্ট হয়। অন্ততঃ শিক্ষকের স্বভাব এমন হওয়া দরকার যাহাতে ছাত্রগণ তাহার সহিত আলাপ বা কথা বলিয়া আনন্দ পায়।

মোহাম্মদ গোলাম জিলানী : *শিক্ষা ও ছাত্রের সম্বন্ধ।*
৪র্থ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৩৭ (১৯৩০)

হিন্দু-মুসলমান

ইতঃপূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরীতে হিন্দু-মুসলমানে যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এবং যাহার প্রতিক্রিয়ায় আজ সারা বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা কি হিন্দু-মুসলমানের আপন-আপন ধর্মের অনুকূল? যাঁহারা দাঙ্গা করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা ইহার পোষকতা করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই বলিবেন হাঁ, ইহা আমাদের স্বধর্ম্মের অনুকূল। যে আমার ধর্ম্মের কোন-কিছুতে বাধা দেয়, আমি ধর্ম রক্ষার্থে তাহার বিরুদ্ধে অবশ্যই দাঁড়াইব—অবশ্যই তাহার প্রতিবিধান করিব, ইহা না করিলে আমার ধর্ম নষ্ট হয়।

কিন্তু প্রকৃত ধার্মিকেরা ইহার উত্তর করিবেন—দেশবাসী ভ্রাতার সহিত বিরোধ করিয়া তুমি তোমার মানবধর্মের গৌরব নষ্ট করিতেছ, বিশ্বপতির বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া পাপ সঞ্চয় করিতেছ। কেহ কেহ বলিতেছেন,—এই বিরোধ প্রকৃত হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ নহে, ইহা গুন্ডাদের কাজ। কেহ বলিতেছেন,—ইহা দেশবাসী কাহারও চেষ্টায় হইতেছে

www.pathagar.com

না, ইহা ইংরাজ শাসনকর্ত্তাদের শাসন-নীতির একটি গুপ্ত অভিসন্ধির ফল। আমরা কিন্তু তাহা বলি না। আমরা বলিব—ইহার জন্য আমরা দেশবাসী হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকেই অপরাধী।

আজ জিজ্ঞাসার দিন আসিয়াছে- হিন্দু ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারা কি মুসলমান ভ্রাতাদিগকে এ পর্যন্ত অবজ্ঞার চক্ষে দেখেন নাই? মুসলমান ভ্রাতা ভগিনীগণ, আপনারাও কি হিন্দুদিগকে ভালবাসিতে পারিয়াছেন? হিন্দু মুসলমানকে ঘৃণা করেন, মুসলমান ধর্মের দিক দিয়া নহে, তাঁহাদের বাহ্যিক আচরণের দিক দিয়া। মুসলমান ও হিন্দুকে ঘৃণা করেন তাঁহাদের সামাজিক রীতি-নীতির দিক দিয়া। উভয়ের ধর্ম ও সমাজ নীতির মধ্যকার মিলনের দিকগুলি বাদ দিয়া আমরা বিরোধগুলিই প্রবল করিয়া তুলিতেছি।

মুসলমান সমাজ হিন্দুর চক্ষে যতই ছোট হউক, মুসলমানের শ্রেষ্ঠতার একটা দাবি আছে—তাঁহারা সারা জগতের মানব-ধর্মের সহিত একতাসূত্রে গ্রথিত। হিন্দু ইহা অন্তরে বুঝিয়াও বাহিরে স্বীকার করিতেছেন না। এক বিশ্বপতির উপাসনা, জগতের মানবমাত্রকেই ভ্রাতৃতুল্য জ্ঞান, আহার-বিহার কোন কিছুতেই কাহাকেও পরিত্যাগ না করা- এ সকল জগতের সার্বজনীন ধর্ম বলিয়া গণ্য।

হিন্দুর বেদ, উপনিষদ, গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র গ্রন্থের শ্রেষ্ঠত্ব কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই, তাহা জগতের সার্বজনীন ধর্মেরই অনুকূল, কিন্তু বর্তমানে হিন্দু-সমাজ ঐ সকল শাস্ত্রের বিধান হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন। হিন্দুর সামাজিক রীতিনীতি, আচার-ব্যবহারে এখন অনেক ভ্রমপূর্ণ বিষয় আসিয়া পড়িয়াছে, যাহাতে দিন দিন এই সম্প্রদায় ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে; অথচ সেইগুলি সংশোধন করা দূরের কথা, তাহাকেই হিন্দুর বৈশিষ্ট্য বলিয়া গর্ব করা হইতেছে। বলিতে কি হিন্দুর সমাজ যেন এখন বহু প্রাচীন হইয়া জরাগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

হিন্দুর বর্তমান অবস্থার মধ্যে বহু মতবাদ আসিয়া পড়িয়াছে, এই জন্য অহিন্দুগণ ইহার তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া, ইহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিতেছেন না। বর্তমানকালে সমগ্র পৃথিবীর মানবের মধ্যে পরস্পর অধিকতর ঘনিষ্ঠতা হইতেছে, এ অবস্থায় ধর্মের মূল সূত্রগুলি নিকট-সম্বন্ধ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বহু দেব উপাসনা পদ্ধতি, কঠোর জাতিভেদ প্রথা প্রভৃতির দ্বারা হিন্দুজাতি সমগ্র পৃথিবীর মানবের সহিত ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন। মুসলমানগণ যে হিন্দুকে ভ্রাতা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না, তাহাও ইহারই ফল। ভারতের হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ প্রভৃতির একত্রে বসবাস করিতে হইবেই। এ অবস্থায় পরস্পর বিরোধ না করিয়া সদ্ভাবে চলাই কর্তব্য। বরং ইহাই আমাদের গৌরবের বিষয় যে, সর্বধর্মের ভক্ত সন্তানের বসবাস একমাত্র ভারত মাতার ক্রোড়েই সম্ভব হইয়াছে। ভারত সন্তানগণের ভিতরেই যেমন জগতের শ্রেষ্ঠ ধর্মশাস্ত্রগুলির অনুশীলন হইয়া থাকে, জগতের আর কোন দেশে এমন সম্ভব হয় নাই। ভারতের এই

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভ্রাতাগণের মিলনের অভাবেই ভারত আজ এত হীনবল। এরপর বিদেশী শাসনশক্তির প্রভাবে আমরা দিন দিন অধিকতর দুর্বল হইয়া পড়িতেছি।

শ্রী অক্ষয়কুমার নন্দী : *হিন্দু-মুসলমান*
৪র্থ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৩৮ (১৯৩১)

পর্দা ও অবরোধ প্রথা

আমার এই প্রতিবাদ-প্রবন্ধে কেহ যেন মনে না করেন যে, আমি অবরোধ প্রথার পক্ষপাতী থাকিয়া—অবরোধ প্রথার স্বপক্ষেই যুক্তি দেখাইতেছি। অথবা আমি মহিলাগণকে নির্মল অবরোধে রাখিবার মতাবলম্বী। অবরোধ-প্রথা বিরোধী পাঠক-পাঠিকাগণ মনে করিবেন না যে, আমি নারী সমাজকে কিছু কম সম্মানের চক্ষে দেখি বা নারী সমাজকে কঠোর পর্দায় আবদ্ধ রাখিবার প্রথাকে অনুমোদন করি। দিন-কালের আবহাওয়া অনুযায়ী মহিলা শিক্ষা কিরূপ উন্নত প্রণালীতে হওয়া উচিত, অবরোধ-প্রথার কিরূপ সংস্কার হওয়া উচিত—এ বিষয়ে বারান্তরে ভিন্ন প্রবন্ধে কিছু আলোচনা করিবার চেষ্টা করিব।

অবরোধ-প্রথার উচ্ছেদ সাধন মানসে অবরোধ-প্রথার দোষ দেখাইতে গিয়া মাননীয়া মিসেস আর. এস. হোসেন সাহেবা মাসিক মোহাম্মদী'তে ১৩৩৫ সালের কার্ত্তিক সংখ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া পর্যায়ক্রমে মহিলা-মহ্‌ফিল বিভাগে অবরোধ-বাসিনী নাম দিয়া সত্য ঘটনা উল্লেখে বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করিয়া আসিতেছেন। উল্লিখিত ঘটনাগুলির ভিতর দিয়া তিনি অবরোধ-বাসিনীদিগের একশেষ দুর্দশা দেখাইয়া অবরোধ-প্রথায় কিরূপ ভয়াবহ অনিষ্ট সাধন হইতেছে, তাহা সমাজকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইবার চেষ্টা পাইতেছেন। মাননীয়া লেখিকা সাহেবার বর্ণিত ঘটনাগুলি একটু মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলেই সেগুলি এতই অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় যে, শিশুদিগের জন্য লিখিত 'আষাঢ়ে গল্প' বা 'ঠাকুর-মার উপকথা'ও বুঝি এত অধিক পরিমাণে অস্বাভাবিকভাবে বর্ণিত হয় না। লেখিকা সাহেবা বলেন, অবরোধে বসবাস করায় মহিলাগণের কিছুমাত্র বুদ্ধি-বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত না হইয়া স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয় এবং তাহার ফলে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করিতে প্রতি কার্যে মহিলাগণ অস্বাভাবিকভাবে বিপদগ্রস্তা হইতে থাকেন। অবরোধ-প্রথা যতই কঠিন থাকুক না কেন, লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা জ্ঞানার্জন ব্যতীত প্রাকৃতিক শিক্ষার ফলে মানুষের যে সাধারণ বুদ্ধি-বৃত্তি বা জ্ঞানের উন্মেষ হয়, তাহা অবরোধ-প্রথা আটকাইয়া রাখিতে পারে না। লেখাপড়া শিক্ষার কোন সুযোগ কিছুমাত্র না পাইলেও কেবল মাত্র প্রাকৃতিক নিয়মে মানুষের বুদ্ধি-বৃত্তি যেরূপ প্রস্ফুটিত হয়, তাহাতেও মানুষের জীবন-যাত্রার পথে দৈনন্দিন কার্যের ঘটনাবলীতে কোন অবরোধবাসিনীর পক্ষে লেখিকা সাহেবার লিখিত বর্ণনার মত বিপদগ্রস্তা হওয়া সম্পূর্ণরূপে অস্বাভাবিক বলিয়াই মনে হয়। কেবল মাত্র হাবা, কালা, বোবা হইলেই বর্ণিত ঘটনাগুলি সংঘটিত হওয়া অনেকটা সম্ভবপর। লেখিকা সাহেবা সমুদয় ঘটনাগুলি নিজের জীবনে প্রত্যক্ষ দর্শন করিবার সুযোগ নিশ্চয়ই পান নাই। হয়তো সামান্য একটু মাত্র

www.pathagar.com

সূত্র হইতে ক্রমশঃ পল্লবিত হইয়া শেষ পর্যন্ত তিনি যেরূপ শুনিতে পাইয়াছেন, তাহাই আবার মার্জিত ভাষায় পাঠক-পাঠিকাগণকে তিনি উপহার দিয়াছেন। প্রকাশের পূর্বে লেখিকা সাহেবা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিতেন, সেগুলি উপকথায় পরিণত হইয়াছে। পরপর সমস্ত বর্ণিত ঘটনাগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইতে গেলে, পর্য্যায়ক্রমে মাসের পর মাস প্রতি সংখ্যার প্রতিবাদ প্রবন্ধ প্রকাশ করিতে হয়। তাহা মোটেই সম্ভবপর নহে। লেখিকা সাহেবার বর্ণিত সামান্য কয়েকটি মাত্র ঘটনা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি।

মাসিক মোহাম্মদীর ১৩৩৫ সনের কার্ত্তিক সংখ্যায় অবরোধবাসিনী প্রবন্ধের ২য় দফার সংক্ষিপ্ত—"বেহারাগণ সওয়ারী নামিয়াছে ভাবিয়া হাশমত বেগম ও তাঁহার শিশুপুত্রসহ পাল্কী লইয়া চলিয়া গেল এবং বটতলায় পাল্কী রাখিয়া দিল। শিশুপুত্রসহ বেগম সাহেবা শীতকালের সন্ধ্যা হইতে সারারাত্রি বটতলায় পাল্কীর মধ্যে আবদ্ধা থাকিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে পুনরায় সওয়ারী বহন করিবার জন্য বেহারাগণ পাল্কী লইয়া বাড়ির দরজায় রাখিল। তখন দরজা খুলিয়া দেখা গেল, শিশুপুত্রসহ বেগম সাহেবা পাল্কীতেই রহিয়াছেন। তিনি পাল্কী হইতে নামিবার পূর্বেই বেহারাগণ পাল্কী ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু তিনি টু শব্দও করেন নাই, পাছে তাঁহার কণ্ঠস্বর বেহারাগণ শুনিতে পায়। শিশুকেও প্রাণপণযত্নে কাঁদিতে দেন নাই- যদি তাহার কান্না শুনিয়া কেহ পাল্কীর দ্বার খুলিয়া দেখে।"

কাজী হায়দরজান : *অবরোধ-বাসিনী (প্রতিবাদ)*
৪র্থ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৩৮ (১৯৩১)

দাঙ্গা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও দেশবাসীর প্রার্থনা

বাঙ্গলার বিশ্ববিশ্রুত কবি রবীন্দ্রনাথ পারস্য ভ্রমণ করিয়া সম্প্রতি স্বদেশে ফিরিয়া অসিয়াছেন। পারস্যের সঙ্গে বাঙ্গালার প্রাণগত সামঞ্জস্য যেমন অসামান্য, তাহার সহিত পারস্যের পরিচয়ও তেমনি সুগভীর—যদিও এখন তাহা বিস্মৃতপ্রায়। কিছুদিন পূর্বে বাঙ্গালার সাধক ঋষি দেবেন্দ্রনাথের ভাব-গদগদ কণ্ঠে হাফেজের গজল গানের ঝঙ্কার শুনিতে পাওয়া যাইত। আবার হাফেজের পৃষ্ঠায় বাঙালার স্তুতি শুনিষা দেশভক্ত বাঙালির প্রাণে আনন্দের ঝঙ্কার উঠিত। বাঙ্গালার সে আনন্দ যুগ অতিবাহিত হইয়া গেলেও, আজ ভক্ত দেবেন্দ্রনাথের উপযুক্ত পুত্র ভাবুক রবীন্দ্রনাথকে পারস্যবাসী কর্তৃক অভ্যর্থিত হইতে দেখিয়া বাঙ্গালার অদূর অতীতের সেই মধুর স্মৃতি আবার অন্তরে জাগ্রত হইয়া উঠিতেছে।

পারস্য হইতে প্রত্যাবর্তনের সময় বোম্বাই নগরের সাম্প্রদায়িক সংঘাত-সংঘর্ষের শোচনীয় অবস্থা অবগত হইয়া কবির প্রাণে যে নিদারুণ আঘাত লাগিয়াছিল, তাঁহার প্রথম বিবৃতিতেই তাহার যথেষ্ট অভিব্যক্তি হইয়াছে। দুইশত লোক এই দাঙ্গায় নিহত, দুই হাজার আহত—নির্মমতার কি শোচনীয় অভিনয়। বোম্বাই বলিয়া সৎ নাই এবং ইহাই শেষ দাঙ্গা নহে, দেশের যে কোন কেন্দ্রে যে কোন মুহূর্তে এইরূপ বা ইহা অপেক্ষা শোচনীয়তর পাষণ্ডতার অভিনয় সংঘটিত হইতে পারে। শুধু পারে নয়, পারা যাহাতে আশু সম্ভব হইয়া

www.pathagar.com

উঠে, এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার সমালোচনা উপলক্ষে আমাদের সাংবাদিকরা তার পথও প্রস্তুত করিয়া চলেন।

এদেশের হিন্দু সাংবাদিকগণ অবিরামভাবে হিন্দু সমাজকে বুঝাইয়া আসিতেছেন যে, মুছলমানের ধর্ম, তাহার কালচার, তাহার সভ্যতা এবং তাহার জাতীয় মনোবৃত্তির স্বাভাবিক ফলেই তাহারা সর্বদা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় প্রবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এ কথা ঠিক নহে। তিনি পারস্য, এরাক প্রভৃতি দেশের স্বাধীন মুছলমানদিগের সহিত মিশিয়া বুঝিতে পরিয়াছেন যে, "মুছলমান-মনোবৃত্তির অন্তর্নিহিত কোন কিছুই এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের কারণ নহে—ইহা আমাদের এই দেশেরই একটা ব্যাধি।" এ ক্ষেত্রে আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করান হইয়াছে ভারতীয় মুছলমানকে আর তাহার ধর্ম ও সভ্যতা প্রভৃতিকে। রবীন্দ্রনাথ মুছলমান-ধর্ম ও সভ্যতাকে "নির্দোষ" বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই সভ্য ভাষণের জন্য আমরা তাঁহার প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। কিন্তু এই বর্ণনার এমন একটা দিক আছে, যাহা দ্বারা এরূপও বোঝা যাইতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথও ভারতীয় মুছলমানকেই দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য একমাত্র অথবা প্রধান অপরাধী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। সে যাহা হউক, এই সমস্ত ন্যায়ের খুঁটিনাটি লইয়া আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা রবীন্দ্রনাথকে আজ বিনীতভাবে জানাইতে চাই যে, তাঁহার এই আন্তরিকতাপূর্ণ বাণী আজ মুসলমান সমাজের চিন্তাশীল ও দেশ হিতৈষী ব্যক্তিদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, এবং ভাবী প্রতিকার চেষ্টার জন্য তাহারা সকলে তাঁহার মুখের পানে তাকাইয়া আছে। দেশবাসী এই অভিশাপ হইতে মুক্ত হউক—ইহাই তাহাদের অন্তরের প্রার্থনা।

এই সব দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্য হিন্দু ও মুছলমানের দায়িত্ব বা অপরাধ কতটা, অথবা কোন দাঙ্গায় কোন সম্প্রদায়ের লোক কি পরিমাণ পাষণ্ডতার অভিনয় করিয়াছে, বর্তমানে তাহার সূক্ষ্মবিচার করিতে যাওয়া অনর্থক ও অসম্ভব উভয়ই। কারণ ন্যায়ান্যায় ও সত্যাসত্য বিচারকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দিয়াই আমরা এসব ক্ষেত্রে স্ব স্ব সমাজের ওকালতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। এই অভিশাপের আসল বীজটি আমাদের জাতীয় জীবনের কোন স্তরে কিরূপে লুকাইয়া আছে, সেইটা আবিষ্কার করাই এক্ষেত্রে সর্বপ্রথম আবশ্যক। আমাদের বিশ্বাস, এই মূলীভূত নিদানটি আবিষ্কৃত হইলে, তাহার প্রতিকার সহজসাধ্য হইয়া যাইবে। আমরা যতটুকু বুঝিয়াছি, রবীন্দ্রনাথ তাঁহার বাণীতে এই নিদানটার প্রতিই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

অশেষ পরিতাপের সহিত বলিতে হইতেছে যে, সত্য দর্শনের ও পূর্ণ দর্শনের অধিকারী দেশের শক্তিমান পুরুষরা এই বিষ কন্টকের চিরগুপ্ত ও চির উপ্ত মূল বীজটি অবিষ্কার করার জন্য এ যাবৎ বিশেষ কোন সাধনা করেন নাই। রবীন্দ্রনাথের কথায় আমাদের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে, কারণ ইহার উপযোগী মন ও মস্তিষ্ক উভয়ই আল্লাহ তাঁহাকে দিয়াছেন।

www.pathagar.com

তিনি সমস্ত শক্তি লইয়া এই সাধনায় অবহিত হউন—ইহাই তাঁহার হতভাগ্য দেশবাসীর বিনীত প্রার্থনা।

আলোচনা

৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৩৯ (১৯৩২)

নারী

এই যুগে নারীর দুই প্রকার স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। এক : অতিউচ্চ স্থান—যাহার উপর পুরুষেরও স্থান হইতে পারে না। অন্য : অতি জঘন্য স্থান—যাহা মানুষে বর্ণনাও করিতে পারে না। বৌদ্ধ যুগে পর্দার অযথা শৈথিল্য নিবন্ধন নারী জাতির চরিত্রহীনতা ঘটে। বোধ হয়, এই জন্যই মনু নারী জাতির জন্য এ কঠোর বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। বৈদিক যুগ হইতে তাহাদের স্থান ক্রমে ক্রমে হীনতর হইয়া এযুগে পৌঁছিয়াছে। মনু গৃহের গৃহিণী ও গৃহলক্ষ্মীর মধ্যে কোনই প্রভেদ রাখেন নাই। যে-গৃহে নারী সম্মানিত হয়, সেখানে দেবতাগণ সহাস্যে বিরাজ করে—আর যে গৃহে তাহারা অবমানিত হয়, সে-গৃহের কোন কার্যই সফল হয় না। যে পরিবারে নারীজাতি সুখভোগ করে, সেখানে সুখসমৃদ্ধি অটল থাকে; আর যেখানে তাহারা দুঃখভোগ করে, সে পরিবার অচিরেই লয়প্রাপ্ত হয়। যে গৃহে স্বামী-স্ত্রী অকপট প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ থাকে; সেখানে চিরকাল সৌভাগ্য বিরাজ করে। সুন্দরী নারী তাহার সৌন্দর্যে জগতকে সুন্দর করিয়া সমস্ত বস্তুকে তাহার স্বামীর চক্ষে সুন্দর দেখায়। এক মা সহস্র পিতা অপেক্ষাও বেশি শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্রী। নারী আজীবন অবিবাহিতা থাকিবে, তবু কোন প্রকারেই অপাত্রকে বিবাহ করিবে না। সে সাবালিকা হইয়া তিন বৎসর কাল বিবাহের জন্য অপেক্ষা করিবে; ইত্যবসরে তাহার অভিভাবক তাহার বিবাহের ব্যবস্থা না করিলে সে সেচ্ছায় সগোত্র হইতে উপযুক্ত পাত্রকে বিবাহ করিতে পারিবে। স্ত্রী কোন প্রকার দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইলে তাহার স্বামী তাহার অনুমতি লইয়া দ্বিতীয় দ্বার পরিগ্রহ করিতে পারে; কিন্তু তাহাকে অপমান করিবে না—ইহাই মনু সংহিতায় নারীর উচ্চস্থান। এখন দেখা যাক, মনু নারী জাতির জন্য কি কি কঠোর বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন : তাহার মতে নারী কোন প্রকারেই স্বাধীনতা পাইবার উপযুক্ত নয়। রোমীয় নারীর ন্যায় হিন্দু নারীকেও বাল্যে পিতা, যৌবনে স্বামী ও বার্ধক্যে পুত্রের তত্ত্বাবধানে থাকিতে হয়। পুরুষজাতি নষ্ট করাই নারীর প্রকৃতি। বিধবার কোন প্রকারে বিবাহ হইতে পারে না। ক্রোধ, কুটনীপনা, কুৎসা, শয্যা ও সজ্জাপ্রিয়তাই তাহার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সন্তানসন্ততি উৎপাদনের জন্যই তাহাদের সৃষ্টি। পৌরাণিক যুগেও নারী জাতির অবস্থার কোনই উন্নতি দেখা যায় না। স্ত্রীলোক কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য নহে। -Bishnu Puran— B.K. III ch. 12.

তুলসীদাস দোঁহাবলীতেও নারীজাতিকে অবজ্ঞার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন :

www.pathagar.com

"দিনকা মোহিনী রাতকা কামিনী, পলক পলক লহু চোষে,
দুনিয়া সব বউরা হোকে, ঘর ঘর বাঘিনী পোষে।"

মুজীবর রহমান : *পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নারীর স্থান*
৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪০ (১৯৩৩)

পর্দা প্রথা বিতর্ক

গত ১৩৩৯ সালের "মাসিক মোহাম্মদী"র শ্রাবণ সংখ্যায় (পৃঃ ৬৬৬) শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "সমাজ সমস্যা ও নারী" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন : "ইসলাম ধর্মের প্রভাবে আমাদের সামাজিক জীবনেও অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে। নারীর ভিতরে অবরোধ-প্রথা দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।" এই মতটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও অমূলক। ইসলাম ধর্মের ফলে ভারতে অবরোধ প্রথার প্রচলন হইয়াছে, ইহা কি সত্য? না, হিন্দু ধর্মের প্রভাবে ভারতে অবরোধ প্রতিষ্ঠিত হইল? প্রথমোক্ত মতালম্বী পাঠকের জন্য আমার উত্তর এই যে : যদি সে-কথাই সত্য হয়, তবে ভারতের বাহিরেও যে সব দেশে ইসলামধর্ম প্রচলিত আছে, সেখানে অবরোধ ও পর্দাপ্রথার এত কঠোরতা নাই কেন? ইসলাম এ বিষয়ে বিশেষ কোন কঠোরতা অবলম্বন করে নাই। এদিকে আবার দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের অনেক স্থানে পর্দা ও অবরোধের কথা আছে। যেমন বর্তমান ভারতে সমাজ ও পরিবারবিশেষে অবরোধ ও পর্দার শৈথিল্য ও কঠোরতা উভয়ই পরিলক্ষিত হয়, প্রাচীন ভারতেও তদ্রূপ ছিল। "অন্তঃপুর" ও "অসূর্যম্পশ্যা" শব্দ দুইটি প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য হইতেই গৃহীত হইয়াছে। কুলকামিনীগণের বাসস্থানের জন্যে যে বাসগৃহ, তাহাই অন্তঃপুর, আর সেই অন্তঃপুরবাসিনী সে কুলকামিনী জন্মেও সূর্যকিরণ দেখে নাই, তাহাকেই প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যিকগণ বলিয়াছেন : অসূর্যম্পশ্যা রমণী। রামায়ণে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় :

"এত যদি রঘুনাথ হ'লেন নিষ্ঠুর।
কাঁদিতে কাঁদিতে তা'রা গেলো অন্তঃপুর (১০)"।

চাণক্য-প্রণীত অর্থশাস্ত্রেও ইহার অনেক উল্লেখ আছে। মনুসংহিতায় এই অবরোধ-প্রথার বিশেষ কঠোরতা দেখিতে পাওয়া যায় (১১)। কালিদাস-কৃত মেঘদূত (১২), রঘুবংশ (১৩), কুমার সম্ভব (১৪), শকুন্তলা (১৫) প্রভৃতি গ্রন্থেও এই অন্তঃপুর ও অসূর্যম্পশ্যা রমণীগণের অনেক উল্লেখ আছে। ইসলামের প্রভাবে ভারতে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত হয় নাই—ইসলামের আগমনের বহু শতাব্দী পূর্ব হইতেই ইহা এদেশে প্রচলিত ছিল। বর্তমান কালের ন্যায় সে যুগেও অনেক পরিবার এ প্রথা মানিত না।

মুজীবর রহমান : *পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ে নারীর স্থান (প্রাচীন ভারতে অবরোধ ও পর্দা প্রথা)।*
৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪০ (১৯৩৩)

www.pathagar.com

সতীদাহ প্রথা

Miss Mayo লিখিত Mother India-র প্রতিবাদ প্রসঙ্গে স্বামী সত্যানন্দ তাহার "নারী" নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, ভারতে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল মুসলমান রাজত্বের ফলেই এমন অসংযত মিথ্যা অপবাদ মুসলমান রাজত্বের উপর আরোপিত করা হিন্দুদের একটা chronic ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছে। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের দুই একটি পৃষ্ঠা খুলিয়া দেখিলেই লেখক বুঝিতে পারিতেন যে, ইসলামের জন্মের বহু শতাব্দী পূর্বে বৈদিক যুগেও হিন্দু সমাজে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। অথর্ববেদে আমরা ইহার প্রথম আভাস পাই।

ঐতিহাসিক Strabo (64 B.C.) লিখিয়াছেন : "ভারতে মৃত স্বামীর সহিত জীবন্ত স্ত্রীকে দাহ করা হয়, যেসব নারী তাহাতে অস্বীকৃত হয়, সমাজে সে ঘৃণার পাত্রী। ঐতিহাসিক Diodorus Siculus (44 B.C.) লিখিয়া গিয়াছেন : ভারতে বিধবাগণকে স্বামীর মৃতদেহের সহিত দাহ করা হয়। কিন্তু যাহার শিশু সন্তান আছে বা যাহারা গর্ভবতী, তাহাদিগকে দাহ করা হয় না। এই দুইটি কারণ ব্যতিরেকে যাহারা সহমরণে অস্বীকার করে, তাহাদিগকে আজীবন বিধবা থাকিতে হয় এবং যাগযজ্ঞাদির কার্যে তাহারা যোগদান করিতে পারে না। বানভট্ট-কৃত হর্ষচরিতে দেখিতে পাওয়া যায়—রাজা হর্ষের মৃতদেহের সহিত তাহার জীবন্ত স্ত্রীকেও দাহ করা হইয়াছে। খ্রিষ্টীয় নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে আরব-বণিক সোলেমান এই প্রভা স্বচক্ষে দেখিয়া গিয়াছেন। শিরাফ নিবাসী ঐতিহাসিক আবুজিয়াদও ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন (৯০৬ খ্রিঃ অঃ)। ইটালীয় পরিব্রাজক Nicolo-de-Conte পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে লিখিয়া গিয়াছেন : বিজয়নগর-রাজ দ্বিতীয় দেবরায়ের মৃতদেহের সহিত তাহার দুই সহস্র স্ত্রীকেও দাহ করা হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমি এ স্থানে আর বেশি কিছু বলিতে ইচ্ছা করি না। যদি কেহ ইহার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, তবে তিনি J. Pegg- কৃত Indian Cries to British Humanity—পুস্তকখানি পাঠ করিলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত সতীদাহ প্রথার বিস্তৃত বিবরণ জানিতে পারিবেন। মুসলমান রাজত্বে এ ভয়াবহ প্রথা প্রচলিত হয় নাই, বরং এ সময়ে সতীদাহ অনেক পরিমাণে প্রশমিত হইয়াছিল। কারণ মুসলমান সম্রাট আকবর শাহ সতীদাহ-প্রথা নিবারণের জন্য অনেক চেষ্টা করেন।

সতীদাহ-প্রথা এখন রহিত হইয়াছে, কিন্তু বিধবা বিবাহ এখনও প্রচলিত হয় নাই। বিদ্যাসাগর প্রমুখ মহাত্মাগণ এ প্রথা প্রচলনের জন্য অনেক লড়াই করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সফলকাম হইতে পারেন নাই। কবি হেমচন্দ্র ইহাদের দুঃখময় জীবনের কথা করুণ-উচ্ছ্বাসে গাহিয়া গিয়াছেন :

"ভারতের পতিহীনা নারী বুঝি ওই রে,
না হ'লে এমন দশা নারী আর কই রে।
পুরুষ দু'দিন পরে আবার বিবাহ করে

www.pathagar.com

অবলা নারীর প্রাণে এতই কি সয় রে ?"

-বিধবা নারী।

মুজিবর রহমান : *পৃথিবীর বিবিধ সম্প্রদায়ে নারীর স্থান।*
৭ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪০ (১৯৩৩)

আকবর ও হিন্দু-মুসলমান

ব্যক্তিগত আকর্ষণ ব্যতীতও আকবর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে ভারতে শান্তিময় শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে অসীম সহিষ্ণুতার ভাব জাগাইয়া তুলিতে হইবে। তিনি মনে করিতেন, পরস্পরের সাহিত্য অধ্যয়ন না করিলে উহা সম্ভবপর হইবে না। আবুল ফজল স্বীয় অনুবাদিত মহাভারতের উপক্রমণিকায় আকবরের এই ধারণার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন : "হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঘৃণার ভাব অত্যন্ত অধিক এবং তাহাদের পরস্পরের প্রতি কুৎসাবৃষ্টি চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে। ইহার প্রধানতম কারণ পরস্পরের সাহিত্য না জানা। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া দূরদর্শী সম্রাট স্থির করিলেন যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কয়েকখানা প্রামাণ্য গ্রন্থ অপরের ভাষায় অনুবাদ করা উচিত—যেন উভয় সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে ঘৃণা ও বিদ্বেষ করার পরিবর্তে সত্যজ্ঞান ও অপর পক্ষের দোষগুণ উভয়ই জানিতে পারে এবং নিজেদের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিতে পারে।"

ব্যক্তিগত আকর্ষণ ও রাজনৈতিক কারণে আকবর প্রধান প্রধান সংস্কৃত পুস্তকগুলি মুসলমানদের জন্য সহজ প্রাপ্য করিবার মানসে একটি অনুবাদ-বিভাগ সৃষ্টি করেন। উহা ফতেহ্‌পুরী দীওয়ানখানাতে স্থাপিত হয় এবং ফারসি ভাষায় তরজমা করিবার জন্য ভারতীয় সাহিত্য হইতে মহাভারতকেই প্রথম নির্বাচন করা হয়। কয়েকজন পণ্ডিতকে এই মহাকাব্যের ব্যাখ্যাকারী এবং নকীব খাঁকে তিনি ইহার অনুবাদক নিযুক্ত করেন। তিনদিন এইভাবে কাজ চলে। তৎপর ঐতিহাসিক আল-বাদয়ূনীকে নকীব খাঁর সহিত যোগ দিতে আদেশ দেওয়া হয়। চার মাসে বিরাট পুস্তকের অষ্টমাংশ ফারসিতে অনুবাদিত হয়। তৎপর ইহাকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়। এক ভাগ হাজী মুহম্মদ সুলতানের সহযোগিতায় নকীব খাঁ অনুবাদ করিবেন, অপর ভাগ করিবেন মোল্লা শেরী। মোল্লা ফয়জী এই কাজের পরিদর্শক নিযুক্ত হইলেন। এক তৃতীয়াংশ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর হাজী মুহম্মদ সুলতানকে বাকি অংশ শেষ করিতে এবং সম্পূর্ণ অনুবাদ পরিমার্জিত করিতে হুকুম দেওয়া হয়। এইভাবে উক্ত হিন্দু মহাকাব্যের ফারসি অনুবাদ সম্পন্ন হয়। উহার নাম রাখা হয় "রজ্‌ম-নামা" (যুদ্ধ পুস্তক)। তখন উহা নকল ও চিত্রিত করিয়া প্রকাশিত করা হয়।

আকবর এই কার্যে এতদূর উৎসাহী ছিলেন যে মূল পুস্তকের ব্যাখ্যা কার্যে তিনি অনুবাদকদের সহিত নিজেও যোগ দিতেন; উহা শেষ হইলে স্বীয় দরবারের প্রত্যেককে অন্ততঃ আংশিকভাবে হইলেও উহা এক একখানি নকল করিবার হুকুম দেন।

www.pathagar.com

এইরূপে সম্রাটের নির্দেশানুসারে, তদীয় দরবারের শ্রেষ্ঠ বিদ্বানমন্ডলীর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে, সমসাময়িক সুশিক্ষিত পণ্ডিতদের সহায়তায় মহাভারত, রামায়ণ, ভগবৎগীতা, অথর্ববেদ, যোগবশিষ্ঠ, মহেশ-মহানন্দ, হরিবংশ, জীবজন্তুর কাহিনী প্রভৃতি হিন্দুদের বহু পুস্তক আবুল ফজল, ফয়জী, নকীব খাঁ, হাজী মুহম্মদ সুলতান, মোল্লা ইব্রাহীম এবং মোল্লা আবদুল কাদের বদায়ূনী প্রভৃতি বিচক্ষণ বিদ্বানমণ্ডলীর দ্বারা সংস্কৃত হইতে ফারসি ভাষায় অনুবাদিত হয়।

আবদুল হক ফরিদী : *সংস্কৃত সাহিত্য ও মুসলমান।*

৭ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪১ (১৯৩৪)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

মহরমের মিছিল রাধাকৃষ্ণ মন্দির ও রামজী মন্দিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলে ঐ দুই মন্দিরের ছাদ হইতে মিছিলের উপর ইট-পাথর নিক্ষেপ আরম্ভ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্ববর্তী বাড়িগুলির ছাদ হইতেও ইট-পাটকেল ফেলা হইতে থাকে। তখন মুছলমানরা ছত্রভঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং মিছিল বড় রাস্তায় ফেলিয়া রাখিয়া গলি-রাস্তায় মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা আরম্ভ করিয়া দেয়।

আলোচনা : *ফিরোজাবাদ*

৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ (১৯৩৫)

দাঙ্গার বিপক্ষে

মহরম, রামলীলা, দুর্গাপূজা প্রভৃতি পূজা-পার্বন ও উৎসবাদি উপলক্ষে এ দেশের বিভিন্ন ধর্ম-সমাজ নানা প্রকার মিছিল ও শোভাযাত্রা করিয়া থাকেন। প্রত্যেক সমাজের জ্ঞান-বিশ্বাস অনুসারে ঐসব মিছিল বা তাহার উপকরণগুলি তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানের অন্তর্গত। ইহাতে বিঘ্ন উপস্থিত করিলে সেই সমাজের ধর্মভাবকে আঘাত করা হয়। এইসব সংস্কার ও অনুষ্ঠান জ্ঞান ও যুক্তির হিসাবে সঙ্গত অথবা শাস্ত্রের ব্যবস্থাসম্মত কিনা, সে বিতর্ক তুলিবার অধিকার এ ক্ষেত্রে অন্য কাহারও নাই। যদি অন্য কোন ধর্ম-সমাজ কোন অজুহাতে কোন প্রকার আঘাত দিয়া বা অত্যাচার করিয়া এইসব মিছিলে বা উৎসবের শান্তি সম্মান ও পবিত্রতাকে নষ্ট করিয়া দিতে চায়, এবং তাহার ফলে যদি বিশেষ কোন শোচনীয় ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়া যায়, তাহা হইলে প্রথম আঘাতকারীরাই তাহার জন্য মূলতঃ ও মুখ্যতঃ দায়ী হইবে। ধর্ম ও ধর্মানুষ্ঠান বলিয়া বিশেষতঃ কিছুই নাই। গুরুতর উত্তেজনার ফলে আত্মহারা হইয়া মানুষ যদি কোন ভীষণ অপরাধ করিয়া বসে, তাহা হইলে সেই

www.pathagar.com

উত্তেজনার নায়কদিগকেই ঐ অপরাধের মূল কারণ বলিয়া নির্ধারণ করা হয়। ফিরোজাবাদের দুর্ঘটনা সম্বন্ধে এই কথাগুলি স্মরণ রাখিতে হইবে।

আলোচনা : *ফিরোজাবাদ*
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ (১৯৩৫)

দাঙ্গার কারণ

মহরমের অল্প কয়েকদিন মাত্র পূর্বে করাচীর দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছিল। হিন্দুদের সঙ্গে এই ঘটনার কোন দিককার কোন প্রকার সম্বন্ধ-সংস্রব না থাকিলেও যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রভৃতি প্রদেশের হিন্দুরা এই মোছলেম-হত্যা ব্যাপারে অতি নিষ্ঠুরভাবে নিজেদের আনন্দ ও সমর্থন প্রকাশ করিয়া আসিতেছিলেন। এইসব সভা সমিতির প্রস্তাবেও সংবাদপত্রের প্রবন্ধে মুসলমান সমাজ গভীর মর্মবেদনা অনুভব করিতেছিল এবং সেজন্য ফিরোজাবাদের মুছলমানদিগের মধ্যে একটা সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সৃষ্টি হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না।

আলোচনা : *ফিরোজাবাদ*
৮ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২ (১৯৩৫)

ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে

'উচ্চশিক্ষার উপকার' বলিতে গভর্ণমেন্ট কি মনে করিতেছেন আমরা তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমরা নিজেরাই ইংরাজি শিক্ষিত নহি। মাতৃভাষার প্রতি কোন বিদ্বেষ বা ইংরাজি সম্বন্ধে কোন গোঁড়ামিও আমাদের নাই। তত্রাচ আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে যুগের আলোক ও বাতাসের সঙ্গে সংস্রব রাখিয়া চলিতে হইলে এবং দেশের বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সহিত সম্বন্ধ রাখিতে হইলে, ইংরাজি শিক্ষা ব্যতীত গত্যন্তর নাই। পল্লী অঞ্চলের যেসব ছাত্র হাইস্কুলে বা কলেজে অধ্যয়ন করে, তাহাদের অনেকেই ডাক্তার হয় না, উকিল হয় না বা ডেপুটি হইতে পারে না, ইহা ঠিক কথা। কিন্তু কুলীন নাগরিকদের অবস্থাও ত এইরূপ। পক্ষান্তরে তাহাদের মধ্যকার যাহারা উচ্চশিক্ষার 'উপকার' লাভে সমর্থ হইয়াছে, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া তাহাদের স্বজনবর্গ উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। যাহারা ততটা পারিয়া উঠিতেছে না, তাহারাও কেরানীগিরি করিয়া, মাস্টারি করিয়া এবং অন্যান্য নানা প্রকার বৃত্তি অবলম্বন করিয়া ভদ্রভাবে নিজেদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতেছে, নিজেদের সন্তানদিগকে উচ্চশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা পাইতেছে। এইরূপে বাঙ্গালার পল্লী সমাজের মধ্যে একটা শিক্ষিত বা শিক্ষানুরাগী মধ্যম স্তর গড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৩৭ সাল হইতে দেশে নূতন শাসন-সংস্কারের প্রবর্তন হইবে। ইহার পর জনসাধারণের আত্মশাসনের বা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার উত্তর উত্তর বাড়িয়াই যাইবে। এই সময় ব্যবস্থাপক সভাগুলির সরকারি ভাষা যে ইংরেজিই থাকিবে তাহাও পূর্ব হইতে নির্দিষ্ট করিয়া

www.pathagar.com

দেওয়া হইয়াছে। ইংরাজি না জানা পল্লী প্রতিনিধিরা তখন ব্যবস্থাপক সভায় আসিয়া কোন মতেই যে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবেন না, ইহা স্থির নিশ্চিত।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *শিক্ষার নব-পর্যায়।*

৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪২ (১৯৩৫)

শিক্ষানীতির ত্রুটি

১. বর্তমানে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা অত্যন্ত নিকৃষ্ট শ্রেণীর। এই নিকৃষ্ট শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট করিতে হইবে এবং সে জন্য স্কুলের ও স্কুলগামী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা, অবস্থান ও ব্যবধান প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণ করিয়া দিতে হইবে।

২. বাঙ্গালার পল্লী অঞ্চলে এমন ভাবের শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করিতে হইবে। যাহাতে পল্লী বালকেরা সাধারণতঃ নিজেদের গ্রামকে লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হয়। তাহাদের মন যাহাতে শহরমুখী না হইয়া দাঁড়ায়। তাহারা বাহিরের আলো, জ্ঞান ও প্রেরণা আহরণ করিতে থাকিবে সব-ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের মারফতে। তাহারা যাহাতে সহজে ইংরাজি শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা লাভ করিতে না পারে। যথাসম্ভব সতর্কতার সহিত তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা এই উভয় নীতিরই ঘোর বিরোধী। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে তাহার শিক্ষক সংখ্যা বাড়াইয়া দিতে হইবে, শিক্ষকদিগের বেতন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করিতে হইবে। এ জন্য টাকার দরকার। গভর্ণমেন্ট যদি টাকা সরবরাহ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহাদের অন্ততঃ চুপ করিয়া থাকা উচিত।

মোহাম্মদ আকরম খাঁ : *শিক্ষার নব-পর্যায়*

৮ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪২ (১৯৩৫)

রাজনীতি ও মুসলিম সমাজ

রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রথম জাগরণ হয় ১৯০৮ সনে ঢাকা শহরে স্যার সলিমুল্লা ও ভারতের অন্যান্য মুসলিম মনীষীদের চেষ্টায় নিখিল-ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠায়। এ জাগরণকে সম্ভব করিয়া দিয়াছিল মুসলমানদের প্রতি—রাজনীতি ক্ষেত্রে হিন্দুদের অনুদার ব্যবহার। মিন্টো-মর্লি রিফর্মের পূর্বে যুক্ত নির্বাচন-প্রথা বিদ্যমান ছিল। সেই সময়ে নির্বাচন-ক্ষেত্রে মুসলমানদের সর্বদা স্বীকার করিতে হইত পরাজয়। হিন্দু জমিদারের তুলনায় মুসলমান জমিদারের সংখ্যা ছিল অতি নগণ্য, হিন্দু জমিদারদের তখন ছিল অপ্রতিহত ক্ষমতা। ভোটের ব্যাপারে তাঁহারা মুসলমান প্রজাদের উপর জোর চালাইতেন। অতএব ভোটের সময় মুসলমান প্রার্থীর জয়ের সম্ভাবনা বিন্দুমাত্রও থাকিত না। নমিনেশনে দু'একজন মুসলমান মাত্র আইন-সভায় স্থান পাইতেন। মিন্টো-মর্লি রিফর্মের প্রবর্তনের সহিত মুসলমান প্রথম বুঝিতে পারিলেন, ভোটাধিকার কি জিনিস এবং নিজের সমাজের

www.pathagar.com

উপযুক্ত লোককে ভোট দিয়া আইন সভায় পাঠাইতে পারিলে কি লাভ। মিন্টো-মর্লি রিফর্মে মুসলমানদের জন্য Special representation এর ব্যবস্থা হইলেও মূলতঃ সেই সময় হইতেই মুসলমানদের জন্য স্বত নির্বাচনের আবশ্যকতা স্বীকৃত হয়।

১৯১৬ সনে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আদর্শ ও উদ্দেশ্য হয় Responsible self-Government লাভ। সেই সময়ে লক্ষ্ণৌ শহরে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে একটা চুক্তি হয়। সেই চুক্তিই Lucknow Pact নামে পরিচিত। মিন্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারে মুসলমানকে যতটুকু অধিকার দেওয়া হইল, এই চুক্তিতে তাহা হইতে বেশি অধিকার দেওয়ার কথা স্বীকৃত হয়। কিন্তু বাংলাদেশে তখন মুসলমানদের সংখ্যা হিন্দু হইতে বেশি থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য প্রদেশের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের আইন-সভায় সংখ্যানুপাত হইতে বেশি আসন দিতে গিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিয়া লওয়া হয় বাঙ্গার মুসলমানদের আসন সংখ্যা কমাইয়া দিয়া। লক্ষ্ণৌ-প্যাক্ট অনুসারে বাংলার মুসলমানকে দেওয়া হইল ৩৯টি আসন। অর্থাৎ সেই চুক্তি অনুযায়ী বাংলার মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াও সংখ্যালঘিষ্ঠ হইয়া যায় এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠের স্থানে উন্নীত হয়।

মিন্টো-মর্লি শাসন-সংস্কারের পরে আসিল মন্টেগুচেম্‌সফোর্ড শাসন-সংস্কার। অনেক বাক্‌বিতণ্ডার পর মন্টেগু সাহেব মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচন স্বীকার করেন। লক্ষ্ণৌ-প্যাক্টকে অনুসরণ করিয়া আসন বিভাগের ব্যবস্থা হয়। এইরূপে রাজনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের অধিকার আরও বিস্তৃত হয়। সেই সময়ে বাংলাদেশের মুসলমানদের জন্য শতকরা ৫০টি আসন দাবি করিয়া মরহুম নওয়াব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব খুব যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *মুসলিম বাংলার আত্মকথা।*
১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৩ (১৯৩৬)

মুসলিম জাগরণ

ধর্ম, সমাজ, জাতি, কৃষ্টি বা সাহিত্যের যদি নবজীবন লাভ হয়, তাহা হইলে তাহার অগ্রগতি অনিবার্য—ধ্বংস তাহার হয় না, হইতে পারে না। মুসলিম কালচারের কেবল যে নবজীবন লাভ হইতেছে তাহা নয়, বর্তমান পাশ্চাত্য কালচারের সংস্পর্শে আসিয়া এবং তাহা হইতে নূতন আলোক পাইয়া ইহার সংস্কারও হইতেছে। ইহা স্বাভাবিক, ইহা হইতেই হইবে। পুরাতনকে বাঁচাইবার ইহাই প্রকৃষ্ট পথ।

বাঁচিয়া থাকিতে হইলে জীবনযুদ্ধে মুসলমানকে জয়ী হইতে হইবে। সমগ্র সমাজের ঐক্যের মধ্য দিয়া ইহার জয় আসিবে, অনৈক্যের মধ্য দিয়া নহে—দৃঢ়তার সহিত এ কথা আমরা বাংলার মুসলমানকে সবিনয়ে নিবেদন করিতেছি। সমাজের সাধারণ এবং মহত্তর স্বার্থের নিকট সকলের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বিসর্জন দিতে হইবে। সকল সময় মনে রাখিতে হইবে আমাদের শক্তি মিলনে, বিচ্ছেদে নহে।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *মুসলিম বাংলার আত্মকথা।*
১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৪৩ (১৯৩৬)

www.pathagar.com

মুসলিম লীগ ও এ. কে. ফজলুল হক

মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না স্বজাতির দূর ভবিষ্যতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্যকরূপে অনুভব করিয়া যে ১৪টি দাবি বৃটিশ সরকারের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একটি দাবি ছিল মুছলমান প্রধান প্রদেশগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে। এদিক দিয়া বাংলা ও পাঞ্জাবের উপরই মুছলমান সমাজের বেশি আশা-ভরসা ছিল। কিন্তু বাংলার মৌলবী এ. কে. ফজলুল হক এবং পাঞ্জাবে স্যার ফজলে হোছেন পেরে স্যার সেকেন্দার হায়াৎ খাঁ যে কোন কারণে হউক, তখন মোছলেম লীগের পতাকাতলে সমবেত হইতে সম্মত না হওয়ায় এই দুই প্রদেশে মোছলেম লীগের পূর্ণ প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া এতদিন সম্ভবপর হইয়া ওঠে নাই।

আলোচনা।
১১শ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪ (১৯৩৭)

হিন্দু-মুসলমান বিরোধের কারণ

হিন্দু মুসলমানের বিরোধ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সুপ্রকট হয়ে উঠেছে দেখে তা রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্র-সুনীতিকুমার তিনটি অভিভাষণে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু কি কি কারণে ভাষা ও সাহিত্যের রাজ্যে এই 'গুরুতর সঙ্কট' উপস্থিত হয়েছে, তার কারণ এঁরা কেউ দেখাননি বা দেখাতে সাহসী হননি। এই বিরোধের মূলীভূত কারণ অর্থনৈতিক বৈষম্য। বাংলাদেশের অধিকাংশ ধন-উৎপাদক হচ্ছে চাষী শ্রেণী, এবং উপভোগকারী হচ্ছেন জমিদার, মহাজন প্রভৃতি। অর্থনৈতিক শোচনীয়তার জন্য আজ মুসলমান উদ্ভ্রান্ত। এর কারণসমূহ হান্টার সাহেব তাঁর Indian Mussalman-এ দেখিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক রোয়দাদ (Communal Award)-এ তার অক্ষরে এক নূতন উল্লাসের হিল্লোল বহিতেছে'। বাংলাদেশের মুসলমানদের অবস্থা কুব্জের ন্যায়—একদিকে অর্থনৈতিক সঙ্কট এবং অপরদিকে নিরেট অশিক্ষা এই সম্প্রদায়কে পৃথিবীর মধ্যে নিকৃষ্ট এবং দুঃস্থ সমাজ করে তুলেছে। অর্থনৈতিক বিরোধই আজ নতুন রূপ পরিগ্রহ করে বাঙ্গালি মুসলমান সাহিত্যসেবীদের নিকট উপস্থিত হয়েছে; সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হয়েও সে সর্বত্র অবহেলিত এবং পদদলিত। নিজে পরিশ্রমী এবং বলবান হয়েও পরাশ্রয়ী, নিরস্ত্র এবং নিরন্ন।

জরীন-কলম : *হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ।*
১১শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৪ (১৯৩৭)

বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মেলনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র

কৃষ্ণনগরে এবার বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের একত্রিংশ অধিবেশন হইয়া গেল। এবারকার অধিবেশনের প্রকৃতিও অন্যান্যবারের মতোই অবিকৃত ছিল। সাহিত্য যদিও অসাম্প্রদায়িক ব্যাপার এবং তাই সাহিত্য সম্মেলনের প্রকৃতি যদিও হওয়া উচিত অসাম্প্রদায়িক ধরনের,

www.pathagar.com

কিন্তু এ দেশের মাটির গুণে কি না বলতে পারি না, বাঙ্গালা সাহিত্য বস্তুতঃ বাঙ্গালির সাহিত্য না হইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর সাহিত্য এবং এই জন্য বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন হইয়া পড়িয়াছে প্রধানতঃ বঙ্গীয় হিন্দু সাহিত্য সম্মেলন।

আলোচনা : *বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন।*
১১শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৪ (১৯৩৭)

ধর্মীয় বিতর্ক

আসলে 'প্রবাসী'র একটি মন্তব্যের প্রতিবাদ করিবার জন্যই এই প্রসঙ্গের অবতারণা। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় প্রাচীন ধর্মাবলম্বীদের শাখা ও সম্প্রদায়গত মতভেদের অবতারণা করিয়া বলিতেছেন, 'এমন কি ভিত্তিগত বিষয়েও তাঁহাদের মতভেদ দেখা যায়। খ্রিষ্টীয়, বৌদ্ধ, হিন্দু, জৈন, মোহাম্মদীর প্রভৃতি ধর্ম সম্বন্ধে ইহা সত্য।" এছলামের পূর্বেও জগতে যেসব ধর্মের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। নিজের নাম তাদের কোনটারই নাই। কাজেই কখনও সেই ধর্মের প্রবর্তকগণের এবং কখনও বা তাহার অনুসরণকারীদের নামের সংযোগে ঐসব ধর্মের স্বতন্ত্র পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যেমন খ্রিস্টানধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম, হিন্দুধর্ম ইত্যাদি। প্রবাসী সম্পাদক মহাশয় এই হিসাবে "মোহাম্মদী'র ধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা অসঙ্গত এবং মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসের বিপরীত কথা। মুসলমানরা যে ধর্মের অনুসরণ করেন, তাহার এবং একমাত্র তাহার, একটা নিজস্ব নাম আছে এবং কোরআনেই সে নাম প্রথম হইতে স্ব-নির্ধারিত হইয়া আছে। সে নাম এছলাম। 'মোহামেডানিজম্' কথাটা খ্রিস্টানজগতের অন্যায় আবিষ্কার।

আলোচনা : *মোহাম্মদীর ধর্ম।*
১০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৪ (১৯৩৭)

কামাল আতাতুর্ক : মৃত্যুশোক (১৮৮১-১৯৩৮)

১০ই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার—তুরস্কের তথা বীর প্রসবিনী বসুন্ধরার এক মহাদুর্দিন। অন্ধকার রাত্রির বুক চিরে নবারুণ যখন দিনের সূচনায় ব্যস্ত, সদ্য জাগ্রত মানুষ যখন হাস্যময়ী ধরার দিকে চেয়ে সব জড়তাকে অবহেলায় ত্যাগ করে, নতুন উৎসাহে, বিপুল উদ্যমে দৈনন্দিন কর্মের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়তে উদ্যত, সেই অপূর্ব আনন্দক্ষণে নবীন তুরস্কের রাষ্ট্রগগন সহসা একখানা ঘন কৃষ্ণমেঘে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ল। সুন্দর, স্বচ্ছ আকাশ হতে অকস্মাৎ একটি বজ্রপাত হয়ে তুরস্কের সর্বোচ্চ স্তম্ভকে নিমেষে ধূলিসাৎ করে দিল। বিমূঢ়, স্তম্ভিত তুরস্ক বুঝতে পারল না, ভাবতে পারল না কার পাপে, কার অভিশাপে আজিকার এ বিপদ। এক যুগের ক্ষয়কে পূরণ করে, এক যুগের কুসংস্কারকে চূর্ণ করে যে বীর চলে গেল,

www.pathagar.com

তাঁর মৃত্যু-সংবাদে শুধু তুরস্ক নয়, সমগ্র মুসলিম জাহান, সমগ্র বিশ্ব ক্ষণিকের জন্য স্তব্ধ, অবাক হয়ে রইল।

মোহাম্মদ শামসুল আনাম খাঁ : *কামাল আতাতুর্ক।*

১২শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৫ (১৯৩৮)

নারীহরণ

নারীহরণ ও নারী ধর্ষণ অতি জঘন্য মহাপাতক। এই মহাপাতকের অনুষ্ঠানকারীদিগের জন্য সর্বাপেক্ষা কঠোর দণ্ডের নির্দেশ কোরআনে দেওয়া হইয়াছে এবং সম্মতি-অসম্মতি, সাবালেগ-নাবালেগ প্রভৃতি বলিয়া কোনও প্রকার পার্থক্যই সে ব্যবস্থায় করা হয় নাই। কিন্তু অপরাধীর জন্য এইরূপ কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা দিয়াই কোরআন নিরস্ত থাকে নাই—এই জঘন্য মহাপাতকের প্রকৃত কারণ-উপকরণগুলির প্রাদুর্ভাব হইতে সমাজ জীবন যাহাতে যথাসম্ভব মুক্ত হইয়া থাকিতে পারে, তাহার সসঙ্গত ও স্বাভাবিক নির্দেশও কোরআন ও হাদিস সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করিয়াছে। সংক্ষেপে, এই আদেশ-নির্দেশের সারমর্ম এই যে, এছলাম যেমন নারীর অবরোধনীতির সমর্থন করে না, নারী স্বাধীনতার নামে সমাজজীবনে উচ্ছৃঙ্খলতার সৃষ্টি করিতেও এছলাম কখনই প্রস্তুত নহে। যে কারণে হউক স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার মধ্যে সীমারেখা রচনা করার ক্ষমতায় হিন্দু সমাজের একটি স্তর আজ সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত হইয়া পড়িয়াছে এবং সেইটাই হইতেছে তাহার উচ্চ স্তর। মুসলমান সমাজের একটি দলও নিজকে উন্নতিশীল ও প্রগতিপরায়ণ বলিয়া পরিচিত করার জন্য অতিমাত্রায় ব্যগ্র। হিন্দু-সমাজের উন্নতির মূলে যে সাধনা ও তপস্যা আছে, তাহার প্রতি উপেক্ষা করিয়া এই দল মনে করেন যে, উচ্ছৃঙ্খলতা ও সমাজ-জীবনের ব্যভিচারটাই তাঁহাদের উন্নতির মূল নিদান। কাজেই উদারমনা প্রগতিশীল ও আধুনিক বিশেষণ লাভ করার জন্য এই দলের ভদ্রলোকেরা অন্য সমাজের আধিব্যাধির জীবাণুগুলিকে বরণ করিয়া চলিয়াছেন। এই সব অনাচারের কুফলও সমাজ-জীবনে যথেষ্ট পরিমাণে আমদানি হইতে আরম্ভ হইয়াছে এবং মুছলমান সমাজও তার স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হইতে রক্ষা পায় নাই।

আলোচনা।

১২শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৫ (১৯৩৮)

শিল্পী জয়নাল আবেদীন

শিল্পী জয়নাল আবেদীন 'ব্রহ্মপুত্রের তীর' চিত্রে একটা নব্য-প্রথাকে স্বীকার করে অগ্রসর হয়েছেন—যাতে মোগলাই বা প্রাচীন ভারতের দোহাই নেই। তা সম্পূর্ণভাবে আধুনিক ও আন্তর্জাতিক ব্রহ্মপুত্রের নানা ছবি এঁকে এই শিল্পী প্রশংসিত হয়েছেন। এই চিত্রখানিও

www.pathagar.com

চমৎকার হয়েছে। শিল্পীর "খেয়া" আর একখানি গ্রাম্য নদীর চিত্র। এ ছবিতে নৌকা, বঙ্কিম তীর ও গ্রাম্য পথিকদের চিত্র একটা চমৎকার অবস্থা সৃষ্টি করেছে। নদীটির বঙ্কিম আবর্ত দূরে একটি গভীর আবর্ত সৃষ্টি করেছে। বাঙ্গালার নদীর একটা রমণীয় রূপ ধরা পড়েছে এই সুন্দর চিত্রে। মনে হয় যেন সত্যিকার খেয়াঘাটটির একটা দৃশ্য চোখের সামনে পড়েছে। রসবিস্তার প্রসঙ্গে এ শ্রেণীর চিত্র অতি কার্যকরী –অতি সহজেই এ রকমের ছবি সমজদারদের চিত্তবিনোদন করে।

যামিনীকান্ত সেন : *আধুনিক ভারতের মুসলমান চিত্রকলা।*

১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫ (১৯৩৮)

মুসলিম সমাজের রসবোধ : চিত্রকলা

মুসলিম শিল্পীরা এমনিভাবে জগতের বিরাট রসক্ষেত্রে এসে পড়েছেন—শুধু মুসলমান ইতিহাস, ঘটনা বা বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করে কোন সঙ্কীর্ণ আবহাওয়াকে জয়যুক্ত করেন নি। বস্তুতঃ জগতের বিরাট রসস্রোতের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করতে না পারলে শিল্প ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতর নিজকে দুর্বল ও প্রাণহীন করে তোলে। মানুষের আত্মার কোন ক্ষুদ্র দেশ কালের পরিধি নেই। আত্মার বিশ্বব্যাপী স্ফূরণের প্রেরণাকে সঙ্কীর্ণ করলে কল্পনা ও সৃষ্টিশক্তিকে আঘাত করা হয়। এজন্য নব্য মুসলিম শিল্পীরা প্রাচীনতার কূপে নিজেদের মজ্জিত করে আশ্বস্ত হননি—বিরাট জগতের রসশ্রীর সহিত সামাজিকতা স্থাপনে অগ্রসর হয়েছেন। রম্যকলা পরিষদের প্রদর্শনীতে উপস্থাপিত চিত্রগুলি দেখলে বারবার এ কথা মনে হয়। বস্তুতঃ মুসলমান সমাজের সূক্ষ্ম রসবোধ এরূপ সৃষ্টির ভিতর প্রসার লাভ করলে তা জাতীয় সম্পদরূপে পরিগণিত হবে।

যামিনীকান্ত সেন : *আধুনিক ভারতের মুসলমান চিত্রকলা।*

১১শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৫ (১৯৩৮)

জলধর সেন : মৃত্যু শোক

বাঙ্গালার প্রবীণ সাহিত্যিক জলধর সেন মহাশয় ৯ই এপ্রিল (১৯৩৯) বেলা তিন ঘটিকার সময় তাঁহার বাগবাজারস্থ ভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৮০ বৎসর হইয়াছিল। ইদানীং তাঁহার স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। গত কিছুদিন যাবৎ তিনি পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন।

প্রাচীন বাংলা চরিত্রে যে সরলতা, আন্তরিকতা ও সহৃদয়তা ছিল, জলধর বাবুর চরিত্রে সেই খাঁটি বাঙ্গালিয়ানা বজায় ছিল।

সাময়িকী : *প্রবীণ সাহিত্যিকের মৃত্যু।*

১২শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

www.pathagar.com

হিন্দু সংস্কৃতি ও মুসলমান

এই প্রসঙ্গে হিন্দুদের প্রতি বঙ্গীয় মুসলমানদের একটি অভিযোগের কথাও মনে পড়ে। সম্প্রতি বাঙ্গালার মুসলমান সন্দেহ করিতেছেন, এদেশের হিন্দুগণ মুসলিম সংস্কৃতির সর্বনাশ সাধনের জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যকে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছেন এবং স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙ্গালা শিক্ষার ভিতর দিয়া সেই আদর্শ ও ভাবকে মুসলমানদের মধ্যে প্রচার করিয়া মুসলমানদের সংস্কৃতিগত ভিত্তির সর্বনাশ সাধন করিতেছেন। আমি এ সন্দেহকে সম্পূর্ণ হউক বা না হউক, আংশিক অমূলক বলিয়া মনে করি। কিন্তু আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে হিন্দু আদর্শ ও ভাবে পূর্ণ, সে কথা আমি মোটেই অস্বীকার করি না। হিন্দু "হরিনাম" না করিয়া "কালিমা" উচ্চারণ করিবেন, এমন চিন্তা করা শুধু অশোভন নহে, বরং একান্তই অস্বাভাবিক। আমরা যখন এরূপ অভিযোগ উত্থাপন করি, তখন ভুলিয়া যাই যে, আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য যে-সকল প্রতিভাবান হিন্দুর দ্বারা গড়িয়া উঠিয়াছে তাঁহাদের ধর্ম ও সংস্কৃতিগত ছাপ—তাঁহাদের রচিত সাহিত্যে থাকিবেই। কেননা তাঁহারা স্বীয় ধর্মীয় ও সংস্কৃতির গণ্ডী ছাড়াইয়া সাহিত্য রচনা করেন নাই—পৃথিবীর কোন সাহিত্যিক আজ পর্যন্ত তাহা করিতে পারেন নাই। আমার বিশ্বাস, হিন্দুরা জোর করিয়া তাহাদের আদর্শ ও ভাবকে আমাদের স্কন্ধে যতটা চাপাইতেছেন না, আমরা তাঁহাদের প্রতিভাবান সাহিত্যিকদের সৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞাতসারে ততোধিক আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদের আর্দশ ও ভাবকে বরণ করিয়া লইতেছি।

আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ : *মূল সভাপতির ভাষণ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন)।*
১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

অসাম্প্রদায়িক চেতনা

কুমিল্লার 'বন্দেমাতরম্' নিয়ে গোলমালের পর আমার মনে হচ্ছে, আমাদের একটি স্থায়ী নিখিল-বঙ্গ সাহিত্যি-প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে প্রতিষ্ঠানটির নাম অসাম্প্রদায়িক হওয়া বোধ হয় যুক্তিযুক্ত। কারণ সাহিত্যে সাম্প্রদায়িক ব্যাপার নয়—এটা সত্য কথাই। তারপর যেসব সাহিত্যিক 'বন্দেমাতরম'কে জাতীয় সঙ্গীত বলিয়া স্বীকার করেন না—অন্ততঃ তাকে সাহিত্যক্ষেত্রে টেনে আনবার পক্ষপাতী নন, সেই সব অমুসলমান সাহিত্যিকদের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের দ্বার খোলা থাকা চাই। আমাদের দ্বারা একটি অভিধান সঙ্কলন হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। ভারতচন্দ্র থেকে আরম্ভ করে, বিশেষ করে সত্যেন দত্ত, মোহিতলাল, নজরুল ইসলাম, বিনয় সরকার প্রভৃতি অনেকেই অসংখ্য আরবি, ফারসি, ও উর্দু শব্দ বাংলা সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন; ভবিষ্যতেও মুসলমান সমাজে প্রচলিত বহু বিদেশী শব্দ আমাদের সাহিত্যে স্থান পাবে। কিন্তু অধিকাংশ শব্দই এখনো প্রচলিত কোন অভিধানে স্থান পায়নি। ইহাতে পাঠকের প্রতি, বিশেষ করে হিন্দু পাঠকদের প্রতি, অত্যন্ত অবিচার করা হচ্ছে। যদি সাহিত্যে তথাকথিত মুসলমানী শব্দ

www.pathagar.com

ব্যবহারের যৌক্তিকতা আমরা স্বীকার করি, তাহলে তার অর্থোদ্ধারের সুবিধার দাবি করার ষোল আনা অধিকার পাঠকদের রয়েছে।

চিন্তাধারা।

আবুল ফজল : *নিখিল-বঙ্গ সাহিত্য-প্রতিষ্ঠান*

১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

মুসলিম সমাজে নারীর অগ্রগতি

আমাদের সমাজের নারী-রচিত সাহিত্য এখনো অত্যন্ত নগণ্য। ইহার কারণ তাঁহাদের শিক্ষার অভাব, একথা উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু এখানে আর একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্যযোগ্য। গত বিশ বছরের মধ্যে মুসলিম নারী-জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আসিয়াছে। বিশ বছর আগেকার সেই হেরেমের বন্দিনীই আজ শিক্ষায় ও সামাজিক ব্যাপারে প্রতিবেশী সমাজের জাগ্রত নারীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারিতেছেন, চোখে না দেখিলে একথা বিশ্বাস করা কঠিন। হিন্দু সমাজের মেয়েদের চেয়ে অন্ততঃ পঞ্চাশ বৎসর পরে মুসলমান মেয়েদের যাত্রা শুরু হইয়াছে। এই মুক্তিপথযাত্রিনীরা হয়তো এখনো সংখ্যায় কম—কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহারা সর্বত্রই নিজের বিশিষ্ট স্থানটি অধিকার করিয়া নিতেছেন, ইহার পরিচয় অত্যন্ত সুস্পষ্ট। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান মেয়ের আর আজকাল অভাব নাই। ফজিলতুন্নেসা দশ বৎসর আগে উচ্চশিক্ষার জন্য বিলাত গিয়াছিলেন—আজ অন্যরাও সে পথে ধাবিত হইতেছেন। বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান মহিলাদের আসন শূন্য থাকিয়া যাইবে, গোড়ায় অনেকেই ইহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ দেখা যাইতেছে, তাঁহারা শুধু ব্যবস্থাপক সভার সভ্যের আসনই নয়, প্রয়োজন মত সভাপতির আসনও অলঙ্কৃত করিতেছেন।

সামাজিক জীবনেও তাঁহারা কম কৃতিত্বের পরিচয় দিতেছেন না। প্রাথমিক শিক্ষার দিক দিয়া মুসলিম বালিকারা হিন্দু বালিকাদের চেয়েও অগ্রসর। আর সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল—শুধু মুসলমানই নয়, জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে প্রত্যেকটি বাঙ্গালি মেয়ের পক্ষেই তাহা এক পুণ্যতীর্থ বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ : *মহিলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন)।*

১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

নারীর অধিকার

নারীর অধিকার আলোচনা করিতে গেলে দেখা যায়, মুসলমান মেয়েদের এমন অনেকগুলি বিশেষ সুবিধা আছে যাহা অন্য সমাজের মেয়েদের নাই। কি শিক্ষায়, কি সমাজে, কি

www.pathagar.com

আইনগত ব্যাপারে অধিকার তাঁহাদের অপর্যাপ্ত। বর্তমান যুগে তাঁহাদের অত দ্রুত উন্নতির হেতু খুঁজিতে গেলে মনে হয়—ইহার গোড়ায় রহিয়াছে তাঁহাদের সেই অপর্যাপ্ত অধিকার। বাহিরের মিত্যা বন্ধন একবার কাটিতে পারিলেই হইল, তাহার পর তাঁহাদের গতিরোধ করিবার ক্ষমতা কাহারো নাই। সাহিত্যের বেলায়ও মনে হয়, এই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি হইবে। সাহিত্যের দিকে মেয়েদের একটি সাধারণ প্রবণতা এমনিই আছে। তবে যে-কারণেই হোক, ইহারা এখনো সাহিত্যে মনোনিবেশ করেন নাই। কিন্তু তাহার জন্য অধীর হইবার কিছু নাই। বসন্ত জাগিতেছে—ফুলদল বিচিত্র মহিমায় আপনিই হাসিয়া উঠিবে।

বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদ : *মহিলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন)।*

১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

নারীর শিক্ষা ও সামাজিক জীবন

নারীর শিক্ষা ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া আমরা বহু উপলক্ষে বহুবার একটি বিষয় চিন্তা করিয়াছি—তাহা হইল, ভবিষ্যতের শিক্ষিত নারীর জীবন কোন্ কোন্ পথে চলিতে পারে—কি কি হইতে পারে তাঁহাদের উপযোগী Carcer. এই প্রসঙ্গে আমি অনেকবার সাহিত্যিক জীবনের এবং সাংবাদিক জীবনের (Journalism) উল্লেখ করিয়াছি। বাহিরের জগতের কোলাহল হইতে দূরেও নারী নিভৃতে পুস্তক রচনা, পত্রিকা পরিচালনা, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতি কাজের মধ্যে জীবনের সার্থকতা খুঁজিয়া পাইতে পারে। সাধনা করিতে পারিলে অর্থোপার্জনের দিক দিয়াও এই পথ নারীর জন্য বিশেষভাবে উপযোগী হইবে বলিয়া মনে হয়।

বেগম শামসুন্ নাহার মাহমুদ : *মহিলা সাহিত্য শাখার সভানেত্রীর অভিভাষণ (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন)।*

১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি

রাজনৈতিক দৃষ্টিতেও সঙ্গীতের বিশিষ্ট মর্যাদা আছে। আজ সারা ভারতে হিন্দু-মুসলমানে দ্বন্দ্ব ও সংগ্রাম চলেছে। উভয়ের মিলন ও সম্প্রীতির জন্য নেতৃবৃন্দের চোখে ঘুম নাই। বাহিরের এই হানাহানির মধ্যেও সঙ্গীতের নীরব প্রকোষ্ঠে কিন্তু হিন্দু-মুসলমান একই আসনে পাশাপাশি বসে গলাগলি ধরে আছে। মুসলমান ওস্তাদের চরণতলে বসে হিন্দু সুরের সাধনা করছে, তার দানকে সে অম্লান বদনে স্বীকার করছে। নবাব-সুবা বা রাজা-মহারাজার দরবারে হিন্দু-মুসলমান ওস্তাদ সমানভাবে সমাদর লাভ করেছে।

গোলাম মোস্তফা : *জলসা-অধিনায়কের অভিভাষণ* (বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলন)।

১২শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

www.pathagar.com

সিরাজউদ্দৌলা স্মৃতি : উৎসব

আমাদের কাছে সিরাজউদ্দৌলার tragedy-র বিশেষত্ব এই যে, তাঁর ভাগ্যের সঙ্গে আমাদের ভাগ্যও মিশেছে—সিরাজউদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতবর্ষেরই পতন। সিরাজউদ্দৌলার পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা তথা ভারতবর্ষ স্বাধীনতা হারাতে শুরু করলে, আর স্বাধীনতা হারিয়ে আমরা দিন দিন শ্রীহীন হতে লাগলাম। তাই সিরাজউদ্দৌলা-স্মৃতি-উৎসব আমার কাছে প্রকারান্তরে হারানো স্বাধীনতার জন্য ক্রন্দন-উৎসব। অবশ্য ক্রন্দনই এ-উৎসবের এক মাত্র কথা নয়, এর আনন্দের দিকও রয়েছে; আর তা এই যে, স্বাধীনতার প্রয়োজন আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। একথা স্বীকার না করলে সিরাজউদ্দৌলা-স্মৃতি-উৎসব একটা ভাবপ্রবণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আমরা স্বাধীনতার প্রয়োজন উপলব্ধি করছি, এটা আশা ও আনন্দের কথা। কারণ, কোন জিনিস পাওয়ার আগে তার আবশ্যকতা-বোধ প্রয়োজন, নইলে উদ্যামশীলতা জাগে না—মন অনাবশ্যক কিছুর জন্য সংগ্রাম করতে কুণ্ঠাবোধ করে। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা হারানোর কারণটি কি ভেবে দেখা উচিত; কারণ তাতেই স্বাধীনতা প্রাপ্তি ও রক্ষার রহস্যটি নিহিত থাকার সম্ভাবনা।

স্বাধীনতা হারিয়েছি আমরা জাতীয়াতাবোধের অভাবে—উমিচাঁদ ও মির্জাফরের চক্রান্তে নয়। জাতীয়তাবোধ (অর্থাৎ) দেশ আমাদের, রাজা আমাদের, রাজা যদি মন্দও হয় সে তাঁকে সরিয়ে আমাদের মনোমতো রাজা করবো, এই বোধ যদি দেশবাসীর মধ্যে সজীব থাকত তো কয়েকটা স্বার্থক মানুষের চক্রান্তে সিরাজউদ্দৌলার পতন ঘটত না—দেশবাসী জাতীয়তাবিরোধী চক্রান্তকারীদের শায়েস্তা করতে বদ্ধপরিকর হত। কিন্তু তা যে হয়নি তার কারণ জাতীয়বোধের অভাব। জাতীয়তাবোধের অভাবের দরুনই দেশবাসী সিরাজউদ্দৌলার ভাগ্যকে নিজের ভাগ্য করে নিতে পারলে না।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী : স্বাধীনতা : জাতীয়তা : সাম্প্রদায়িকতা।
১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

সাম্প্রদায়িক সমস্যা

সাম্প্রদায়িক সমস্যার শোচনীয়তা দেখে চিন্তাশীলরা প্রায়ই ঘাবড়িয়ে যান ও মুষড়িয়ে পড়েন। এটা কিন্তু স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়। রোগীর অবস্থা কাহিল দেখে' চিকিৎসক যদি কাঁদতে ও আপসোস করতে শুরু করেন তো মুশকিল। তাঁর কাজ ধীরে সুস্থে রোগ চেনা ও সাবধানে চিকিৎসা করা—তাড়াতাড়ি রোগীকে ভাল করতে চাইলে রোগীর মৃত্যু হবার সম্ভাবনা। রোগী যদি মুমূর্ষু হয়ে থাকে তবু শঙ্কিত হয়ে লাভ নেই, বরং নতুন অভিজ্ঞতার খোরাক পাওয়া গেছে, এই মনে করে ভিতরে উল্লসিত হওয়া উচিত; নইলে চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি অসম্ভব। চিকিৎসাশাস্ত্রের মতো চিন্তা শাস্ত্রেরও উন্নতি হবে না যদি দেশের বা পৃথিবীর শোচনীয়তাকে স্বাগতম না করা যায়। শুনেছি, অস্ত্র চিকিৎসকগণ নাকি অস্ত্রোপচারের উপযুক্ত

www.pathagar.com

রোগী দেখলে আনন্দবোধ করেন। একথা সত্য কিনা জানিনে, তবে সত্য হলেই খুশি হব, কারণ এই আনন্দ নিষ্ঠুরতার আনন্দন নয়, অভিজ্ঞতার আনন্দ—অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগান ও বাড়ানো যাবে বলে এক প্রকার বৈজ্ঞানিকসুলভ উল্লাস। চিন্তাশীলদেরও এই দৃষ্টি গ্রহণ করতে হবে, কারণ তাঁরাও চিকিৎসক, তাঁদের মন তীক্ষ্ণ ছুরিকা আর দেশ একটা মস্ত ফোঁড়া। এই ফোঁড়া যত বড় হবে, পাক্‌বে, ফুলবে, তাই আনন্দের বিষয়, কারণ ততই তাঁদের মন-রূপ-তরিকা ব্যবহার করবার সুবিধা। দেশ বা পৃথিবীর অবস্থা ভালো হয়ে গেলেই বরং খারাপ, কারণ তখন তাঁদের ছুরিকায় মরচে পড়ার সম্ভাবনা।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী : *স্বাধীনতা : জাতীয়তা : সাম্প্রদায়িকতা।*
১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

স্বাধীনতা

স্বাধীনতা পাওয়ার আগে স্বাধীনতা কিসের জন্য—তা লক্ষ্য না উপলক্ষ ভেবে দেখা উচিত। অনেকের কাছে স্বাধীনতা লক্ষ্য হলেও চিন্তাশীলদের কাছে তা উপলক্ষ মাত্র, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের জন্যই তার প্রয়োজন। স্বাধীনতা ব্যতীত অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হলে স্বাধীনতার এত মূল্য থাকত কিনা সন্দেহ। যদি এমন কোন অধীনতা পাওয়া যায় যেখানে জাতির প্রগতি অব্যাহতভাবে চলতে সক্ষম, যেখানে কোন বন্ধনই উপলব্ধি করা যায় না, তবে সেই অধীনতাকে স্বাগত-সম্ভাষণ জানানো উচিত। কারণ তাতে দেশ রক্ষার বালাই থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, অথচ দেশের ক্ষতি হয় না কিছুই। কিন্তু তেমন অধীনতা নেই, তাই স্বাধীনতার প্রয়োজন।

স্বাধীনতা যখন দেশ সৃষ্টির জন্য, হুজুগের জন্য নয়, তখন অধীন অবস্থায় দেশকে যতটুকু সৃষ্টি করা যায় তার চেষ্টা করা উচিত—কেবল ইংরেজকে গালি দিয়ে শক্তিক্ষয় করে লাভ নেই। কিন্তু বর্তমান অবস্থা দেখে মনে হয় হুজুগের আনন্দের জন্যই আমরা আন্দোলন করি, দেশ সৃষ্টির তাগিদে নয়। তার প্রমাণ এই যে আজও দেশের বুকে বিভিন্ন সমাজভুক্ত মানুষের মিলিত হবার মতো একটি common platform-ও তৈরি হল না, অথচ তার প্রয়োজন প্রশ্নাতীত। জাতীয় উৎসব বলে আমাদের কোন উৎসব নেই, সাম্প্রদায়িকগুলিকেই জাতীয় উৎসব বলে প্রচারিত করা হয়—যেন মিথ্যাকে ঢাক পিটিয়ে প্রচার করলেই সত্য হয়ে দেখা দেয়। এই অবস্থা একই সঙ্গে আমাদের প্রতিভা-ও-বিচারহীনতার দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করছে। নব-সৃষ্টির প্রেরণা আমরা উপলব্ধি করিনে, পুরানো জিনিস দিয়েই কোন মতে কাজ চালিয়ে বাপ দাদার নাম বজায় রাখতে চাই। বাপ দাদার নাম হয়তো বজায় থাকে, কিন্তু সেই সঙ্গে আমাদের অপদার্থতা ও সৃজনবুদ্ধিহীনতার দুর্নামও পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়ে।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী : স্বাধীনতা : জাতীয়তা : সাম্প্রদায়িকতা
১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

www.pathagar.com

সাম্প্রদায়িকতা : সামাজিক অশুভ বিষবাষ্প

সাম্প্রদায়িকতার উচ্ছেদ-কামনার পূর্ব্বে সাম্প্রদায়িকতার ত্রুটি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া উচিত। কারণ তা হলেই তাকে ঘৃণা করা সহজ হবে এবং তাকে বর্জন করতে কোন প্রকার দুঃখবোধ হবে না। সাম্প্রদায়িকতার প্রধান ত্রুটি এই যে, তা মিথ্যার প্রশ্রয় দেয় এবং অপদার্থতার আবরণ স্বরূপ কাজ করে। সাম্প্রদায়িকতার যুগে কাণ্ডজ্ঞান ও বিচারপরায়ণতার কোন মূল্য থাকে না, বরং তাদের অধিকাবীদের বিশেষ বিপদে পড়তে হয় ও বেচারীদের 'না ঘরকা না ঘাটকা' হয়ে থাকতে হয়। বিচারপরায়ণ ও কাণ্ডজ্ঞানসম্পন্ন হিন্দু হিন্দুর শত্রু হয়ে দেখা দেয়, আর মুসলমান মুসলমানের দুষমন বলে গণ্য হয়। কারণ বিদ্বেষান্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী সমাজের কুৎসা রটনা করা তাঁদের রুচির বাইরে। অথচ বিচারের চোখে দেখতে গেলে তাঁরাই সমাজের সত্যিকার বন্ধু—অন্যায়ের পথে 'নাই' দিয়ে সমাজের মাথা নষ্ট করতে তাঁরা নারাজ। মোট কথা, সাম্প্রদায়িকতা এক মাতলামির যুগ, ধর্মহীনতার যুগ—যদিও তাতে ধর্মের নামে চেঁচামেচি হয় যথেষ্ট। সাম্প্রদায়িকতা মানুষের মনুষ্যত্বকে হত্যা করে তার ভিতরের সমাজভয়ে লুক্কায়িত নৃশংসতাকে আত্মপ্রকাশ করবার সুবিধা দান করে। এই নৃশংসলোকেরাই প্রাণ নেওয়ার সুযোগের অভাবে প্রাণ দিয়ে অজ্ঞ জনসাধারণের পূজার পাত্র হয়। এ প্রাণদান যে আদিম পাশবিক প্রবৃত্তির তাগিদে, সমাজের খাতিরে নয়, আবরণে, একথা বুঝবার মতো বিশ্লেষণী বুদ্ধি তাদের নেই। তাই বীর পূজায় ও বীর-বন্দনায় গগন-পবন মুখরিত হয়। অথচ মৃতবীরপুঙ্গব হয়তো জীবনে কোন বিপন্ন লোকের সাধারণ উপকারটুকুও করেননি। এই জন্য জনসাধারণের সাবধান হওয়া উচিত—অপাত্রে শ্রদ্ধা নিবেদন করে যাতে আত্মাকে কলুষিত না করা হয়, সেদিকে তাদের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। সাম্প্রদায়িকতার আরেকটি বড় ত্রুটি এই যে তা নেতৃত্বকে অত্যন্ত সস্তা করে দেয়—যে কোন লোক কয়েকটা সস্তা বুলি আউড়িয়ে নেতা হবার সুযোগ লাভ করে এবং প্রতিবেশী সমাজের দুষ্টবুদ্ধি তথা দুর্বলতার সুবিধা গ্রহণ করে স্বসমাজে উত্তেজনা সৃষ্টি করার প্রয়াস পায়। এতে তার কর্মদক্ষতা ও সমাজপ্রীতি জনসাধারণের দৃষ্টিগোচর করার সুবিধা হয় এবং সে ধীরে ধীরে তার উন্নতির সিঁড়ি তৈরি করতে থাকে। এইভাবে সাম্প্রদায়িকতা সমাজের বেশির ভাগ লোককে বোকা বানিয়ে রেখে কতিপয় লোককে তাদের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে খাওয়ার সুবিধা দেয়। জনসাধারণ একটুখানি হুঁশিয়ার হলেই তাদের চালাকী ভোঁতা প্রমাণিত হতে বাধ্য। তবে জনসাধারণের হুঁশিয়ারী জনসাধারণের হাতে নেই, চিন্তাশীলদের হাতে; আর এ ক্ষেত্রে চিন্তাশীলদের কী কর্ত্তব্য তা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু জনসাধারণ চিন্তাশীলদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত না হলে তাঁদের কথা কার্যকরী হওয়ার সম্ভাবনা কম। তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হতে হলে জনসাধারণকে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে : ধর্মের নৈর্ব্যক্তিকতা ও নিঃস্বার্থপরতা বিশেষভাবে চিন্তাশীলদের মধ্যেই দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাঁদের কথায় মনোযোগী হওয়ায় সত্যকার কল্যাণ নিহিত। ধর্মের গোড়ায় যে সত্যনির্ভর ও

www.pathagar.com

মনুষ্যত্বপ্রীতি, বর্ত্তমানে চিন্তাশীলরাই তার একমাত্র বাহন—তাঁরাই নিজের চেয়ে সত্যকে ও মানুষকে অর্থাৎ মানুষের সাধারণ স্বার্থকে বড় করে দেখেন।

মোতাহের হোসেন চৌধুরী : স্বাধীনতা : জাতীয়তা : সাম্প্রদায়িকতা।

১৩শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

নারী নির্যাতন ও নারী রক্ষা

'হিন্দু মিশন' পত্রিকায় (৭ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা) 'নারীরক্ষা-সমস্যা' শীর্ষক একটি প্রন্ধ প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। আমরা ভাবিয়া দিশাহারা হই, মিশন কর্ত্তৃপক্ষ কেমন করিয়া, সমাজ সংস্কার করিবার অজুহাতে নিতান্ত অর্বাচীন, অজ্ঞ, ও অসংযত লেখনীসম্ভূত কুনীতিপূর্ণ প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। তাঁহারা একটুও ভাবিলেন না যে, মানুষ তৈরি করিতে গেলে, তাহার দুর্বলতা ঢাকিয়া সৎকর্মের উৎসাহই দিতে হয়। দুর্বলতার ছাপ তাহাদের হৃদয়ে আঁকিয়া দিলে কি তাহারা কোন দিনও কাপুরুষতা, ক্লীবতা ছাড়াইয়া উঠিতে পারিবে? চতুর্দ্দশ শতাব্দীর অস্পৃশ্যতা ও বর্ণশঙ্কের আন্দোলন হিন্দুকে নিকৃষ্ট দুর্দশার চরমে পৌছাইয়া দেয় নাই কি? আবার এমনি কিছুর সম্মুখীন হইতে হইবে নাকি?

লেখক টিট্‌কারীর সুরে লিখিলেন, "নারীরক্ষা যে আজ আমাদের দেশের একটা সমস্যার বিষয়, সভা সম্মিলনী করে আলোচ্য বিষয়, এটাই এদেশের পুরুষ জাতির পক্ষে একটা মস্তবড় আত্ম-সম্মানের কথা।" ইহাতে লেখক প্রথমেই বলিতে চান যে, বর্ত্তমানেই নারীরক্ষা সমস্যা মাথা তুলিয়াছে; আর, পরের হাত থেকে 'বৌকে রক্ষা' করিবার অক্ষমতার কথা লইয়া সমিতি গঠন মস্তবড় লজ্জার কথা।

অদূরদর্শী লেখকের পক্ষে সমাজ সংস্কারক না সাজিয়া গল্প গুজব লিখিয়া বাহবা নেবার চেষ্টা করাই ভাল। লেখকের জানা উচিৎ ছিল, ঋগেদ রচনার যুগ হইতে অদ্যাপি এই নারীহরণ চলিয়া আসিতেছে। ইহার উপযুক্ত কারণও থাকিতে পারে। বলিতেছি না, "অতএব চলুক"। আমরা দেখিয়াছি, দেবতা, আর্য্য, অনার্য্য, দাস, দস্যু, দানব, অসুর, রাক্ষসেরাও আর্য্য কন্যা হরণ করিতেছে। রাবণ সীতাদেবীকে লইয়া পলায়ন করিলেন। দ্রৌপদী লাঞ্ছিতা হন পতিগণ সম্মুখে, প্রকাশ্য সভায়। উগ্রসেনের রাজরানী যথেচ্ছভাবে ধর্ষিতা হইলেন, ক্রীড়া পর্বতে। বৌদ্ধযুগের পরিব্যাপ্ত ঘৃণিত ব্যভিচারের কথা বিশ্ব-বিশ্রুত, সুতরাং উদাহরণের প্রয়োজন কি? অতএব প্রবন্ধকারের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিৎ ছিল, কেন এই নারীনির্য্যাতন হয়?

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী : চিন্তাধারা "নারীরক্ষা সমিতি" কি নূতন?

১৩শ বর্ষ,৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

www.pathagar.com

চিন্তার স্বাধীনতা

Man if born free, but every where he is in chains—মনীষী রুসোর এই প্রখ্যাত উক্তি আমাদের জীবনে যতটা নির্মম, রূঢ় সত্য—আজিকার বিংশ শতাব্দীর সুবিপুল পরিবর্তনের দিনেও প্রতিফলিত, অনঢ়, অটল পাষাণ-গাত্রে খোদিত লেখার মতো অপরিবর্তিত, তেমন আর কোথাও দেখতে পাওয়া যায় না। সেই জন্যই আমাদের দেশের প্রবঞ্চিত মানুষের লাঞ্ছিত জীবনের মর্মন্তত গ্লানিতে আমাদের জাতীয় জীবন কলঙ্কিত। আমাদের রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের ইতিহাস নিদারুণ ব্যর্থতার ইতিহাস, গরমিল, গোঁজামিল, ফাঁকি, ব্যবধান, অভাব, অভিযোগ, অপমান, অবিচার, অত্যাচার, চোখের জল, আর দীর্ঘশ্বাসের সকরুণ ইতিহাস। আমাদের জীবনের এটুকুই মর্মকথা।

জীবনের চলার পথে এই হতভাগ্যের দল অগত্যা পাপ খাইয়ে নেওয়ার নীতির অনুসরণ করে চলেছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসহায়ের মতো। তা না করে উপায়ও তাদের নেই। কারণ নিজেদের অসহায়ত্ব সম্পর্কে চিন্তা করবার মতো, কথা বলবার মতো সচেতন মন, কল্যাণ-জিজ্ঞাসু মন নিয়ে যাঁরা আমাদের মধ্যে বেঁচে আছেন—দীর্ঘদিনের সুবিধাবাদী বিজাতীয় অভিভাবকত্বে প্রচলিত অশিক্ষা, কুশিক্ষার ভেতর দিয়েও তাঁদের কণ্ঠরোধ, লেখনী নিরোধ করে রেখে দিয়েছে এদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক আইনের নির্মম কঠোর বেড়াজাল: সত্যকথা ভয়ানক স্পষ্টভাবে বলবার ও লিখবার ন্যায়সঙ্গত অধিকার আমাদের নেই। আমরা খাপ খাইয়ে নেওয়ার নীতি, না-গ্রহণ, না-বর্জন নীতি মেনে চলেছি। ব্যতিক্রমে নিষ্করুণ নির্যাতন ও চরম শাস্তিভোগ করছি। সেই জন্যই শুনতে পাওয়া যায় হৃদয়হীন অবিচার আর ব্যর্থতার বিফল আর্তনাদ, না-পাওয়ার মর্মভেদী হাহাকার : শুনতে পাওয়া যায় আমাদের দেশের মাটির রন্ধ্রে, রন্ধ্রে, মাটির মানুষের শিরায় উপশিরায় নিদারুণ বিফলতার মর্মরধ্বনি আর সকরুণ মর্সিয়া গীতির নিষ্ফল ফরিয়াদ।

ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী : *চিন্তাধারা "নারীরক্ষা সমিতি" কি নূতন?*

১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

গান্ধীবাদের বিপক্ষে

মোটা কাপড়, গরুর গাড়ির মহাত্ম্য প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রেল ও মোটর গাড়ি বর্জনের উৎসাহও উপস্থিত করা হলো। শ্রীচৈতন্যের মত পদব্রজে উড়িষ্যার খানিকটা ভ্রমণের অভিনয়ও ভারতের মঞ্চে প্রতিভাত হল। লৌহযুগসুলভী শিষ্যের সংখ্যা ক্রমশই বাড়তে লাগল। ওয়ার্দার চক্র বিজ্ঞানকে শূলে চড়িয়ে চারিদিকে মুক্তভাবে প্রেতনৃত্য শুরু করলো।

অপরদিকে জাপানের ইতিহাসে দেখা গেল বিপরীত অধ্যায়। ভারতবর্ষে যন্ত্রপাতি প্রচলনের পূর্বেই এক সময় অতিবিজ্ঞ উপনিষদের উপদেশকরা বলতে শুরু করেছিলেন

www.pathagar.com

যন্ত্রদানবের কথা। দানব আসবার আগেই এঁদের কল্পনা দানবের 'অত্যাচার'কে প্রত্যক্ষ করে—কাজেই সে দানবকে আমরা আমাদের অনুকূলে আনতে পারিনি। পরে তা আমাদের ঘাড়ে চেপে রক্তশোষণ শুরু করেছিল। জাপান যন্ত্রকে পোষ মানিয়েছে।

সঙ্কলন।

যামিনীকান্ত সেন : *আধুনিকতা, গান্ধীত্ব ও গান্ধীবাদ।*

১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৬ (১৯৩৯)

নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন ও মুসলমান

১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী ফেডারেশন ভারতে স্থাপিত হলে মুসলিমদের কি এবং কতখানি ক্ষতি হবে তা আমাদের শ্রেষ্ঠ নেতা মিঃ মোহাম্মদ আলী জিন্না গত তিন বছর থেকে খুব ভালো করেই বুঝিয়ে আসছেন। আসল কথা, ফেডারেশনই হোক, কি ডমিনিয়ন স্টেটাসই হোক, হুবহু ইউরোপীয়ান ডেমোক্রেসীর নকল করে যদি তা ভারতে প্রতিষ্ঠিত ও প্রচলিত হয়, তা হলে সংখ্যালঘু মুসলিমদের হবে অত্যধিক ক্ষতি, তাদের রাষ্ট্রীয় সত্তা একেবারে ধুয়ে মুছে যাবে এবং তারা হবে মেজরিটি জাতির ক্রীতদাস। তাদের ধর্ম, তাদের কৃষ্টি, তাদের বিশিষ্ট সভ্যতা ও সামাজিক প্রথা মেজরিটির চাপে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আড়াই বছরের মেজরিটি জাতির শাসনের ভিতর দিয়ে বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও মধ্য প্রদেশবাসী মুসলমানরা তা খুবই টের পেয়েছে। তাই মিঃ জিন্না বলছেন, ইউরোপীয় আদর্শের ডেমোক্রেসী ভারতবর্ষে চলতে পারে না। এখানে যা কিছুই চালাতে হবে তা এদেশের নানাজাতি ও ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রেখে স্থির করে নিতে হবে। অতএব ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনটি বদলাতে হবে Lock. Stock and Barrel. অর্থাৎ মুসলমান যাতে নির্বিবাদে নিজের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে ভারতে বাস করতে পারে সংস্কৃত আইনে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

মুসলমানরা বলছেন, স্বাধীন ভারতে তাঁরা স্বাধীন ইসলাম চান। একথার অর্থ এই নয় যে স্বাধীন ভারত কেবল মুসলমানদের জন্যই হবে, আর কারো জন্য হবে না। হবে সকলের জন্যই এবং সকলেরই নিজ নিজ ধর্মাচরণের স্বাধীনতা তাতে থাকবে পূর্ণভাবে। মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ রাজনীতির প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগের কনস্টিটিউশনে প্রথম ও প্রধান শর্তই হলো ভারতের স্বাধীনতা লাভ।

চিন্তাধারা।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন গঠন কি সম্ভব?*

১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪০)

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম মিলিত ভারতের স্বাধীনতা

হিন্দু-মুসলিমের মিলিত ভারতে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব ব্যাপার নয়, খুবই সম্ভব। কিন্তু স্বাধীন হিন্দু ভারতের প্রতিষ্ঠা স্বপ্নবিলাস মাত্র। এই স্বপ্নকে সফল করবার জন্যই হিন্দু ভারতের সর্বত্র বিপুল চেষ্টা ও আয়োজন চলেছে। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা হিন্দু-মুসলিমের মিলনের মধ্য দিয়েই আসতে বাধ্য, এর জন্য হিন্দুর এক পথ আর মুসলমানের অন্য পথ নাই। মিঃ গান্ধি যেভাবে স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা করছেন তাতে হিন্দু ভারতের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতা আসবে, তার প্রথম ও প্রধান নমুনা বাঙলাদেশেই জন্ম নিয়েছে। মিঃ গান্ধি ও তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং আর্যাবর্ত্তের মুণি-ঋষিরা ত্রিপুরীতে করেছেন সুভাষ বাবুকে অপমান, সে অপমান বাঙলারই অপমান ছিল। এবার সুরেন্দ্রনাথের বাঙলাকে গান্ধিজি প্রকাশ্যভাবে অপমান করলেন। আর ভারতীয় ন্যাশনালিজমের প্রথম ও প্রধান উদগাতা ছিলেন বাঙলারই সুরেন্দ্রনাথ।

এক বছরের ভিতরে ভারতের স্বাধীনতা, ভারতবাসীদের করায়ত্ত হবে বলে একবার যেমন গান্ধিজি, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে দেশের সকলকে নাচিয়েছিলেন—হিন্দু-মুসলিম পরস্পরের গলা ধরে সত্যই পরমাত্মীয়র মত নেচেছিল। কিন্তু শেষে কিছুই হলো না, বরং হঠাৎ একদিন হিন্দু-মুসলিমের পরম আরাধনার মিলন-গ্রন্থি ছিন্ন হয়ে দুবছরের ভিতরেই তারা পরস্পরের বিষম শত্রু হয়ে দাঁড়ালো। সে বিষাদের দৃশ্য নানাজাতি অধ্যুষিত এই ভারতবর্ষে আবারও অভিনয় হওয়ার সূচনা হয়েছে। এবার হিন্দু-মুসলমানে নয়, এবার হিন্দুতে হিন্দুতে। অধ্যাপক আবদুস সাদেক সাহেবের সাথে একমত হয়ে আমরা বলব, ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রধান আর্যাবর্তের দিক থেকে দ্রাবিড়ী বাঙলার প্রতি এই হলো প্রথম আক্রমণ। আর্যাবর্ত দ্রাবিড়ী মাদ্রাজকেও একদিন এরূপ আক্রমণ করবে, কারণ আর্যাবর্ত চায় সর্বভারতের কর্তৃত্ব।

চিন্তাধারা।
সৈয়দ এমদাদ আলী : *নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন গঠন কি সম্ভব?*
১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪০)

মুসলমানদের প্রতি গান্ধীর মানসিকতা

কংগ্রেসের সমর্থনকারী বিলাতের Manchester Guardian পত্রিকাও ঠিক এইভাবের কথাই বলেছে। তার মতে মওলানা আবুল কালাম আজাদকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে মিঃ গান্ধী তার অবস্থা দৃঢ় করেছেন। কিন্তু এবার এই সন্ধিক্ষণে প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত ছিল মিঃ গান্ধীর নিজের, তা হ'লে বুঝা যেতো তিনি মুসলমানকে কতটুকু অধিকার দিতে চান আর কি-ই বা দিতে পারেন। এবার তিনি মুসলমানদের অধিনায়কত্বে স্বাধীনতা প্রস্তাব পাশ করাবেন বলে নানা পত্রিকায় সংবাদ বেরিয়েছে। ১৯২৭ সনের মাদ্রাজ কংগ্রেসে মওলানা হস্‌রত মোহানীর স্বাধীনতা রেজুলিউশন পাশ হয়েছিল। আমাদের যতদূর মনে হয় সেবার

www.pathagar.com

কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন ডক্টর আনসারী। কিন্তু মুসলমানের সভাপতিত্বে মুসলমান দ্বারা প্রস্তাবিত স্বাধীনতার রেজুলিউশন গান্ধিজির মনপূত হলো না। তাই তিনি ১৯২৮ সনের কলিকাতা কংগ্রেসে তাঁর বন্ধু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে দিয়ে তা পরিবর্তিত করালেন ডমিনিয়ন স্টেটাসে। কিন্তু ১৯২৯ সনের লাহোর কংগ্রেসে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর অধিনায়কতায় আবার স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হয় এবং ১৯৩১ সনের মার্চ মাসে করাচিতে তা পুনঃ সমর্থিত হয়। আমাদেরও মনে হয়, এই স্বাধীনতার প্রস্তাব আবার মিঃ গান্ধি ডমিনিয়ন স্ট্রেটাসে পরিবর্তিত করবেন। সেবারও পণ্ডিত জওহরলালকে সন্তুষ্ট করবার জন্য স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, এবারও সেই এক কারণেই এ প্রস্তাব উঠছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিকে সন্তুষ্ট রাখা চাই-ই। রাজনীতি ক্ষেত্রেও গান্ধিজি বন্ধু পত্রের জন্য সব কিছু করতে পারেন।

চিন্তাধারা।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন গঠন কি সম্ভব ?*

১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪০)

বাঙলার মুসলমানদের প্রতি

আমরা সসম্মানে বাঙলার মুসলমানদের কাছে নিবেদন করছি, যে তাঁদের বাঙলার বাইরের মুসলমানদের প্রতিও কর্তব্য আছে। বাঙলার মুসলমানদের মনে রাখতে হবে, সমগ্র ভারতে মুসলমানদের জনসংখ্যা যত তার এক তৃতীয়াংশ বাস করেন এই বাঙলায়। বাঙলার মুসলমান যদি একবার মানুষের মত উঠে দাঁড়াতে পারেন, তাহলে ভারতীয় মুসলমানদের কোনো ভয় নেই, তারা নির্ভয়। এসব কথা বলবার প্রয়োজন হলো এ জন্য যে বাঙলার কেহ কেহ অধ্যাপক আবদুস সাদেকের মতো ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যালঘিষ্ঠতা দেখে অত্যন্ত ভয় পেয়ে গেছেন। আমরা তাঁদের বলছি, মুসলমানদের কোনো ভয়ের কারণ নেই। কোটি মুসলমান কম কথা নয়। ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট যদিই বা বর্তমান যুদ্ধের দায়ে পড়ে মেজরিটির প্রতি অনুগ্রহ দেখান তবুও মুসলমানদের ভয় নেই। মুসলমান যদি মরবার সাহস রাখে, তবে তাদের বাঁচবারও অধিকার আছে। যে অধিকার এখন তারা দাবি করছে, তা না পেয়েও কোনো ভয় নেই। নবজাগরণের, নবজীবনের স্বাদ যদি তারা পেয়ে থাকে, তাহলে মেজরিটি কমিউনিটিকেই ভারতের কল্যাণের জন্য মুসলমানদের সাথে সম্মানজনক সন্ধি করতে হবে। তা করতে তারা বাধ্য।

চিন্তাধারা।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন গঠন কি সম্ভব?*

১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪০)

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম অভেদ-ভেদ প্রশ্ন

ভারতবর্ষে একরাষ্ট্রিয় জীবন গঠন সম্পর্কে বহু বিঘ্ন আছে। হিন্দুদের বর্ণবিভাগ তার পরিপন্থী। ধর্ম বিভিন্ন হলেও হিন্দু-মুসলমান মিলন সম্ভব হতো, যদি তাদের পরস্পরের মধ্যে আহার-বিহারে কোনো বাধা না থাকতো। এটি না থাকলেই সমস্ত বৈষম্য দূর হয়ে যেতে পারতো। আর একটা মস্ত বাধা আছে, ভারতের প্রদেশগুলি বিভিন্ন ভাষাভাষী। হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার বিরুদ্ধে মাদ্রাজীদের অভিযান লক্ষ্য করার বিষয়। তথাকার কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট জোর করে তা চালাতে যাওয়াতে দাক্ষিণাত্যের বিপুল জনমত বিরুদ্ধবাদী হতে এবং আন্দোলন করে জেলে যেতেও দ্বিধা করেনি। বাঙলাদেশও তার নিজের দেশীয় উন্নত ভাষা ছেড়ে হিন্দির পোষক হবে না বা হতে পারে না। উর্দু ভাষাভাষী মুসলিমরাও হিন্দির বিপক্ষে, অতএব বেয়নট দিয়ে খুঁচিয়ে হিন্দি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা বিফল হবে। বরং ইংরাজিকে রাষ্ট্র ভাষার পদে প্রতিষ্ঠিত রাখলে এ বিবাদ মিটে যেতে পারে।

হিন্দু-মুসলিমদের সামাজিক জীবনের বিষমতা এখন রাষ্ট্রে প্রতিফলিত হতে আরম্ভ করেছে। তবে এ কথাও সত্য যে যতদিন বাঙলার বর্ণহিন্দু, আর্যাবর্তের তলপীধারী না হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত বাঙলার হিন্দু ও মুসলিমে ধর্ম নিয়ে কোনো লাঠালাঠি হয়নি, একে অপরের ধর্মকে মেনেই চলেছে। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে ধর্ম নিয়ে ভেদবুদ্ধি সৃষ্টি করে যান পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ১৯২৬ সনে বড়বাজারের মাড়ওয়ারীদের মধ্যে দীর্ঘ একমাস কাল বাস করে। তিনি চলে যাওয়ার পরেই কলিকাতাবাসী আর্যাবর্তের হিন্দুরা মেতে গেল মসজিদের সম্মুখ দিয়ে ধর্মের নামে বাজনা বাজিয়ে যেতে, নিজেদের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য। বাঙলা হিন্দু এর স্রষ্টা, কিন্তু বাঙালি হিন্দুও এতে কম মাতেনি। এখনও তার জের চলেছে বাঙলার বহু স্থানে। এমনকি ছাত্র ও শিক্ষকদের সমবায়ে স্কুল কলেজেও এ বিবাদ এখনও চলছে। এর অবসান যে কবে হবে কে জানে?

চিন্তাধারা।
সৈয়দ এমদাদ আলী : *নিখিল ভারতীয় ফেডারেশন গঠন কি সম্ভব?*
১৩শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৭ (১৯৪০)

শিক্ষা ক্ষেত্রে ভাষা সংকট

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে পারসি রাজভাষার গৌরবান্বিত আসন হইতে অপসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয়, বিশেষভাবে বাঙ্গালি মুসলমানদের শিক্ষা ব্যাপারে এমন এক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার সুমীমাংসা আজ পর্যন্তও হইল না। এদেশে ইংরেজি রাজভাষার সম্মান লাভ করিবার পূর্বে ভারতীয় মুসলমানগণের পক্ষে পণ্ডিত হইবার জন্য মাতৃভাষা ব্যতীত, শিক্ষণীয় ছিল দরবারী ভাষা পারসি এবং শাস্ত্রের ভাষা আরবি : সাধারণ শিক্ষণীয় ভাষার সংখ্যা ছিল তিন। ভারতের বাহিরে, পশ্চিম, পশ্চিম-উত্তর ও মধ্য এশিয়ার ব্যাপার আরও সহজ ছিল।

www.pathagar.com

ইংরেজি ভাষার প্রভুত্ব স্থাপনের পর হইতে উর্দ্দুভাষী মুসলমানের মাতৃভাষা, পারসি, আরবি ও ইংরেজি শিখিলে ভালরূপে চলে; কিন্তু বাঙালি মুসলমানের শিখিতে হয় মাতৃভাষা বাঙলা, ভারতীয় মুসলমানের সাধারণ ভাষা ও বর্তমান ভারতের ইসলামি সাহিত্যের ভাষা উর্দ্দু, মধ্যযুগের ভারতীয় মুসলমান সভ্যতার বাহন সাহিত্য সমাজে অতুলনীয় ভাষা পারসি, মুসলিম-জগতের ধর্মের ভাষা আরবি এবং রাজভাষা ইংরেজি। বিভিন্ন দেশের পাঁচটি ভাষা শিক্ষা করা সহজ ব্যাপার নয়। প্রত্যেক উচ্চশিক্ষিত মুসলমানের বিদ্যার পরিপূর্ণতার জন্য এই পাঁচটি ভাষা শিখিয়া ভাষাতত্ত্ববিদ হইতে হয়। বাঙালি মুসলমানের ভাগ্য এমনই মন্দ যে মাতৃভাষাটাও অধিকাংশের পক্ষে প্রায় অন্যান্য ভাষার মতই ইস্কুলে-মাদ্রাসায় কষ্ট ও পরিশ্রম করিয়া শিখিয়া লইতে হয়।

বাঙলা সাহিত্য প্রথমদিকে মুসলমান রাজা বাদশা ও আমীর-ওমরাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়িয়া উঠিলেও মুসলমানদের ভাগ্য বিপর্যয়ের পরে শিক্ষার দিক হইতে তাহারা পিছাইয়া পড়িলে হিন্দু সংস্কৃতি ও পণ্ডিতিয়ানার প্রভাবে পড়িয়া মুখ্যতঃ হিন্দু কৃষ্টিমূলক ও সংস্কৃত শব্দবহুল হইয়া পড়িয়াছে। এখনও মুসলমান ছাত্র পরীক্ষার খাতায় আল্লাহ্, পানি, ফুফু, খালা প্রভৃতি শব্দের পরিবর্তে ঈশ্বর, জল, পিসী, মাসী ইত্যাদি লিখিতে বাধ্য হয়। এটা প্রবলের নিকট দুর্বলের দীনতা। শিক্ষিত হিন্দু তাহার কৃষ্টির বোঝা মুসলমানের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়াছে। ইহার কারণ ন্যায্য হউক অন্যায় হউক, স্বাভাবিক হউক অস্বাভাবিক হউক—মুসলমানের নিকট ইহার ফল হইয়াছে বিষময়। মুসলমান বাঙলা আলোচনা করিতে যাইয়া—যাহা সে নিজে ভাবিতে শিখিয়াছে তাহার বিশেষ কিছুই পায় না, উপরন্তু তাহার বাড়িতেও নিজ সমাজে অর্জিত ও সর্বদা ব্যবহৃত শব্দের সংস্কৃত প্রতিশব্দ ও সংস্কৃত ব্যাকরণের একটি বিরাট অংশ আয়ত্ত করিতে যাইয়া যে তাহাকে পদে পদে বিব্রত হইতে হয় তাহাতে কোন ভুল নাই।

এদেশের মুসলমানদের মস্তিষ্কের উপর এই বহুভাষা-অর্জনের গুরুভার চাপানোর জন্য তাহাদের কোনদিকেই মাথা খুলিতে পারিতেছে না। এরূপ অসঙ্গত, অস্বাভাবিক, অন্যায় ও ভীষণ ক্ষতিকর ব্যাপার দুনিয়ার আর কোন দেশে আছে বলিয়া জানি না। বর্তমান যুগে উচ্চশিক্ষিত হইতে হইলে বিশ্বকৃষ্টির ভাষা জরমান, ফরাসি ও ইংরেজির যেকোন একটি না জানিলে শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে। মাতৃভাষা ভালরূপে না জানা এক অস্বাভাবিক ও লজ্জাজনক ব্যাপার।

চিন্তাধারা।
অধ্যাপক গোলাম মকসুদ হিলালী এম. এ., বি. এল. : *মুসলমানী শিক্ষাবিভ্রাট।*
১৩শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭ (১৯৪০)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রেক্ষাপট : মুসলিম সমাজ ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

সারা পৃথিবী আজ মহাযুদ্ধের কাল-ছায়ায় আচ্ছন্ন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় ইংলন্ডের সমস্ত রাজনৈতিক দল বিভেদ ভুলিয়া মন্ত্রীসভা গঠন করিয়া দেশরক্ষার আপ্রাণ

www.pathagar.com

চেষ্টা করিতেছে। ভারতও আজ আসন্ন বিপদের সম্মুখীন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখনও আমাদের অন্তর্বিবাদের অবসান হইল না। হিন্দু-মুসলমানের স্বার্থ-সমস্যা জাতির স্বাধীনতা লাভে প্রধান বাধা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই বিপদের দিনে সমগ্র জাতির শ্রদ্ধাভাজন নেতা খুঁজিতে গিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হইতেছে। মনে হয়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বাঁচিয়া থাকিলে এ সমস্যা এমন তীব্র হইয়া উঠিত না। হিন্দু-মুসলমানের সম-বিশ্বাসভাজন এই মহাপ্রাণ নেতার অকাল-প্রয়াণে দেশ যে কি পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, সকলেই তাহা মনে মনে অনুভব করিতেছে।

বাঙলাদেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে আজ যাঁহারা নেতৃত্ব করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকেই এক সময়ে দেশবন্ধুর সহচর ছিলেন। কংগ্রেস, লীগ এবং অনুন্নত জাতির সংঘর্ষে বাংলার রাজনীতি তখনও এমন বিষময় হয় নাই। বিধানচন্দ্র রায়, কিরণ শঙ্কর রায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খান, মিঃ শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মিঃ ডি. রায়কত, শরৎচন্দ্র বসু, সুভাষচন্দ্র বসু প্রভৃতি সকলেই দেশবন্ধুর নেতৃত্বে দেশের মুক্তি সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। দেশবন্ধুর রাজনীতি শুষ্ক চালবাজির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। বুদ্ধির সহিত হৃদয়ের অপূর্ব সংযোগ ছিল যা তাঁহার ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে সকলেই নিকটে যেতেন। তাঁহার মহৎ হৃদয়ে হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্মণ, ধনী-দরিদ্র, বৃহৎ-ক্ষুদ্র সকলেরই স্থান ছিল। দেশবন্ধু ছিলেন মুক্তির পাগল—দেশের জন্য, দুঃখিত অত্যাচারিত মানবের জন্য তাঁহার জীবন বিলাইয়া দিয়াছিলেন। নিজে সমস্ত দুঃখের ভাগি হইয়া নিন্দাগ্লানির বিষপান করিয়া তিনি যে শক্তি দলবদ্ধতার ভিতব দিয়া ভারতের রাজনীতিতে সঞ্চার করিলেন, সেই শক্তির ভাগাভাগি লইয়াই তাঁহার অনুচরগণের মধ্যে আজ এই বিরোধ সৃষ্টি হইয়াছে, দেশবন্ধুর সাধনা এখনও সফল হয নাই—কিন্তু শ্মশানেই কুকুরের মত কাড়াকাড়ি লইয়া সকলে ব্যস্ত হইয়াছে। পূর্ণ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা আর কাহাকেও উন্মত্ত করে না। অপূর্ণেই ছোট প্রাণ ভরিয়া গিয়াছে।

তাই এ অন্তহীন বিরোধ, তাই এ গোলমাল। দেশের সত্যিকার শত্রুর সহিত যুদ্ধ নাই- যুদ্ধ নিজেদের মধ্যে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে যে, বড় কথা ভাবিবার অবসর নাই। শঙ্কা, দ্বিধা, অবিশ্বাস আমাদের রাজনীতিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

হিন্দু সমাজের চরম বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি নবজাগ্রত বাংলার মুসলমান সমাজকে স্বরাজ হইলে তাহার প্রাপ্য কি হইবে তাহা একটি সুচিন্তিত প্যাক্টের দ্বারা বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন। কোনও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া তিনি ইহা করেন নাই। ন্যায় এবং যুক্তির, মানবতা এবং সততার দিক দিয়াই তিনি এই প্যাক্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তাই তাঁহার পার্শ্বে বাংলার মুছলমান সমাজ স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু এই মহাপুরুষের অন্তর্ধানের পর হইতেই তাঁহার রাজনৈতিক উত্তরাধিকারীগণ, সে-প্যাক্টের পিণ্ড প্রদান করিলেন। সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণ কবরে সে মিলন-পরিকল্পনা প্রোথিত হইল। হিন্দুর সাম্প্রদায়িকতা মুসলমানকে ততোধিক সাম্প্রদায়িক করিয়া তুলিল। সত্য বটে সকলেই এই কু-কার্যে সায় দেয নাই। দেশবন্ধুর যোগ্য শিষ্য দেশপ্রিয

www.pathagar.com

যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের চরিত্র-মাধুর্য এবং উদারতায় উভয় সম্প্রদায়ের মিলনের আশা তখনও লোপ পায় নাই। কিন্তু দেশপ্রিয়ের তিরোধানের পর বাংলায় যেদিন কংগ্রেস জাতীয় দলের সৃষ্টি হইল, সেদিন হইতে সাম্প্রদায়িকতা আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে হিন্দুসভা ও মোছলেম লীগ বাংলাকে দ্বিধাবিভক্ত করিতে লাগিল।

হেমন্তকুমার সরকার : দেশবন্ধু ও মুসলমান
১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৭ (১৯৪০)

ভারত বিভাগ পরিকল্পনা ও মুসলমান

পাকিস্তান স্কীম বা রাজনৈতিক ভিত্তিতে ভারত বিভাগ পরিকল্পনা মোসলেম লীগের গত লাহোর অধিবেশনে সরকারিভাবে গৃহীত হইয়াছে। ইহার পূর্বেও এই পরিকল্পনা বিজ্ঞজনের চিন্তাধারার অন্তর্গত ছিল, কিন্তু নিখিলভারত মোসলেম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ইহাকে রূপদান করা হইয়াছে গত লাহোর অধিবেশনে।

'পাকিস্তান' কথাটির শব্দগত অর্থ 'পাক'-এর দেশ। 'পাক' অর্থে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন— কাজেই 'পাক'-এর দেশ অর্থে পবিত্র ভূমি। উত্তর-পশ্চিম ভারতস্থিত পাঁচটি অঞ্চলের সমষ্টির প্রতি পূর্বে এই নাম প্রযুক্ত হইত। ঐ পাঁচটি অঞ্চল হইতেছে পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু ও বেলুচিস্তান। এই পাঁচটি নামের অঙ্গীভূত অক্ষরসমূহ দ্বারা 'পাকিস্তান' শব্দটি বিরচিত। ১৯৩৩ ইংরাজি সনে অর্থাৎ সাত বৎসর পূর্বে মিঃ সি. রহমত আলী কর্তৃক এই স্কীম অনুমোদিত হয়।

প্রথমতঃ 'জনৈক পাঞ্জাবী' লিখিত Confederacy of India' পুস্তকে স্কীমটি জনসমক্ষে প্রদর্শিত হয়। ঐ স্কীম আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদ্বয় সৈয়দ জাফরুল হাসান ও মোহাম্মদ আফজল হোসেন কাদরি কর্তৃক পরিকল্পিত 'আলীগড় স্কীমের' সঙ্গে, অনুল্লেখযোগ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র পার্থক্য ব্যতীত, প্রায় অভিন্ন বলা চলে। তৃতীয় পরিকল্পনা আনয়ন করেন ডাঃ এস. এ. লতিফ। তাঁহার মতে, তাঁহার এই পরিকল্পনা শুধু ভারতবিভাগেরই উপকরণ নহে, উহা স্বাভাবিক ভিত্তিতে ঐক্য প্রতিষ্ঠারই উপাদান। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী স্যার সেকেন্দর হায়াৎ খানও একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেন। তাঁহার পরিকল্পনায় ফেডারেশনের অপরিহার্যতার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে—ইহা ভিন্ন উহাতে অপর কোন বিষয়েই নূতনত্ব নাই।

প্রথমোক্ত পরিকল্পনায় মোসলেম অঞ্চলে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রীভাব বজায় রাখিয়া পৃথক মোসলেম রাষ্ট্র স্থাপনের জন্য, এবং উহাতে হিন্দুগণের মৈত্রীর অস্বীকৃতি প্রকাশ পাইলে মুসলমানগণকে হিন্দুগণের সহিত সম্পর্করহিত হইয়াই চলিবার জন্য বলা হয়। স্কীম-প্রণেতা লিখিয়াছেন—'হিন্দুভারত হইতে, আমাদের সকলকে পৃথক করাতেই এই

www.pathagar.com

পরিকল্পনার সকল দায়িত্ব শেষ হইবে না, একটি আদর্শ মোসলেম রাষ্ট্র স্থাপনার ইহা হইবে উপায় বা পথ। ... এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা হইবে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভেরও উপায়।

ভারত বিভাগ পরিকল্পনা

১৩শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৪৭ (১৯৪০)

হিন্দু-মুসলিম সমস্যার গোড়ার কথা

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রধান অন্তরায় হিন্দু-মোসলেম অনৈক্য, ইহা বোধ হয় সুধীজনমাত্রই স্বীকার করিবেন। এই সমস্যা ভারতবর্ষে নিতান্ত নূতন নহে, যদিও দুই বৎসর পূর্বে পণ্ডিত জওহরলাল পর্যন্ত ইহার অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। আজকাল এই সমস্যা একটা বিকট এবং বীভৎস মূর্ত্তিতে সকলের সম্মুখেই বিদ্যমান হইয়াছে, ইহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর কাহারো কোন সন্দেহ নাই। এই সমস্যার কোন উপযুক্ত সমাধান করা সম্ভবপর কিনা রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ইহার চিন্তা করিতেছেন। আমাদের মনে হয় ঐতিহাসিক পটভূমির উপর এই সমস্যাটিকে প্রতিফলিত করিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে ইহাকে ভাল রকম না দেখিলে বিষয়টার জটিলতা ধরা পড়িবে না, সুতরাং কোন সমাধানই সার্থককাম হইবে না।

মুসলমানগণ হিন্দজাতিকে বা হিন্দুসভ্যতাকে যাহাই মনে করুন না কেন, হিন্দুত্ব একটা সজীব জিনিস, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের পর যখন ইহা রাজকীয় সমর্থন লাভ করিল, তখন হিন্দুধর্ম, ঐতিহাসিকগণের মতে ব্রাহ্মণধর্ম প্রায় লুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছিল। অশোক-হর্ষবর্ধনের আমলের পর যখন গুপ্ত সম্রাটগণ আবার ব্রাহ্মণধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা আরম্ভ করিলেন, তখন আবার হিন্দুধর্ম 'ভগ্নাচ্ছাদিত বহ্নিবৎ' আত্মপ্রকাশ করিয়া উঠিল এবং পরে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ভারতবর্ষ হইতে ইহাকে বিতাড়িত করিয়া আবার নিজকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিল। ইহা ইতিহাসের কঠোর সত্য, কাহারো খাম-খেয়ালীপ্রসূত কথা নহে। আমাদিগকে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এদিকে আবার হিন্দুগণ মুসলমানগণকে বা ইহাদের ধর্ম ও সভ্যতাকে যাহাই মনে করুন না কেন, মুসলমানদেরও একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট আছে। জগতের যে-কোন দেশেই ইহারা থাকে না কেন, ইহারা কখনও নিজের সংস্কৃতি নষ্ট হইতে দেয় না, প্রাণ দিয়া ইহা রক্ষা করে। সংখ্যালঘু হইলেও মুসলমানগণ তাহাদের নিজেদের সত্তা বজায় রাখিয়া চলে।

আকবর শাহের আমলে হিন্দুদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনে কোন কোন হিন্দুনেতৃবৃন্দের (রাজপুত) আগ্রহের মূলে এই উদ্দেশ্যই নিহিত ছিল। সেই সময় তাহারা অনেকটা সফলকাম হইয়া উঠিয়াছিলেন। আকবর হিন্দুত্বের অনেক কিছুই গ্রহণ করিয়াছিলেন।

হিন্দুসমাজ চিরকালই উচ্চ-নীচ বিভিন্ন স্তর নিয়া গঠিত। সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা সব সময়ই সর্বপ্রকারে নির্যাতিত হইত। তাহারা কখনও তাহাদের ব্যক্তি-

www.pathagar.com

স্বাধীনতা বজায় রাখিয়া চলিতে পারে নাই। ইচ্ছামত চলাফেরা করা, সকলের সমানভাবে ধর্মালোচনা বা ধর্মচর্চ্চা করার কোন অধিকার তাহাদের ছিল না। মুসলমান সমাজে এমন কোন বৈষম্য নাই। সংসার-জীবনে বা ধর্ম-পালনে ইসলামধর্ম সকলকে সমান অধিকার দিয়াছে। চিরন্তন প্রথা অনুসারে সমাজের কঠোর শাসন ও নির্যাতন বা নিপীড়ন হইতে মুক্তিলাভ করার জন্য হিন্দু সমাজের নিম্নস্তরের অনেক লোক সত্বর ইসলামধর্ম গ্রহণ করিলেন। ফলে মুসলমানদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

যে যুগে মুসলমানগণ ভারতবর্ষে আগমন করেন, তখনকার ভারতবাসী হিন্দুগণ অত্যন্ত গোঁড়া ছিলেন। তাহারা এক কথায় বলিতে গেলে কোন প্রকার যৌক্তিকতার ধার ধারিতেন না, বিদেশী মাত্রকেই তাহারা অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ঐতিহাসিক আলবেরুনী ইহা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। 'ম্লেচ্ছ' বা 'যবন' শব্দের ব্যবহার এই যুগেই আরম্ভ হয়। হিন্দুরা যখন দেখিল যে মুসলমানগণ এদেশে আসিয়া রহিয়া গেলেন, পূর্বতন আক্রমনকারীদের মত ফিরিয়া গেলেন না, তখন এই আগন্তুকদের প্রতি স্থায়ী ভারতবাসী হিন্দুগণের আর সহানুভূতি রহিল না। কিন্তু যখন দেখা গেল যে হিন্দু সমাজের অনেক লোক মুসলমান হইয়া যাইতেছে, তখন বর্ণ হিন্দুরা মুসলমানগণকে সম্পূর্ণরূপে হিংসা করিতে লাগিলেন কেননা এই মুসলমানদের আগমনের ফলেই তাহাদের দলে ভাঙ্গন ধরিল এবং বিশেষতঃ তাহাদের সেবকশ্রেণীর সংখ্যা হ্রাস পাইতে আরম্ভ করিল। হিন্দু-মোসলেম সমস্যার গোড়ার গলদ প্রায় হাজার বৎসর আগে এইরূপেই আরম্ভ হয়।

সৈয়দ আবদুল নবী বি. এ. : *হিন্দু-মোসলেম সমস্যার গোড়ার কথা*
১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৭ (১৯৪০)

হিন্দু-মুসলিম : দৃষ্টিভঙ্গি

একটা মুসলমান লোকের নাম লিখিতে গেলেই হিন্দু ভদ্রলোকেরা যত বানান ভুল করিয়া থাকেন। হিন্দু সমাজে অতিপ্রিয় আসামের ভূতপূর্ব মুসলমান মন্ত্রী 'ফখরুদ্দীন' সাহেবের নামটি এ পর্যন্ত কোন হিন্দু ভদ্রলোক বা প্রতিষ্ঠানকে শুদ্ধ করিয়া লিখিতে দেখি নাই- তাহাদের বানানে মন্ত্রী সাহেব—'ফকরুদ্দীন' বা 'ফকরউদ্দিন' বা 'ফকরুদ্দীন' বা একটা কিছু। উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিবেন মুসলমানেরা আরবিতে নাম রাখেন, কাজেই উচ্চারণ করা বা বানান করা শক্ত। উত্তরে বলিব, মুসলমানেরা কখনও আরবি ছাড়া অন্য ভাষায় নাম রাখে নাই, সাতশত বৎসরের প্রতিবেশীত্বের পরও কি কয়েকটি নামের বানান শিক্ষা একটা বিরাট জাতির পক্ষে সম্ভব হইল না? বিলাতের সাহেবদের বা রাশিয়া এবং স্কান্ডিনেবিয়ার ঔপন্যাসিকদের নাম লিখিবার সময় ভুল করিতে ত কখনও দেখি নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, মুসলমানের এত নিকটে থাকিয়াও হিন্দুগণ মুসলমান সম্বন্ধে এতই অজ্ঞ।

www.pathagar.com

যাহা হউক মুসলমানগণ এই সকল সংক্রামকতা হইতে এ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছেন। হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে নিরেট মূর্খ বা একটি হিন্দু ভদ্রলোকের নাম বানানে অসমর্থ মুসলমান আমরা এখনও দেখি নাই।

সৈয়দ আবদুল নবী বি. এ. : *হিন্দু-মোসলেম সমস্যার গোড়ার কথা*
১৩শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৭ (১৯৪০)

নজরুলের অভিভাষণ : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

আপনারা এই ভিখারীকে "বঙ্গীয়-মুসলমান-সাহিত্য সমিতি"র জুবিলী-উৎসবে সভাপতি কেন যে মনোনীত করলেন, যিনি বিশ্বভুবনের পরম পতি, পরম গতি, পরম প্রভু তিনিই জানেন। আপনাদের কাছে আজ অজানা নেই যে,—ঘরে-বাইরে, সভায় বা সমাধির গোপন গুহায় কোথাও পতিত্ব করার ইচ্ছা বা সাধ আমার নেই। যিনি সকল কর্মের, ধর্মের, জাতির, দেশের, সকল জগতের একমাত্র পরম স্বামী—পতিত্ব বা নেতৃত্ব করার একমাত্র অধিকার তাঁর। এ অধিকার মানুষেও পায়, মানি। কিন্তু সে পাওয়া যদি তাঁর কাছ থেকে না হয়, তারে বলে অহঙ্কার। এই অহঙ্কারকে আমি অসুন্দরের দূত বলে মনে করি। এ অহঙ্কার Divine নয়, Demon. অসুন্দরের সাধনা আমার নয়, আমার আল্লাহ্ পরম সুন্দর। তিনি আমার কাছে নিত্য প্রিয়-ঘন-সুন্দর, প্রেম-ঘন সুন্দর, রস-ঘন সুন্দর, আনন্দ-ঘন সুন্দর। আপনাদের আহ্বানে যখন কর্ম জগতের ভিড়ে নেমে আসি, তখন আমার পরম সুন্দরের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হই, আমার অন্তরে বাহিরে দুলে ওঠে অসীম রোদন। আমি তাঁর বিরহ এক মুহূর্তের জন্যও সইতে পারি না। আমার সর্ব অস্তিত্ব, জীবন-মরণ-কর্ম, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ যে তাঁরই নামে শপথ করে তাঁকে নিবেদন করেছি। আজ আমার বলতে দ্বিধা নেই, আমার ক্ষমা-সুন্দর প্রিয়তম আমার আমিত্বকে গ্রহণ করেছেন।

আমার বহু আত্মীয়াধিক প্রিয় সাহিত্যিক ও কবি-বন্ধু আমায় অভিযোগ করেন, আমার নাকি দান করার অপরিমেয় শক্তি ছিল দেশকে, জাতিকে, সাহিত্য-রস-পিপাসু মনকে—শুধু কার্পণ্য করে বা স্বার্থপরের মত আপন মুক্তির প্রচেষ্টায় সেই দক্ষিণাদানের দক্ষিণ হস্তকে উর্ধ্বে, না জানা শূন্যের পানে তুলে ধরেছি। তাঁরা আমায় আত্মীয়ের চেয়েও ভালবাসেন তাঁরা যখন একথা বলেন, আমার চোখের জলে বুক ভেসে যায়। যে অভিমান তাঁরা আমার উপর করেন, সেই অভিমান জানাই আমি আমার নির্বিকার উদাসীন একাকীত্ব নিয়ে আমার পরম সুন্দরকে। যে মহাসাগর থেকে ঝড়ের রাতে শ্যামঘন মেঘরূপে আমি সহসা এসেছিলাম, ঘন ঘন বিদ্যুৎছটায়, বজ্রের রোলে, ঘোর তিমির-ঘনঘটায়, মুক্ত জটায় দিগ্‌দিগন্ত ছেয়ে ফেলেছিলাম, অজস্র বারিবর্ষণে ভূষিত মাঠ ঘাট প্রান্তরের তৃষ্ণা মিটিয়েছিলাম, আমার রুদ্র-সুন্দর নৃত্য দেখে যাঁরা দেখতে পাননি যে এই অশান্ত মেঘ-ঘন রূপ শুধু রুদ্রের ডমক বিষাণ নিয়েই আসেনি, এরই করুণ নয়নের আশ্রুধারায় পৃথিবীতে ফুটেছে প্রেমের ফুল; শতদল-বৃন্ত, বনলতা হয়ে উঠেছে আনন্দে কন্টকিত, এই মেঘই এনেছে আনন্দ-বন্যা, ছন্দের নূপুরধ্বনি, সুরের সুরধনী, গানের প্রবাহ,—সেই মেঘ একদিন দেখতে পেল, সে তুষারীভূত

www.pathagar.com

হয়ে শ্বেতশুভ্ররূপে হিমালয়ের উচ্চতম শিখরে পড়ে আছে। তার শক্তি—তার প্রিয়াও যেন মহাশ্বেতারূপে তার বামে সমাধিস্থা। সেই সমাধির মাঝে আমি যেখান থেকে এসেছিলাম সেই সমুদ্রকে স্মরণ করতাম। সহসা মনে হত, এই মহাসমুদ্র এল কোথা থেকে। খুঁজতে গিয়ে মন বুদ্ধি অহঙ্কার—সবকিছু হারিয়ে যেত আকাশের পর আকাশ পেরিয়ে কোন এক পরম শূন্যে। তাই, বন্ধুদের বলেছি, এ আমার কার্পণ্য নয়, স্বার্থপরতা নয়—এ আমার স্বধর্ম, এ আমার স্বভাব। তাঁরা তুষারীভূত আমাকে ভেঙে যেটুকু বরফ পেয়েছেন, তাতে তাঁদের তৃষ্ণা দূরীভূত হয় না বলেছেন, আমি তাঁদের আমার অসহায় অবস্থার কথা বললে বিশ্বাস করেন নি। ঘুড়ি উড়তে গেছে ডালে আটকে—টানাটানি করলে সুতো ঘুড়ি সব যাবে ছিঁড়ে—অবুঝ হাত তবু টানা হেঁচড়া করতে ছাড়ে না।

নজরুল ইসলাম : অভিভাষণ
১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮ (১৯৪১)

মিলনের অগ্রদূত : নজরুল

যাঁর ইচ্ছায় আজ দেহের মাঝে দেহাতীতের নিত্যমধুর রূপ দর্শন করেছি—তিনি যদি আমার সর্বঅস্তিত্ব গ্রহণ করে আমার আনন্দময়ী প্রেমময়ী শক্তিকে ফিরিয়ে দেন সেই শক্তির চোখে আবার যদি অশ্রুর বন্যা হয়, তাঁর অঙ্গে যদি আবার অমৃতরসধারা প্রবাহিত হয়, আবার যদি তাঁর চরণে রাস-নৃত্যের ছন্দ জাগে—তাহলে আমি এই বিদ্বেষজর্জরিত, কুৎসিৎ সাম্প্রদায়িকতা-ভেদজ্ঞান-কলুষিত, অসুন্দর অসুর-নিপীড়িত পৃথিবীকে সুন্দর করে যাব, এই তৃষিতা পৃথিবী বহুকাল যে প্রেম, যে অমৃত, যে আনন্দ-রসধারা থেকে বঞ্চিত—সেই আনন্দ, সেই প্রেম সে আবার পাবে। আমি হব উপলক্ষ্যমাত্র, আধারমাত্র; সেই সাম্য, অভেদ শান্তি, আনন্দ, প্রেম আসবে আমার নিত্য পরম-সুন্দর পরম-প্রেমময়ের কাছ থেকে। নীরস তরুকে নিঙড়ে আপনারা রস পাবেন না। তাকে রসায়িত হবার অবকাশ দিন। আপনাদের আনন্দের, মুক্তির, রসের তৃষ্ণা প্রবল হয়ে উঠেছে জানি—তবু অপেক্ষা করতে হবে। আমি এই আনন্দের, এই প্রেমের ভিক্ষাপাত্র নিয়েই তাঁর দুয়ারে দাঁড়িয়ে আছি—যদি আমি না পাই, আপনাদের কেউ পান—সেই পরম সুন্দরের নামে শপথ করে বলছি—তাহলে আমি নিজে পেলে যে আনন্দ পেতাম তেমনি সমান আনন্দ পাব—সর্বাগ্রে আমি গিয়ে তাঁর চরণ-বন্দনা করব—সেবক হয়ে, দাস হয়ে তাঁর আজ্ঞাপালন করব। যদি আপনাদের তৃষিত নয়ন আমাকেই কেন্দ্র করে সেই শুভদিনের প্রতীক্ষা করে আছে বলেন, তা হলে আশীর্বাদ করুন যে, আমার অর্ধ-জাগ্রতা আনন্দময়ী শক্তি যেন আবার সমাধিমগ্না না হন, আবার যেন তাঁর সুন্দর নয়নের প্রসাদ পাই, তাঁর প্রেমের প্রবাহ-কূলে আবার যেন জ্ঞানে শক্তিতে আনন্দে নিত্য পূর্ণ হয়ে নৃত্য করতে পারি।

যদি আর বাঁশি না বাজে—আমি কবি বলে বলছিনে—আমি আপনাদের ভালোবাসা পেয়েছিলাম সেই অধিকারে বলছি—আমায় আপনারা ক্ষমা করবেন—আমায় ভুলে

www.pathagar.com

যাবেন। বিশ্বাস করুন, আমি কবি হতে আসিনি, আমি নেতা হতে আসিনি—আমি প্রেম দিতে এসেছিলাম, প্রেম পেতে এসেছিলাম—সে প্রেম পেলাম না বলে আমি এই প্রেম-হীন নীরস পৃথিবী থেকে নীরব অভিমানে চিরদিনের জন্য বিদায় নিলাম।

হিন্দু-মুসলমানে দিনরাত হানাহানি, জাতিতে জাতিতে বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, মানুষের জীবনে একদিকে কঠোর দারিদ্র, ঋণ, অভাব-অন্যদিকে লোভী অসুরের যক্ষের ব্যাঙ্কে কোটি কোটি টাকা পাষাণ-স্তূপের মত জমা হয়ে আছে—এই অসাম্য, এই ভেদজ্ঞান দূর করতেই আমি এসেছিলাম, আমার কাব্যে, সঙ্গীতে, কর্মজীবনে অভেদ-সুন্দর সাম্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম—অসুন্দরকে ক্ষমা করতে, অসুরকে সংহার করতে এসেছিলাম-আপনারা সাক্ষী আর সাক্ষী আমার পরম-সুন্দর। আমি যশ চাইনা, খ্যাতি চাই না, প্রতিষ্ঠা চাইনা, নেতৃত্ব চাই না—তবু আপনারা আদর করে যখন নেতৃত্বের আসনে বসান, তখন অশ্রু সম্বরণ করতে পারি না—তাঁর আদেশ পাইনি, তবু রুদ্রসুন্দররূপে আবার আপনাদের নিয়ে এই অসুন্দর, এই কুৎসিৎ অসুরদের সংহার করতে ইচ্ছা করে। যদি আপনাদের প্রেমের প্রবল টানে আমাকে আমার একাকীত্বের পরম শূন্য থেকে অসময়েই নামতে হয়—তাহলে সেদিন আমায় মনে করবেন না আমি সেই নজরুল। সে নজরুল অনেকদিন আগে মৃত্যুর খিড়কি দুয়ার দিয়ে পালিয়ে গেছে। সেদিন আমাকে কেবল মুসলমান বলে দেখবেন না—আমি যদি আসি, আসব হিন্দু-মুসলমানের সকল জাতির উর্ধ্বে যিনি একমেবা দ্বিতীয়ম তাঁরই দাস হয়ে। আপনাদের আনন্দের জুবিলী উৎসব আজ যে পরম বিরহীর ছায়াপাতে বর্ষা-সজল রাতের মত অন্ধকার হয়ে এল, আমার সেই বিরহ-সুন্দর প্রিয়তমাকে ক্ষমা করবেন, আমায় ক্ষমা করবেন,—মনে করবেন পূর্ণত্বের তৃষ্ণা নিয়ে যে একটি অশান্ত তরুণ এই ধরায় এসেছিল, অপূর্ণতার বেদনায় তারই বিগত-আত্মা যেন স্বপ্নে আপনাদের মাঝে কেঁদে গেল।

সাহিত্য ব্যক্তিত্বেরই প্রকাশ। আমি সাহিত্যে কি করেছি, তার পরিচয় আমার ব্যক্তিত্বের ভিতর। পদ্ম যেমন সূর্যের ধ্যান করে, তারই জন্য তার দল মেলে, আমিও আমার ধ্যানের প্রিয়তমের দিকে চেয়েই গড়ে উঠেছি। আমি কোন বাধা-বন্ধন স্বীকার করিনি, বিস্মৃত দিনের স্মৃতি আমার পথ ভুলায় নি, আমি আমার বেগে পথ কেটে চলেছি।

নজরুল ইসলাম : অভিভাষণ
১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮ (১৯৪১)

মুসলিম জাগরণ

চল্লিশ বছর আগে মুসলমানদের সম্বন্ধে বলিতে গেলেই অমুসলমান সমাজ বলিতেন, মুসলমান মৃত শার্দুলের মত পড়িয়া আছে, তাহার উঠিবার সম্ভাবনা নাই, বাঁচিবার কোন ভরসা নাই। কিন্তু আজ যদি সে কথা কেহ বলেন, তবে উত্তরে বলিব, আমাদের

www.pathagar.com

হৃদয়স্পন্দনের সন্ধান তাঁহারা পান নাই। তাহারা জানিতে বা বুঝিতে চাহেন নাই বলিয়াই আজ তাঁহারা বিস্ময়ে অভিভূত হন, ভাবেন, এরা জাগিল কেমন করিয়া?

আমাদের জাগাইয়াছেন আমাদের তরুণ সমাজ—আমাদের তরুণ সাহিত্যিক এবং সাহিত্যরসিকগণ। তরুণ শব্দই এখানে ব্যবহার করিলাম, কারণ বিংশ শতাব্দীর উদয়দিন হইতে এ পর্যন্ত আমাদের তরুণ সমাজই সাহিত্যের ভিতর দিয়া আমাদের জাতীয় জীবনে নবপ্রভাত আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা সফল হইয়াছে। সেই বিপুল আশাভরা নবপ্রভাত সত্যই আজ আসিয়াছে। তাহাকে আজ অভিনন্দন জানাই।

ভাবের বিপ্লব না আনিতে পারিলে কোন পতিত জাতির উদ্ধার হয় না। এই ভাবের বিপ্লব আনিতে পারেন সাহিত্যিকগণ। ইহার পশ্চাতে আসে উন্নতির নবযুগ—নূতন প্রভাত। আমার বিশ্বাস, আমাদের সাহিত্যিকগণ কতকটা ভাবের বিপ্লব আনিতে পারিয়াছেন বলিয়াই আমাদের মধ্যে জীবনের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আর একটি কথাও সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে—আমাদের উৎস-সন্ধানী হইয়া উৎসে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ইসলামের উদার মহান আদর্শের অনুসরণ করিয়াই আমাদের গন্তব্য পথ কি এবং কোথায় তাহা বাছিয়া লইতে হইবে। নদী যেমন তার স্রোত, তার গতি, তার শক্তি পায় উৎস হইতে, আমাদিগকেও সেইরূপ উৎস হইতে আমাদের ভাবপ্রবাহ, আমাদের গতি ও শক্তি লাভ করিতে হইবে। মুসলিম যদি আমরা হইয়া থাকি, তাহা হইলে ইহা ছাড়া অন্য অনুসরণীয় পথ আমাদের জন্য নাই। সাহিত্যের ভিতর দিয়াই আমাদের ধর্ম এবং আমাদের সংস্কৃতিকে আমরা রক্ষা করিব, পুষ্ট করিব, নূতন জ্ঞান ও আলো দিয়া অভিসিঞ্চিত করিব, ইহাই হোক আমাদের সুদৃঢ় পণ।

শিক্ষার প্রসার এবং সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি এ দুয়ের ভিতর দিয়াই জাতি বড় হইবার সুযোগ পায়। শিক্ষার বিস্তার সাধনের এবং নিরক্ষরতা দূর করিবার ভার আমাদের রাজনীতিকদের হাতে দিয়া বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-সমিতিকে আমাদের সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ও পরিপুষ্টির ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *ভাবের উৎস*
১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮ (১৯৪১)

সাহিত্য সমাজে নজরুল

সে কি আজকের কথা, দীর্ঘ কুড়ি বৎসর আগে যুদ্ধ ফেরত হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম যখন এই সাহিত্য সমিতির তখনকার ৩২ নং কলেজ স্ট্রীট ভবনে এসে উঠলেন, তখন সমিতি-অফিসে কি বিপুল আনন্দ-শিহরণ পড়ে গিয়েছিলো। আমরা তখন কলেজের ছাত্র। কিন্তু সাহিত্যের নেশায় সাহিত্য সমিতির অফিসে তখন আমাদের দৈনন্দিন হাঁটাহাঁটি চলছিল। সমিতির তখনকার সহকারী সম্পাদক মওলবী মোজাফফর আহমদ সাহেব একদিন

www.pathagar.com

হঠাৎ আমাদের জানালেন : আজ বিকেলে করাচী থেকে নজরুল ইসলাম আসছেন। আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠলুম।

নজরুলকে তখনো পর্যন্ত দেখিনি যদিচ, তবু তাঁর প্রথম লেখা 'বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী'ই তাঁকে আমার কাছে চিরপরিচিত করে রেখেছিল। এমন অদ্ভুত সুন্দর লেখা আমি তখনো আর পড়িনি। অথচ এই হচ্ছে সম্ভবতঃ নজরুলের প্রথম রচনা। কোনো সাহিত্যিকের প্রথম রচনা এমন দাগ কেটে পাঠকের মনে বসতে পারে, এ বিশ্বাস আমার ছিল না। মোটকথা, এক লেখায়ই আমি তখন সিদ্ধান্ত করে রেখেছিলাম : এক শক্তিধর প্রতিভা বাঙলা সাহিত্যে আসছে।

নজরুলের সাথে দেখা করার জন্য শুধু মুসলমান সাহিত্যিকরা নন, অনেক হিন্দু সাহিত্যিকও সমিতি অফিসে যাতায়াত করেছেন। কবি মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি অনেককেই নজরুলের সাথে কাব্য ও সাহিত্যালোচনা করে মেতে উঠছে দেখেছি। সাহিত্য সমিতির সভা-সমিতিগুলিও নজরুলের আবির্ভাবের জন্য যথেষ্ট প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। সাহিত্য সমিতির তখনকার ত্রৈমাসিক মুখপত্র "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা"র সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল নজরুল ইসলামের গল্প ও কবিতাগুলি। মোটকথা, সে সময়টাকে সাহিত্য সমিতির এক স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। সাহিত্য-সমিতি যেমন নজরুলের সংস্পর্শে তখন নবজীবনে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল, তেমনি সাহিত্য-সমিতিও সম্ভবতঃ গর্ব করতে পারে, নজরুল প্রতিভাকে আত্মস্থ হওয়ার প্রথম সুযোগ সে দিতে পেরেছিল।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *সাহিত্য সমিতি ও নজরুল ইসলাম*

১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮ (১৯৪১)

ধর্মের মর্মকথা : সংস্কার ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা

বাংলা সাহিত্যে, এমনকি, মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যে, ইসলামের প্রভাব যথেষ্ট নয়, এই আফসোস যত্রতত্র শুনতে পাওয়া যায় এবং সেজন্য আমাদের চোখের জলের অন্ত নেই। কিন্তু কেন যে এই প্রকারের দৈন্য, তা আজো আমরা কেউ ভালো করে ভেবে দেখিনি। আমরা মোটামুটি এই মনে করেছি যে, আমরা পুরা মুসলমান হতে পারিনি বলেই সাহিত্যে ইসলামের প্রভাব স্বল্প। কিন্তু তা সত্য নয়, বরং তার উলটোটাই সত্য। ইসলামকে সাহিত্যের ব্যাপার করতে হলে তিনটি জিনিস মনে রাখা দরকার—ইসলামকে জানা, বুঝা ও ভুলা; এক কথায় হজম করা। ইসলাম কেন, যে কোন আদর্শ জেনে না ভুললে, অর্থাৎ অবচেতনার ব্যাপার না হলে তা সাহিত্যের সামগ্রী হতে পারে না। (কারণ সাহিত্য মোটের উপর সৌন্দর্যের ব্যাপার; আর বিস্মৃতির ভিতর দিয়ে পরিস্রুত হয়ে না আসলে কোন জিনিসই সুন্দর হয়ে দেখা দেয় না।) অবচেতনার ব্যাপার হওয়া মানে নূতন রূপ লাভ করা, অন্য কথায় বিকৃত হওয়া। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, এই নূতন রূপ লাভ বা বিকৃতিকে আমরা মনে মনে বেশ ভয় করি। বিকৃতি যে জীবন, আর অবিকৃতি যে মৃত্যু, এ বোধ আজো

www.pathagar.com

আমাদের ভিতরে সঞ্চারিত হয়নি। তাই ইসলামকে অবিকৃত রাখবার উদ্দেশ্যে আমরা তাকে জানার বস্তু না করে মানার বস্তু করে রেখেছি। তার ফল হয়েছে এই যে, ইসলামিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্বন্ধে অত্যধিক সচেতন থাকলেও ইসলামের আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের প্রভাব থেকে আমরা বঞ্চিত। তার প্রমাণ এই যে, সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা ইসলামের এক বড় লক্ষণ, একথা বক্তৃতায় জোর গলায় প্রকাশ করলেও, জীবনে সেই আদর্শের অনুশীলন আমরা খুব অল্পই করি। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, তথাকথিত ইসলামিক 'তমদ্দনে'র জাগরণ যাঁর চান ইসলামিক ক্রিয়াকাণ্ডকেই তাঁরা বড় করে দেখেন। সংস্কার ও সংস্কৃতির বিভিন্নতা তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন না। আমাদের সাহিত্যিক সম্প্রদায়কে এই ভুল থেকে নিস্তার পেতে হবে, নইলে তাঁদের মৃত্যু অনিবার্য এবং তাঁদের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও মরণ ঘনিয়ে আসবে।

মোতাহার হোসেন চৌধুরী : *মুসলিম সাহিত্য-সাধনার কয়েক দিক*
১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৪৮ (১৯৪১)

ইংরেজি শিক্ষার সূত্র : মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি

"মুসলমান সমাজে ইংরেজী শিক্ষার প্রতি যে নিদারুণ ঘৃণা ও বিদ্বেষ জাগিয়াছিল তাহা দূর করিবার জন্য এবং মুসলমান, হিন্দু ও ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সামাজিক মেলামেশার সুযোগ সৃষ্টির জন্য মওলবী আবদুল লতিফ ১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মোহামেডান লিটারারী সোসাইটি গঠন করেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতি দেশবাসীর বিশেষতঃ মুসলমানদের মনোযোগ আকর্ষণ করাই ছিল সোসাইটির প্রধানতম কাজ। ... প্রতি বৎসর কলিকাতার টাউন হলে সমারোহে সোসাইটির বার্ষিক সম্মিলনীর অধিবেশন হইত। এখানে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের কথা আলোচিত হইত, পদার্থ-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত অনেক তথ্য পরীক্ষাচ্ছলে প্রদর্শিত হইত।

সোসাইটির কাজ শুধু এই ছিল না। ইহার নাম সাহিত্য সমিতি হইলেও সামাজিক রাজনৈতিক প্রভৃতি সমস্ত প্রসঙ্গই সোসাইটিতে আলোচিত হইত। মুসলমানদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষা সম্পর্কীয় যতো কিছু অভাব-অভিযোগ মোহামেডান লিটারারী সোসাইটিই সমাজের মুখপাত্ররূপে গভর্ণমেন্টকে জানাইতেন। গভর্ণমেন্টও সোসাইটির আবেদন গ্রহণ করিতেন। একবার মোহামেডান লিটারারী সোসাইটির বার্ষিক সম্মিলনীতে ছোট লাট স্যার সেসিল বিডন ও বড়লাট স্যার জন লরেন্স দুজনেই উপস্থিত হন।"

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ : *সাহিত্য সমিতির ইতিহাস*
১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৮ (১৯৪১)

শরৎ সাহিত্যে মুসলমান চরিত্র

শরৎচন্দ্র যতবড় সাহিত্যিক তার চেয়েও বড় শিল্পী এবং সংস্কারক। তাঁর সৃষ্টি বাইরের ছাঁচে নয়, ভেতরের প্রাণ-ধর্মে। একটি নগণ্য চরিত্র ও তাঁর তুলির আঁচড়ে অতি স্বাভাবিক অথচ

www.pathagar.com

বিশিষ্টরূপে সৃজিত হয়েছে। তাঁর ছবির অন্তরাল থেকে দেখা যায় ছোট বড় সকলের পরে শিল্পীমনের একটি নিবিড় মমতা সমান ধারায় ঝরে পড়ছে। প্রকৃত যে হীন, সমাজজীবনে সে যতবড় মর্যাদাসম্পন্ন হোক না তাঁর চোখে সে হীনই রয়ে গেছে—এ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ নমঃশূদ্র ভেদাভেদ দেখা যায় না। কিন্তু মুসলিম সমাজ এক সময় তাঁকে সংশয়ের চোখে দেখেছিল—সেই কথাটাই বলতে চাই। কলরব উঠেছিল তাঁর অন্যতম গল্প 'মহেশ'কে নিয়ে। এর মধ্যে চাষী গফুরকে শরৎচন্দ্র নাকি অস্পৃশ্য করেছেন। মহেশ গফুরের অকর্মণ্য বলদ। অজন্মার বৎসরে মহেশ চাষীদের ঝাড়া ধান নষ্ট করবে, খড়ের গাদায় মুখ দেবে, জমিদারের বাগান নষ্ট করবে এই ভয়ে চৈত্রের দুপুরে গফুর তাকে বাবলা গাছে বেঁধে রেখেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তর্করত্ন এই পথে বাড়ি ফিরছিলেন। দুপুর রৌদ্রে গরু বাঁধা দেখে এই ব্রাহ্মণশাসিত গ্রামে যে এইভাবে গো-হত্যা করবার অধিকার তার নেই এই কথাটা তিনি গফুরকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন। গফুর দুই বেলা খেতে পায় না, মহেশকে সে খেতে দেবে কোথা থেকে? তর্করত্নের কাছে মহেশের জন্য দুই কাহন খড়ের আবেদন জানিয়ে গফুর বলছে "আমরা না খেয়ে মরি ক্ষতি নেই কিন্তু ও আমার অবোলা জীব, কথা বলতে পারে না, শুধু চেয়ে থাকে আর চোখ দিয়ে জল পড়ে।" এতেও তর্করত্নের মন নরম হল না। পীড়িত গফুর তখন তাঁর পায়ে ধরতে ব্যাকুল হলে তিনি তাড়াতাড়ি তার স্পর্শ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলে যেতে উদ্যত হলেন, এবং তাঁর অঞ্চলে বাঁধা চাল কলার ঘ্রাণে উৎসুক মহেশকে তার একমুঠাও দিতে পারলেন না।

গফুর থাকতে না পেরে তার জীর্ণ ঘরের চাল থেকে এক গোছা খড় টেনে মহেশকে খেতে দিলে। এখানে কে মহৎ? গফুর মুসলমান। গরু তার দেবতা নয়, গরুর গলায় ছুরি চালাতে বা তার চামড়ায় জুতো তৈরি করাতে তার পাপ লেখা হবে না—কিন্তু এই যে নিঃস্বের শেষ সম্বল দিয়ে অবোলা জীবটাকে বাঁচাবার মাঝে অন্তরের স্বতঃউৎসারিত মমতার প্রকাশ—তা গফুরকে মহীয়ান করে তুলে নাই কি? যখন নিষ্ঠাবান তর্করত্ন তাঁর বিরাট খড়ের গাদা থেকে এক কাহন খড় দূরের কথা এক মুঠো চাল কলা দিয়েও অর্কপণ সাজতে পারলেন না উপরন্তু তপ্তরৌদ্রে মহেশকে বেঁধে রাখবার জন্য গফুরকে অপরাধী করে তাঁর প্রগাঢ় গো-ভক্তির পরিচয় দিয়ে সরে পড়লেন, তখন হৃদয়ধর্মে তর্করত্ন অপেক্ষা গফুর অনেক বড় হয়ে ওঠে নাই কি? একটি পশুর প্রতি গফুরের বাৎসল্য চরমে উঠেছে যখন সে অর্থাভাবে মহেশকে অন্য মুসলমানের হাতে বিক্রী করতে যাওয়ার অপরাধে জমিদারের দুয়ারে নীত হয়ে নিজ থেকে নাকে খত দিয়ে ফিরে আসল।

নাজমা বেগম : *শরৎ সাহিত্যে আমাদের কথা*
১৪শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৪৮ (১৯৪১)

প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব

আমাদের সত্যিকার দেশ পড়ে রয়েছে পল্লীর বুকে। এই পল্লীকে বাদ দিয়ে জাতীয়তাসাধনের ভ্রান্ত চেষ্টায় আমাদের নেতারা যে এযাবৎকাল তাঁদের শক্তি ও উদ্যমের

www.pathagar.com

শোচনীয় অপচয় করেছেন, এতদিনে তাঁরা তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন। কিন্তু এই উপলব্ধি এখনো সব নেতার মধ্যে সক্রিয় সহানুভূতিতে রূপলাভ করে নি। কোন কোন নেতা পল্লী উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট সহানুভূতির কার্যতঃ পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু কেউ কেউ এখনো উদাসীন। আবার জাতির নামে যাঁরা এতকাল দুধেভাতে খেয়ে খেয়ে ভূরির আকার বাড়িয়ে ফেলেছেন, জাগ্রত জন-সমাজে তাঁদের দুধ-ভাতের বরাদ্দে পাছে বাধা পড়ে, এই ভয়ে এই ভূরিওয়ালাদের অনেকে ভড়কে গিয়েছেন। শোনা যায় এঁদেরই কারো কারো অপচেষ্টার ফলে কোন কোন জিলায় অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারে প্রচুর বাধাবিঘ্নের সৃষ্টি হচ্ছে।

কিন্তু এসব ঔদাসীন্য ও অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে শিক্ষা-বিস্তার-কাজে প্রাথমিক শিক্ষকদেরই অগ্রসর হতে হবে। সত্যিকার জাতি-সৃষ্টির মহান ভার যে তাঁদেরই স্কন্ধে ন্যস্ত হয়েছে।

অধ্যক্ষ ইবরাহীম খাঁ এম. এ., বি. এল. : *প্রাথমিক শিক্ষা ও শিক্ষক*

১৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৪৮ (১৯৪১)

লালন ফকিরের জাত বিচার

কাব্যরত্ন, সাহিত্যভূষণ, অনুসন্ধানবিশারদ লালন ফকিরের বহু গান আমাদের দেশে প্রচলিত। সম্প্রতি কয়েকজন হিন্দু লেখক লালন ফকিরকে হিন্দু বলিয়া প্রচার করিতেছেন। প্রশ্নটা সত্যি জটিল। কারণ লালনের লেখা হইতে এ সম্বন্ধে তাঁর পরিচয় পাওয়া মুশকিল। তাঁর জাতি সম্বন্ধে লালন কিছুই লিখিয়া যান নাই। যাহা তিনি লিখিয়াছেন তাহা গ্রহণ করিলে আরও মুশকিলে পড়িতে হয়। তিনি বলিয়াছেন-

'সবে বলে লালন হিন্দু কি মুসলমান
লালন বলে আমি না জানি সন্ধান।।

অন্যত্র তিনি বিস্তৃতভাবে লিখিয়াছেন—

"সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে,
লালন বলে জেতের কি রূপ দেখলাম না এ নজরে।।
... ...
বামন চিনি পৈতার প্রমাণ
বামনী চিনি কিসেরে?
কেউ মালা কেউ তস্‌বী গলায়
তাইতে কি জাত ভিন্ন বলায়।
যাওয়া কিংবা আসার বেলায়
জেতের চিহ্ন রয় কাররে?

লালনের পূর্বপুরুষদের বা পিতৃকুলের সঠিক পরিচয় কেহই দিতে পারেন না। জনৈক হিন্দু লেখক বলেন, লালন শাহ কুষ্টিয়া মহকুমার গৌরী নদীর তীরস্থ ভাড়ারী গ্রামে কায়স্থ-কূলে

www.pathagar.com

জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জননীর নাম পদ্মাবতী। লালনের বাল্য নাম লালন দাস। তিনি যেখানে বাস করিতেন উহা এখনও নাকি দাসপাড়া নামে খ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরমুহূর্তেই তিনি দাসপাড়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বলিয়াছেন, এখন দাসপাড়ায় মনুষ্যের বসতি আর নাই। তাঁহারা আরও একটা বর্ণনা দিয়াছেন, লালন তাহার কোন আত্মীয় বউল দাসের সহিত গঙ্গাস্নানে যাত্রা করেন। পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতবৎ হইয়া পড়েন। সঙ্গীরা মৃত মনে করিয়া গঙ্গাতীরে তার মুখাগ্নি করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করেন। ইহার কয়েকদিন পরে একজন মূর্ত্তিমতী করুণারূপিনী তন্তুবায় মুসলমান মহিলা নদীতে তাহাকে প্রাপ্ত হন। ইহার আদরে লালন প্রাণ ফিরিয়া পান এবং বাড়িতে ফিরিয়া যান। এমতাবস্থায় তাঁহার গ্রামবাসীরা নাকি বলেন, মুসলমানের বাড়িতে খাইয়াছে বলিয়া তাহাকে জাতে গ্রহণ করা হইবে না। তখন হইতেই নাকি তিনি মুসলমানরূপে কালাতিপাত করেন।

এ. একে. এস. নূর মোহাম্মদ : *লালন ফকির হিন্দু না মুসলমান?*
১৪শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ়, ১৩৪৮ (১৯৪১)

চট্টগ্রামে নজরুল : তরুণ সমাজে আলোড়ন. অভিনন্দন

১৯২৯ খ্রিষ্টাব্দের শুরুতে নজরুল ইসলাম চট্টগ্রাম আসেন বাহার-নাহারদের চেষ্টায় (মুহম্মদ হবীবুল্লাহ বি.এ. এবং বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদ বি.এ.) এবং তাঁদের বাড়িতেই উঠেন। এই সময় তাদের মহীয়সী আম্মা জীবিতা ছিলেন। এঁরা দিদারের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং কিছুকাল থেকে তিনি অন্যতম সন্তানের ন্যায় এই পরিবারে বাস করছিলেন। বহু তরুণ এসে জুটেছিলেন নজরুলের চারিপাশে। এক বৈকালে আমিও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই।

দিদার আমাদের পরিবারের তরফ থেকে একখানি অভিনন্দন পাঠ করলেন।

কবি নজরুল ইসলাম

করকমলেষু-

হে সৈনিক কবি!

তোমার অগ্নি-বীণায় যেদিন প্রথম বিদ্রোহের সুর ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছিল, সেদিন এই সুদূরে আমরা কটি ভাই তোমায় আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে বরণ করেছিলাম। সেদিন তোমার বহ্নিক্রীড়ার মধ্যে আমরা তোমায় চিনেছিলাম, আজ তোমার বুলবুলের গানেও আমরা তোমায় চিনেছি;- তুমি আমাদের অতিকালের চেনা, আমাদের চির-চপল সাথী, আমাদের চির সহযাত্রী। অভিনন্দন জানাব না বন্ধু, শুধু তোমায় বুকে ধরে অন্তরের গোপন কথাটি শুনিয়ে যাবো। হে ব্যথার কবি!

মানব-মনের শাশ্বত বেদনা তোমার নিপুণ তুলিকায় যে অনুপম রূপ পেয়েছে, বাঙলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। ব্যথা-বিষে নীলকণ্ঠ কবি তুমি, ব্যথার উদ্বোধন করতে যেয়ে তোমাকে সে বিষ গলাধঃকরণ করতে হয়েছে, তাই তোমার ললাটে জয়টিকা

www.pathagar.com

হয়ে ফুটে উঠেছে। ভয় নেই বন্ধু, বাংলায় তুমি যে তরুণ দলের সৃষ্টি করেছ, তাদের ললাট তোমার জয়টিকার জ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছে। কারবালা-প্রান্তরে বীর হোসেনের আত্মা তোমার হাইদরী হাঁকে আবার জেগেছে যেন—এরা শির দেয়, তবু আমামা দেয় না, বন্ধু, ভোঁতা হয়ে গেছে সীমারের খঞ্জর, তরুণের অরুণ আভায় তার প্রায়ান্ধ আঁখি ঝলসিয়ে গেছে!

হে সর্বহারা কবি!

মানবের বেদনার আহ্বানে তুমি ঘর ছাড়া হয়ে বেরিয়ে এসেছ। তোমার সর্বহারার গানে যে তীব্র বিষের ফেনা উপচে উঠেছে, সে বিষ আমাদেরই অন্তর-ছেঁচা ধন বন্ধু, তোমার অনুপম ভঙ্গিতে তাকে তুমি আমাদের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছ—নতুন রূপে, নতুন ছন্দে, নতুন গানে। শ্মশান আমাদের জন্মভূমি, হতমান আমাদের জাতি, ভীরু আমাদের সমাজ, তাদের সেই শক্তি নেই, সেই মনও নেই যে তোমার সর্বহারাকে তার উপযুক্ত সম্মান করে। কিন্তু, দেশ তোমার সর্বহারাকে বুঝেছে, তাকে উচ্চে স্থান দিয়েছে। আজ বিজয়-গর্বে আমাদের বুক দুলে ফুলে উঠছে, সারাবিশ্বে আজ তরুণের যে অভিযান চলছে, বাংলার তরুণ তাতে মোটেই পিছিয়ে পড়েনি।

হে প্রেমিক কবি!

তোমার প্রেম জীবনমৃত বাঙালির প্রাণের পরতে পরতে যে শিহরণ তুলে দিয়েছে, তার ওপর ভিত্তি করেই এ জাতির উন্নয়নের বুনিয়াদ গড়ে উঠবে। তোমার প্রেম বাঙলা সাহিত্যকে জগতের সুমুখে মহীয়ান করে তুলেছে। জানি বন্ধু, জানি, যে প্রেম তোমার সর্বহারাদের জন্যে আঁখির জল ঝরায়, যে প্রেমের আহ্বানে তুমি নরক কবুল করতেও দ্বিধা কর না, তারি আকর্ষণে নভঃস্থল চিরে ছুটে এই উল্কা, ফোটে ফুল, বহে নদী। বন্ধু, অতৃপ্ত তোমার তিয়াসা তৃপ্তির অবসাদে যেন অভিশপ্ত না হয়।

হে প্রাণের কবি!

সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে এ ঘুমন্তপুরীকে তুমি প্রাণ দিয়েছ। অসত্যের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে তোমার যে অভিযান, তা সার্থক হোক, সুন্দর হোক, সফল হোক। ইতি-

চির তোমারই-
আলম পরিবার।

ফতোয়াবাদ,
২৬ শে জানুয়ারী ১৯২৯ ইং

মাহবুব-উল আলম : *নজরুল-প্রসঙ্গ*
১৪শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩৪৮ (১৯৪১)

www.pathagar.com

মৃত্যুশোক : রবীন্দ্রনাথ

অর্দ্ধশতাব্দীর ঊর্ধ্বকাল যাঁহার কাব্যসুধা পান করিয়া বাঙালি ধন্য হইয়াছে, বঙ্গভাষা ও বঙ্গসাহিত্য ধন্য হইয়াছে, সেই বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ আর নাই ইহা ভাবিতেও কষ্ট হয়। কেবল কবিতা ও গানে নহে, সাহিত্যের নানা বিভাগে তিনি যে শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন তাহা অনন্যসাধারণ আখ্যা পাওয়ার উপযুক্ত। একাধারে এত শক্তি আর কোনও ভারতীয় কবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় নাই। তাঁহার কবিতার গুঞ্জনধ্বনি সমগ্র বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাই তিনি বিশ্বকবিদের পর্যায়ে স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার জীবন ধন্য, তাঁহার দেশবাসী ধন্য, যে বঙ্গসাহিত্যকে তিনি বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পৌঁছাইয়া দিয়াছেন সে সাহিত্য ধন্য। তিনি এবং কবি ইকবাল বর্তমান শতাব্দীতে ভারতের নামকে বিশ্ব-সাহিত্যে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *রবীন্দ্রনাথ স্মরণে*
১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩৪৮ (১৯৪১)

রবীন্দ্রস্মরণে নজরুলের শ্রদ্ধাঞ্জলি-

কাব্য গীতির শ্রেষ্ঠ স্রষ্টা, দ্রষ্টা, ঋষি ও ধ্যানী
মহাকবি রবি অস্ত গিয়াছে। বীণা, বেণুকা ও বাণী
নীরব হইল। ধূলির ধরণী জানি না সে কতদিন
রস-যমুনার পরশ পাবে না। প্রকৃতি বাণীহীন
মৌন বিষাদে কাঁদিবে ভুবনে ভবনে ও বনে একা,
রেখায় রেখায় রূপ দেবে আর কাহার ছন্দ লেখা?
অপ্রাকৃত মদনে মাধবী চাঁদের জ্যোৎস্না দিয়া
রূপায়িত রসায়িত করিবে কে লেখনী, তুলিকা নিয়া।

ব্যাস বাল্মীকি কালিদাস খৈয়াম, হাফিজ ও রুমী
আরবের ইমরুল কায়েস যে ছিলে এক সাথে তুমি।
সকল দেশের সকল কালের সকল করিবে ভাঙ্গি'
তাঁহাদের রূপে রসে রাঙাইয়া, বুঝি কত যুগ জাগি'
তোমারে রচিল রসিক বিধাতা, অপরূপ সে বিলাস,
তব রূপে গুণে ছিল যে পরম সুন্দরের আভাসা।

এক সে রবির আলোকে তিমির ভীত এ ভারতবাসী
ভুলেছিল পরাধীনতা পীড়ন দুঃখ-দৈন্যরাশি।
যেন ঊর্ধ্বের বরাভয় তুমি আল্লাহ রহমত

www.pathagar.com

নিত্য দিয়াছ মৃত এ জাতিরে অমৃত শরবৎ।
সকল দেশের সকল জাতির সকল লোকের তুমি,
অর্ঘ্য আনিয়া ধন্য করিলে ভারত বঙ্গভূমি।

মনের মরুতে তোমার আলোকে ছায়া-তরু ফুল-লতা
জন্মিয়া চির-স্নিগ্ধ করিয়া রেখেছিল শত ব্যথা।
অন্তরে আর পাইনা যে আলো মানস-গগন-কবি,
বাহিরের রবি হেরিয়া জাগে যে অন্তরে তব ছবি।
গোলাপ ঝরেছে গোলাপী আতর কাঁদিয়া ফিরিছে হায়,
আতরে কাতর করে আরো প্রাণ, ফুলেরে দেখিতে চায়।

ফুলের, পাখীর, চাঁদ-সুরুযের নাহিক যেমন জাতি,
সকলে তাদেরে ভালোবাসে, ছিল তেমনি তোমার খ্যাতি।
রসলোক হতে রস দেয় যারা বৃষ্টি ধারার প্রায়
তাদের নাহিক ধর্ম ও জাতি, সকলের ঘরে যায়।
অবারিত দ্বার রস-শিল্পীর, হেরেমেও অনায়াসে
যায় তার সুর কবিতা ও ছবি আনন্দে অবকাশে।
ছিল যে তোমার অবারিত দ্বার সকল জাতির কাছে,
তোমারে ভাবিত আকাশের চাঁদ, চাহিত গভীর স্নেহে।
ফুল হারাইয়া আঁচলে রুমালে, তোমার সুরভি মাখে,
বক্ষে নয়নে বুলায়ে আতর, কেঁদে ঝরাফুলে ডাকে।
আপন জীবন নিঙাড়ি' যে জন তৃষাতুর জনগণে
দেয় প্রেম, রস, অভয়, শক্তি বসি দূরে নির্জনে,
মানুষ তাঁহারি তরে কাঁদে, কাঁদে তাঁরি তরে আল্লাহ,
বেহেশত হতে ফেরেশতা কহে তাঁহারেই বাদশাহ।
শত রূপে রঙে লীলা-নিকেতন আল্লার দুনিয়াকে
রাঙায় যাঁহারা, আল্লার কৃপা সদা তাঁরে ঘিরে থাকে।
তুমি যেন সেই খোদার রহম এসেছিলে রূপ ধরে,
আর্শের ছায়া দেখাইয়াছিলে রূপের আর্শি ভরে।

কালাম ঝরেছে তোমার কলমে, সালাম লইয়া যাও,
ঊর্ধ্বে থাকি' এ পাষাণ জাতিরে রসে গলাইয়া দাও।

কাজী নজরুল ইসলাম : *সালাম অন্ত-'রবি'*
১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৮ (১৯৪১)

www.pathagar.com

মৃত্যুশোক : রবীন্দ্রনাথ

জয়তু রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মহাপ্রয়াণে পৃথিবীর সর্বত্র যত লোক আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথা অনুভব করেছে আমাদের জীবনকালে এত বেশি আর কারও মৃত্যুতে করেনি। শুধু তাঁর গানে ও লেখায় নহে বাস্তবজীবনেও তিনি নিজেকে বিশ্ব-মানবতার মূর্ত্ত প্রতীকে পরিণত করতে পেরেছিলেন।

অধীন দেশে জন্মগ্রহণ করেও তিনি যে মুক্ত মানবতার মহাবাণী প্রচার করেছেন দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ লুপ্ত করে উহা বিশ্ববাসীকে নূতন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেছে—পূর্ণতর জীবনের স্বাদ জুগিয়েছে। ভারতের যুগ-যুগের সাধনা তার মধ্য দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে এবং পরম পুলকে, পরম বিস্ময়ে এবং পরম শ্রদ্ধায় বিশ্ব-মানব উহাকে অন্তরের মণিকোঠায় বরণ করে নিয়েছে। তিনি ভারতের জন্যে দিগ্বিজয় করেছেন, এ বিজয়ে সমগ্র পৃথিবী নূতন মহিমায় মণ্ডিত হয়েছে।

নোবেল-প্রাইজ জয় করে তিনি আমাদের দুঃসহভার জীবনে তড়িৎ প্রবাহের সঞ্চার করেন। জালিয়ানওয়ালাবাগ দুর্ঘটনায় তিনি দেশের পুরোভাগে দাঁড়িয়ে যে অপূর্ব তেজস্বিতায় ভারতের চিরঅপরাজেয় পৌরুষের বোধন করেন সব যুগের জালেম ও মজলুমের জন্যে উহা ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

নব-হিন্দুদের এবং নব-জাতীয়তার বেষ্টনীর মধ্যে থেকেও তিনি প্রচার করেছেন নব মানবতার। তাই ভারতের কালিদাস হয়েও তিনি ইরানে হাফিজের সমাদর লাভ করেছেন। সব যুগের সব দেশের মানুষকে তিনি জেনেছেন পরমাত্মীয় বলে।

সত্য, সুন্দর ও মঙ্গলময়ের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি বিশ্বমানবের মানস-লোকে। সংস্কার, জরা ও মৃত্যুর কুয়াশা ভেদ করে তিনি তার জন্যে জয় করে এসেছেন অমৃত-লোক।

মাহবুব-উল আলম : *মরণজয়ী রবীন্দ্রনাথ*
১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৮ (১৯৪১)

মৃত্যুশোক : রবীন্দ্রনাথ

বাঙলাদেশের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব বিস্ময়কর। তাঁর কাব্যসাধনার ঐশ্বর্য এবং বৈচিত্র্য বাঙালির মানসকে যেভাবে অভিভূত করেছে, পৃথিবীর অন্য কোন দেশে কোন কালে বোধহয় তার তুলনা মেলে না। একটিমাত্র কবির সাধনায় প্রাদেশিক ভাষা বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে পৌঁছে গেল, ইয়োরোপে দান্তের জীবনে আমরা তার দৃষ্টান্ত পাই, কিন্তু দান্তের চেয়েও বোধহয় রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধি দূরপ্রসারী ও যুগান্তকারী। ইয়োরোপের নবযুগের প্রাক্কালে দান্তের আবির্ভাব, খণ্ডবিচ্ছিন্ন ইতালী সেদিন স্বাধীনতার স্বপ্নে উন্মনা। ইতালীর সে প্রাণচাঞ্চল্য শিল্পে, সাহিত্যে, বিজ্ঞানে এবং রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট

www.pathagar.com

এবং সরব, কিন্তু ইতালীর মানসের সে সাধনায় নেতিধর্মের স্থান ছিলনা। রোমের পার্থিব গৌরব সেদিন হতম্লান, কিন্তু পোপের পারত্রিক সাম্রাজ্যের মধ্যে সেদিনও ইতালীর মানস সিদ্ধি ও প্রতিষ্ঠা খুঁজে পেয়েছে। দান্তের কাব্যসাধনায় তাই দুঃখ আছে, তীব্র অনুযোগ আছে, কিন্তু পরাজিত বা পলায়নী মনোবৃত্তির কোনো পরিচয় সেখানে মেলে না। পারিপার্শ্বিকের সহযোগিতায় তাই দান্তের প্রদীপ্ত প্রতিভা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাধনায় পারিপার্শ্বিকের সাহায্য অবান্তর না হলেও গৌণ। বরং বলা চলে যে তাঁর সাধনার ফলে পারিপার্শ্বিকের যে রূপান্তর, তারি ফলে স্বধর্ম ও স্বাজাতিকতার নতুন অর্থ ও সম্ভাবনা আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হল।

হুমায়ুন কবির : *রবীন্দ্রনাথ*
১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৮ (১৯৪১)

রবীন্দ্রস্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি

যে কোন দেশে, যে কোন সাহিত্যে বিরাট প্রতিভার আবির্ভাব স্মরণীয় ঘটনা। জড়তাগ্রস্ত সমাজমানসকে উদ্বুদ্ধ করা, অবচেতন মনে সঞ্চিত সংবেদনাকে প্রকাশ করা, পারিপার্শ্বিককে রূপান্তরিত করা, জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্নকে নব নব রূপে বিকশিত করা এসব প্রতিভারই কাজ। পৃথিবীর প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য সাহিত্যের সঙ্গেই এরূপ একটি প্রতিভার যোগাযোগ দেখতে পাওয়া যাবে। হোমার, ভার্জিল, দান্তে, সেক্সপিয়ার, গ্যেটে, ফেরদৌসী, কালিদাস—বিভিন্ন দেশের অব্যক্ত মনন ও মানস এঁদেরই মধ্যে মুক্তি ও রূপ খুঁজে পেয়েছে। বাংলাদেশ ও বাংলা-সাহিত্যের এই শ্রেণীর স্রষ্টা ও প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ।

প্রতিভার আবির্ভাব সমাজমাত্রেরই পক্ষে অতি বড় সুসংবাদ। প্রাচীন আরব দেশে এই জন্যেই প্রতিভার আবির্ভাব হলে দেশব্যাপী উৎসবের আয়োজন হত। দুর্ভাগ্য বাঙলাদেশ অন্ততঃ এইদিক দিয়ে ভাগ্যবান যে নিঃসঙ্কোচেই। এখানে এত বড় প্রতিভার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল, যাঁর সম্বন্ধে Keyserling বলেছেন- "The most universal, the most encompassing, the most complete human being I have known".

সহস্র জড়তায় ক্লিষ্ট বাঙলার সমাজে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব কেমন করে সম্ভব হল—এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আজ সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করেছেন ষাট বছরেরও আগে। এই সুদীর্ঘকালে বাঙলার মানস কত বিবর্তন, কত পরীক্ষা, কত বিপ্লব ও সম্প্রসারণের সম্মুখীন হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। তাহলেও বাঙলা-সাহিত্যের বর্তমান যুগ নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথেরই যুগ। প্রাণশক্তির প্রাচুর্যে বাঙলার মানসকে তিনি রূপান্তরিত করেছেন, অতিক্রম করেছেন। কিন্তু তাঁকে অতিক্রম করতে পারেনি তাঁর যুগ।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ : *রবীন্দ্রনাথ*
১৪শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র, ১৩৪৮ (১৯৪১)

www.pathagar.com

হিন্দু-মুসলিম মিলিত জাতীয়তার সর্বপ্রথম কবি : নজরুল ইসলাম

নজরুল ইসলাম বাঙ্গলার সত্যিকার জাতীয় সাহিত্য রচয়িতা—কাব্যে, উপন্যাসে, নাটকে হিন্দু-মুসলমানের এমন রূপায়ণ নজরুল ইসলাম যেমন সুষ্ঠুভাবে করতে পেরেছেন আর কেউ তেমন করতে পেরেছেন বা করতে চেষ্টা করেছেন কিনা সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। নজরুলের পূর্বে তথাকথিত জাতীয় ভাবধারা বাঙলা-সাহিত্যে ছিল না, একথা বলা আমার উদ্দেশ্য নয়। ছিল নিশ্চয়ই। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে বাঙলা-সাহিত্য তাতে এই তথাকথিত জাতীয়ভাবের প্লাবন অত্যন্ত লক্ষ্যযোগ্য।

বাঙ্গলার 'জাতীয়' আন্দোলনে প্রেরণা যুগিয়েছে বস্তুতঃ এই সাহিত্য। কিন্তু তবু মনে হয়, এই সাহিত্যে বাঙলার হিন্দুরা যতটা অনুপ্রাণিত হতে পেরেছে, বাঙ্গলার মুসলমান ততটা অনুপ্রেরণা পায়নি। এর কারণ যাই থাক, সে আলোচনা এখানে আমি অপ্রাসঙ্গিক বলেই মনে করি। কারণ তাতে বিতর্কের সৃষ্টি হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু নজরুল সম্বন্ধে এ মন্তব্য সম্ভবতঃ সমস্ত বিতর্কের বাইরে যে, তাঁর সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান যেন এক সঙ্গে মিলিতভাবে কথা কয়ে উঠেছে। নজরুলের কাব্যে হিন্দুয়ানী উপমা ও মুসলমানী উপমা সমভাবে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। হিন্দুর ইন্দ্র ও মুসলমানের ইস্রাফিল একই সঙ্গে বাঙলার হিন্দু-মুসলমানকে তাদের পরিচয় জানিয়েছেন। আর তাঁর নাটকে-উপন্যাসে হিন্দুচরিত্রের পাশে মুসলমান চরিত্র পরম আত্মীয়তার সূত্রে আবদ্ধ হয়ে স্থান পেয়েছে।

বাঙ্গলার হিন্দু-মুসলমানের মিলিত বাঙ্গালি-জাতীয়তা সম্ভব কিনা জানি না। অন্ততঃ বর্তমানে এর বিরুদ্ধে প্রবল আপত্তি উঠেছে। কিন্তু নজরুল ইসলাম যে এই মিলিত জাতীয়তার সর্বপ্রথম কবি, সে বিষয়ে কারুর সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *নজরুল-জয়ন্তী*
১৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন, ১৩৪৮ (১৯৪১)

মুসলিম সমাজে রাজনৈতিক সচেতনতা

বর্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতীয় মুসলিমগণ বুঝতে পারলেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের কোন স্থান নেই, হিন্দুরা তাদের পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই স্থান সৃষ্টি করতে হলেই নিজেদের একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান থাকা দরকার। তখন প্রদেশে প্রদেশে এইরূপ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার আলোচনা আরম্ভ হলো। এই আলোচনা রূপ গ্রহণ করলো ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে ঢাকা শহরে। সেই সময়ে ভারতীয় মুসলিমদের মধ্যে যাঁরা সর্ববিষয়ে অগ্রণী ছিলেন, তাঁরা এই নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনে যোগদান করে এর গৌরব বৃদ্ধি করেন। চিরস্মরণীয় স্যার নওয়াব খাজা ছলিমুল্লা বাহাদুর তখন নবসৃষ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি সেই সম্মেলনের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। ঢাকাতেই সর্বপ্রথম নিখিল ভারত মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব আলোচিত ও

www.pathagar.com

সমর্থিত হয়। স্যার ছলিমুল্লাকে যাঁরা পূর্বে চিনতেন না, তাঁরা দেখে বিস্মিত হলেন যে, পূর্বভারতে এমন একজন মুসলিম আছেন যিনি প্রকৃত দরদীর মন নিয়ে নিজের জাতির সেবা করেন। এইরূপে পূর্বভারতীয় সেই মুসলিম নেতা সর্বভারতীয় নেতা বলে পরিচিত হলেন।

যতদিন স্যার ছলিমুল্লা জীবিত ছিলেন ততদিন বাংলার প্রাদেশিক মুসলিম লীগ জীবিত ছিল। ১৯১৫ সনের প্রথম ভাগে তিনি মারা যান। তারপর থেকে বাংলার মুসলিম লীগ নেতার অভাবে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। তবুও একে কোনও রূপে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন মওলবী মুজিবর রহমান ও মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ সাহেব। আর কেউ এর দিকে ফিরেও চাননি। একথা অত্যন্ত দুঃখের সহিতই আমাদের লিখতে হচ্ছে।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাস*
১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৮ (১৯৪১)

সোজনবাদিয়ার ঘাট : সমকালীন সমাজের প্রতিফলন

কবি জসীমউদ্‌দীনের 'সোজন বাদিয়ার ঘাটে' দুইটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, একটি মুসলমান চাষীর ছেলে ও নমঃশূদ্রের মেয়ের প্রেম এবং অপরটি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। একটি বিষয় অন্য বিষয়ের পরিপূরক হইলেও তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সহজেই অনুভব করা যায়। বরং মনে হয় দুইটি পৃথক পৃথক ঘটনা একটির পর অপরটি পাশাপাশি চলিয়াছে। সাধারণতঃ নায়ক-নায়িকার চরিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য কাব্যে নানা ঘটনার অবতারণা করা হয়। কিন্তু এই কাব্যের নায়ক-নায়িকার সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সংস্রব অকিঞ্চিৎকর। দাঙ্গার ভয়াবহ কাহিনী পড়ার সময় আমরা নায়ক-নায়িকার কথা একেবারে ভুলিয়া যাই। ইহাতে প্রেমের উপাখ্যান হিসাবে কাব্যের কিছুটা অঙ্গহানি ঘটিয়াছে এবং ইহা কবির লেখা 'নকসী কাঁথার মাঠের' সমকক্ষ হয় নাই, তবে অন্যদিক দিয়া অর্থাৎ প্রচার সাহিত্য হিসাবে ইহার মূল্য ততোধিক বাড়িয়া গিয়াছে। কবি বলিয়াছেন হিন্দু-মুসলমান বিরোধের একটি ঘটনা হইতে এই গ্রন্থের সূত্রপাত। আমরা পৃথক পৃথকভাবে উপরিউক্ত বিষয় দুইটির আলোচনা করিব।

হিন্দু-মুসলমান চাষীদের মিলনের যে চিত্র কবি আঁকিয়াছেন তাহা অতীব সুন্দর ও সুখকর হইয়াছে। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় বাংলা সাহিত্যে এইরূপ চিত্র সচরাচর দৃষ্ট হয় না। শিমুলতলী গাঁয়ের গরীব মুসলমান ও নমঃশূদ্রগণ (নমু) একত্রে আরামে দিন যাপন করিতেছে। তাহাদের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ কিছুই নাই। নির্বিবাদে তাহারা তাহাদের ধর্মকর্ম করিয়া যাইতেছে।

মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী বি. এ., বি. টি. : *সোজনবাদিয়ার ঘাট*
১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৮ (১৯৪১)

www.pathagar.com

জাতি-বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে দুই ধর্ম

হজরত মোহাম্মদ (দঃ) কোনদিনই যীশুখৃষ্টের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন না। বরং তিনি তাঁহার পরিপূরক হইবার দাবি করিতে পারেন। যীশুখৃষ্ট তদীয় ধর্মের যাহা অসম্পূর্ণ রাখিয়া গিয়াছিলেন হজরতের আগমনে তাহা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। হজরতের সাহায্য ব্যতীত অধঃপতিত খ্রিষ্টধর্মের পুনরুত্থান সম্ভব হইত কিনা সন্দেহ। হজরত কেবলমাত্র তাঁহার পূর্ববর্তী মহাপুরুষের সত্যকেই প্রতিষ্ঠা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে তাঁহার অত্যধিক ঔৎসুক্যের জন্যই অনেক খ্রিস্টান বন্ধু মনে করিতেন যে তিনি খ্রিস্টধর্মকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ইসলামকে প্রাধান্য দিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু উভয় ধর্মের মূলনীতি বিচার করিয়া দেখিলে এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকে না। বিশেষতঃ উভয়ের বর্জনের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলেই খ্রিস্টানরা এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারেন। হজরত পরবর্তীকালে যে সমস্ত কূটনীতিকে অপসারিত করিয়াছিলেন যীশুর অনুসরণকারীদের দ্বারাও সেগুলি অপসারিত করার চেষ্টা হইয়াছিল। Eastern orthodox Church- গুলি হইতে আরম্ভ করিয়া Roman Catholic Church, Protestanism, Quakerism Congregationalism, Unitarism ইত্যাদি খ্রিষ্টধর্মের সকল শ্রেণীগুলিই এই সত্য প্রতিপন্ন করে। সত্যকথা বলিতে গেলে আমাদের হজরত মোহাম্মদই খ্রিস্টান ইতিহাসের সর্বপ্রথম Protestant. হজরত মোহাম্মদ (দঃ) প্রসাদাৎ না হইলে কোরানের মস্তবড় একজন মর্মানুধাবক মার্টিন লুথারকে কেহই চিনিত না। Bishop Arnis যে সমস্ত কুপ্রথার বিরুদ্ধে লড়িয়াছিলেন অন্যূন ৩০০ বৎসর পূর্বে আমাদের হজরত তাহা বর্জন করেন। যে সমস্ত ধর্মগত দোষ মার্টিন লুথারের বক্ষে বিদ্রোহের অগ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিল হজরত প্রায় ৮০০ বছর পূর্বেই তাহার উল্লেখ ও বর্জন করিয়া গিয়াছেন। Quakerism এবং Congregationalism আন্দোলনের মূলেও ইসলামের প্রভাব বিদ্যমান। খ্রিস্টান বন্ধুগণ যে সমস্ত জিনিস একে একে বর্জন করিয়াছেন ও করিতেছেন, অন্যূন ১৩০০ বছর আগেই আমাদের পয়গম্বর কর্তৃক সেগুলি পরিত্যক্ত হয়। আধুনিক জগতে জাতিভেদ এবং বর্ণভেদ প্রথা মানুষে মানুষে এক শোচনীয় বৈষম্যের সৃষ্টি করিয়াছে। একমাত্র মূল খ্রিস্টধর্ম এবং ইসলামধর্ম ব্যতীত সকল প্রকার 'ইজম' এবং ধর্মনীতি এই প্রথাকে প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মনিজম, নাৎসীজম এবং জুডিয়িজম শ্রেণী ও জাতিগত প্রাধান্যকে বিশেষরূপে সমর্থন করে এবং বলশেভিজম, সোশ্যালিজম ও ক্যাপিটালিজম হয় প্রোলিটারিয়েট অথবা ধনতন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করে। জাতিগত শ্রেষ্ঠত্ব রাষ্ট্রতন্ত্রের কোটরে বাসা বাঁধিয়াছে আর শ্রেণীগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্থ ও শ্রম এই দুই দেবতার স্কন্ধে ভর করিয়াছে। খ্রিস্টান এবং ইসলামধর্মের মূলতত্ত্ব গবেষণা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে এই দুই ধর্মে জাতি বা বর্ণভেদপ্রথার নামগন্ধও নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজকাল খ্রিষ্টধর্মও এই দুই শত্রুর প্রভাব অস্বীকার করিতে পারিতেছে না—'race' 'money' and

www.pathagar.com

'Iabour'-এর প্রশ্ন খ্রিস্টধর্মে ক্রমশঃ বড় হইয়া দেখা দিতেছে এবং ইহার সমধর্মী ইসলাম হইতে ইহা ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাইতেছে।

নূরুল ইসলাম চৌধুরী : *ইসলাম ও খ্রিস্টধর্ম*
১৫শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৪৮ (১৯৪১)

জসীমউদ্‌দীনের চোখে রবীন্দ্রনাথ

আমার ধ্যানের কবি রবীন্দ্রনাথ—আমার মনের কবি রবীন্দ্রনাথ। তাহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হইল প্রবাসীর পাতায় কবির লিখিত জীবন-স্মৃতির ভিতর দিয়া। আমার জীবনের সেই প্রথম কৈশোর বেলায় আর একজন কিশোর কবির প্রথম জীবনের কাহিনীর ভিতর দিয়া যে প্রথম মিলন-সূত্রটি রচিত হইল, সুদীর্ঘ জীবনে এমন নিবিড় সম্পর্ক বুঝি আর কারো সঙ্গে কখনো হয় নাই। কবি কোথায় রেলগাড়িতে বেড়াইতে গিয়াছিলেন, পথের পাশের প্রতিটি দৃশ্য কবির চোখ এড়াইতে পারে নাই। সকাল হইতে সন্ধ্যা কেমন করিয়া কবি প্রকৃতির প্রতিটি দৃশ্যের পানে চাহিয়া থাকিতেন, পদ্মার তীরে মাত্র একবাটি দুধ খাইয়া কবি সারাদিন কেবল লিখিয়া যাইতেন, এইসব কত যে একনিষ্ঠভাবে অনুকরণ করিতাম সে কথা ভাবিলে আজ হাসি পায়।

জসীমউদ্‌দীন : *রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ*
১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮ (১৯৪১)

বাল্যবিবাহ

অনেকের ধারণা, প্রাক-মুসলিম যুগে ভারতে বাল্য-বিবাহ-প্রথা অজ্ঞাত ও অপ্রচলিত ছিল; মুসলিম সমাজের প্রভাবের ফলে ইহা ভারতীয় সমাজে প্রবেশ করিয়াছে। আমরা হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করিয়া দেখাইতে পারি যে, বাল্যবিবাহ হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত অনুজ্ঞা, প্রাচীন আর্য্যসমাজে ইহা প্রচলিত ছিল।

ঋগ্বেদে ঋষি কক্ষিবান ও তাঁহার পত্নীর মধ্যে যে কথোপকথন হয় তাহাতে বৈদিক যুগে বাল্যবিবাহ প্রথার অস্তিত্বের সাক্ষ্য পাই। প্রথম মণ্ডলের ১২৬শ শ্লোকে এই কথোপকথন লিখিত আছে। ষষ্ঠ মন্ত্রে ঋষি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে যে যদি তাঁহার পত্নী আর একটু বয়স্কা হইতেন তাহা হইলে তিনি অধিকতর সুখী হইতেন।

উপনিষদে আমরা দেখিতে পাই, চক্রমুনির পুত্র নিতান্ত অপরিণতবয়স্কা কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন (ছান্দোগ্য ১ম ভাগ, দশম অধ্যায়, প্রথম শ্লোক)।

বাল্মিকী রামায়ণের তৃতীয় খণ্ডের ৪৭শ অধ্যায়ে সীতার বিবৃতি হইতে জানিতে পারি যে সীতা অষ্টাদশ বৎসর বয়ক্রমকালে বিবাহের ত্রয়োদশ বৎসরে রামের বনগমনকালে তাঁহার সহিত অযোধ্যা ত্যাগ করিয়াছিলেন। পাটিগণিতের সহজ হিসাব মতে দেখা যায় বিবাহকালে সীতার বয়স পাঁচ ছয় বৎসর ছিল।

মোহাম্মদ মতিয়র রহমান : *প্রাচীন ভারতে বাল্য-বিবাহ*
১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৪৮ (১৯৪১)

www.pathagar.com

ইতিহাস চেতনা

যে কূপের সহিত প্রাকৃতিক উৎসের সংযোগ আছে তাহার জল কমিতে পারে বটে, কিন্তু কিছুতেই শুষ্ক হইতে পারে না। সেইরূপ যে জাতির ইতিহাস অতীতের গৌরব কাহিনীতে পরিপূর্ণ সে জাতিও অধঃপতিত এবং পরপ্রত্যাশী হইতে পারে কিন্তু কখনও মরিতে পারে না। তবে ইতিহাসের সহিত জাতির পরিচয় থাকা চাই।

ইতিহাস জাতির আত্মবিশ্বাস জন্মাইবার এবং আত্ম-অকিঞ্চন-জ্ঞান দূর করিবার পক্ষে অপরিহার্য। মুসলমানের ইতিহাস বিরাট। উহা কোন স্থানকালের সীমায় আবদ্ধ নহে বলিয়া জগতের প্রত্যেক মুসলমানের গৌরব ও যশঃ জগতের প্রত্যেক মুসলমানেরই প্রাপ্য ও ভোগ্য। আরবীয় মুসলমানের গৌরব যেমন চীন ও ভারতীয় মুসলমানের প্রাপ্য, ভারত ও চীনের মুসলমানের গৌরবও তেমনি আরবীয় মুসলমানের প্রাপ্য। শিকলের কড়া যেমন পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ, সমস্ত জগতের মুসলমানও তেমনি পরস্পর এক সম্বন্ধযুক্ত। এই ঐক্যবন্ধনের দরুন সকল দেশের, সকল বংশের ও বর্ণের মুসলমানের গৌরব, উন্নতি ও কল্যাণের সৌরভ পৃথিবীর যেকোন দেশের যেকোন বর্ণের মুসলমানেরই উপভোগ্য। এই জন্যই মুসলমানের ইতিহাস বিরাট ও বিপুল হইয়া পড়িয়াছে। আর উহার প্রতি পত্রে প্রতি ছত্রে গৌরবের ছটা বিকীর্ণ হইতেছে। যে জাতির এমন বিপুল কাহিনীর সীমাহীন আলোকপ্রভা রহিয়াছে তাহাদের সম্মুখে যদি দ্বার মুক্ত করিয়া একবার আলোকের রাজ্য প্রদর্শন করা যায় তবে তাহাদিগকে কেহই অন্ধকারে রাখিতে পারিবে না। তবে মুসলমান এমন গভীর অন্ধকারে পড়িয়া আছে কেন? ইতিহাস ত তাদের খুবই আছে। কিন্তু ইতিহাস থাকিলে কি হইবে? ইতিহাসের সহিত পরিচয় আছে কয়জনের? গৃহে পর্যাপ্ত ইস্পাত থাকিলে যুদ্ধ জয় করা যায় না। সেই ইস্পাত দ্বারা অস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহার যথারীতি ব্যবহার করিলে তবেই ত যুদ্ধে জয়লাভ হয়।

সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক : ইতিহাস চর্চা
১৫শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ, ১৩৪৮ (১৯৪১)

স্বাতন্ত্র্য চেতনা

বাঙলাদেশের সত্যিকারের বাঙ্গালি অধিবাসীদিগের চারিভাগের মধ্যে আড়াইভাগ মুসলমান এবং দেড়ভাগ ভিন্ন ভিন্ন জাতির লোক। সুতরাং মুসলমানেরা যদি বলে, তাহারা মুসলমান এবং তাহাদের ভাষা মুসলমানী বাংলা ভাষা, তাহা হইলে তাহাতে আপত্তি করিবার কি কারণ থাকিতে পারে? যে বা যাহারা ভিন্ন জাতির অনুকরণ করিয়া, বাহ্যিক দৃষ্টিতে সন্দেহের অবকাশ ঘটায়, সে বা তাহারা, এসলামের নিকট নিশ্চয়ই অপরাধী। পোষাকে, পরিচ্ছদে, ভাবে, ভাষায় সকল দিকেই মুসলমানকে মুসলমানই থাকিতে হইবে। "মুচ্‌লমান" হইলে চলিবে না। যে ব্যক্তি বা যে জাতি পরের আদর্শই গ্রহণ করে, কেবল পরের নিকটই আদর্শ ধার করে বা আদর্শ ভিক্ষা করে, সে ব্যক্তি বা সে জাতি কখনই অপরের নিকট শ্রদ্ধার

www.pathagar.com

অধিকারী হয় না; অপরের নিকট শ্রদ্ধার দাবি করিতে পারে না। যে নিজেকে কাঙাল মনে করে, অপরে কি তাহাকে সম্পদের অধিকারী বলিয়া মনে করিতে পারে?

ডাঃ আবদুল গফুর সিদ্দিকী অনুসন্ধানবিশারদ : *"মুসলমানী বাঙ্গালা কি?"*
১৫শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৮ (১৯৪২)

স্বাতন্ত্র্য চেতনা

'আমাদের সাহিত্যে' আমি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছিলাম যে, বাঙ্গালি মুসলমানদের মধ্যে উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য সৃষ্টির অভাবের মূল কারণ হইতেছে, আমাদের সাহিত্যিকরা তাঁহাদের প্রেরণা-পথকে খুঁজিয়া না পাইয়া শুধু হিন্দু ও ইউরোপীয় লেখকদের পথকেই অনুকরণ ও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন আর যেখানে তাঁহাদের সত্যিকারের প্রেরণা পথ খুঁজিয়া পাইত তাহাকে বর্জন করিয়া আসিতেছেন। প্রবন্ধ হইতেই উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি : "আজিকার বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের পাছে পড়ে থাকবার বড় কারণ হচ্ছে, মানুষের প্রতি, তার স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আমরা ভুলে আছি আমাদের মহান ঐতিহ্যকে, জাতির সৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে, আমাদের ইতিহাস ও শিক্ষাকে, তাই আমাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়েছে পরের সৃষ্টির দিকে তাকিয়ে। আমরা চিৎকার করি, কিন্তু জাতীয়-জীবনের ভাবধারা, তার ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় করে উঠতে পারি না। জাতীয়-জীবনের প্রতি অন্তর্দৃষ্টি নেই, অভিজ্ঞতা নেই ও সহানুভূতি নেই। আমরা অতি উদার হতে গিয়ে হয়ে পড়ি সঙ্কীর্ণ। মানবতার দোহাই দিই, কিন্তু নিজের সমাজকে করি অবজ্ঞা ও অবহেলা। জাতির মর্মমূল হতে যে প্রেরণা আসে তার জন্য চাই অন্তর্দৃষ্টি, অভিজ্ঞতা ও প্রেম।"

চিন্তাধারা
আবদুল হামিদ শেখ, বি.এ. : *'ভারতীয় জাতীয়তা' ও 'আমাদের সাহিত্য'*
১১শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৪৯ (১৯৪২)

অনুকরণের অভিশাপ

অনুসরণ-অনুকরণের মোহ এখনো মুসলিম বাঙ্গলা কেন কাটাইয়া উঠিতে পারে না? শুধু সাহিত্য ক্ষেত্রে নয়, রাজনীতি প্রভৃতি জীবনের সর্বক্ষেত্রেই বাঙ্গলার মুসলমানের এই অনুকরণপ্রিয়তাই আমরা এতদিন প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি। পলাশীর পরাজয়ের পরে মুসলমানের জীবনে যে দুর্যোগ নামিয়া আসিয়াছিল, তারই জের এখনো চলিতেছে। সিপাহীবিদ্রোহের উন্মত্ত বেপরোয়া প্রচেষ্টার ভিতর দিয়া মুসলিম পুনর্জাগরণের (Moslem Revival) আত্মপ্রকাশ বিধ্বস্ত হইয়া যাওয়ার পর যে শোচনীয় প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তারই ফলে আধুনিক মুসলমানের জীবনে মারাত্মক inferiority-complex গাড়িয়া বসে। উহাই তাহাদিগকে অনুকরণ-অনুসরণের পথে চালিত করিতেছে। নৈরাশ্য ও অসহায়তা তাদের

www.pathagar.com

জীবন হইতে সমস্ত initiative, সব মৌলিকতা ধুইয়া-মুছিয়া লইয়া গিয়াছে। কাজেই তাদের সম্বল হইয়া পড়িয়াছে পরানুকরণ—যা অসহায়ের শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *পাকিস্তান ও বাঙ্গলা সাহিত্য*

১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, ১৩৪৯ (১৯৪২)

পাকিস্তানবাদ

পশ্চিমের ন্যায় পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীরাও রাজনীতি ক্ষেত্রে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবে পাকিস্তানকে গ্রহণ করিয়াছে। পাকিস্তান ভারত-উপমহাদেশের মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক রেনেসাঁ আনিয়াছে—মুসলমান আজ এরই কল্যাণে জীবন হইতে inferiority-complex ঝাড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে—অনুকরণ-অনুসরণের ক্লৈব্য দূর করার সাধনা করিতেছে। ভারতের মুসলমান আজ নবজীবনে জাগিয়া উঠিতেছে।

রাজনীতি ক্ষেত্রে পাকিস্তান যে নবজীবনের আহ্বান আনিয়াছে, তাহা মুসলমানদের জীবনের সর্বক্ষেত্রেই ব্যাপ্ত হইতে বাধ্য। দীর্ঘদিনের দিশাহারা পথহারা আত্মবিস্মৃত মুসলমান এই রেনেসাঁর বাণীকে—এই জাগ্রত-আহ্বানকে যে এমন সানন্দ অভিনন্দন জানাইতেছে, তার কারণ এর ভিতরে সে পথের সন্ধান পাইয়াছে, তার স্থির লক্ষ্য দেখিতে পাইয়াছে। ফলে তার সুপ্ত initiative ক্ষমতা আবার জাগিয়া উঠিয়াছে—সে জীবনের অর্থ খুঁজিয়া পাইয়াছে।

যে পাকিস্তান ভারতীয় মুসলমানের জীবনমূলে এমন নাড়া দিয়াছে—দিতে পারিয়াছে, রাজনীতি ক্ষেত্রেই তার initiative শেষ হইয়া যাইবে না—যাইতে পারে না। কারণ পাকিস্তান একটা বিরাট—একটা জীবন-দর্শন। শুধু কর্মক্ষেত্রেই ইহা বাস্তব রূপ লাভ করিতে চাহিবে তা নয়, চিন্তাক্ষেত্রেও এর সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রূপায়ণ অবশ্যম্ভাবী।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *পাকিস্তান ও বাঙ্গলা সাহিত্য*

১৫শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৪৯ (১৯৪২)

স্বাতন্ত্র্য চেতনা : বুদ্ধদেব বসুর সমালোচনা

খ্যাতনামা সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু সম্প্রতি একটি খবরের কাগজের এক বিশেষ সংখ্যায় "সাহিত্যে পাকিস্তান অসম্ভব" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে বুদ্ধ দেববাবু বলিয়াছেন যে, মেয়ে সাহিত্যিকদের যেমন 'মহিলা লেখক' বা 'লেখিকা' নামে অভিহিত হওয়া উচিৎ নয়, তেমনি ইসলাম ধর্মী সাহিত্যিকদেরও 'মুসলমান লেখক' বা 'মুসলিম সাহিত্যিক' বলিয়া পরিচিত হওয়া উচিৎ নয়। এটা খোদ মেয়েদের ও মুসলমানদেরই আত্ম-মর্যাদার হানিকর। "কোনো রকমে দুচার লাইন মিলাতে পারলেই

www.pathagar.com

'মহিলা কবি' আখ্যা পাওয়া যায়" বলিয়া, অথবা "কোনো একটি উন্মত্ত প্রলাপ ছাপার অক্ষরে বের করতে পারলেই 'মহিলা ঔপন্যাসিক' হিসেবে মাল্যলাভের সম্ভাবনা থাকে" বলিয়াই মেয়ে লেখকরা 'মহিলা লেখক' বা 'লেখিকা' নামে অভিহিত হইবার জন্য ব্যগ্র, ইহাই বুদ্ধদেব বাবুর মত। ঠিক সেইরূপ "দুএকটি ভাল কবিতা কি গল্প লিখেই মুসলমান পরিচালিত পত্রিকায়" "প্রধান লেখক বলে ঘোষিত" হইবার আশাতেই নাকি ইসলামধর্মী লেখকরা "শুধু লেখক" নামে অভিহিত না হইয়া "মুসলমান লেখক" রূপে অভিহিত হইতে চান। বুদ্ধদেব বাবুর মতে এটাই পাকিস্তানী মনোভাব। "এ ধরনের মনোভাব আগে ছিল না, এটা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে এবং ক্রমেই বেড়ে চলেছে।" "যে স্বাতন্ত্র্য-মত্ততা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মুসলমানদের মনে পার্থিব স্বর্গের স্বপ্ন এনে দিয়েছে", সেই স্বাতন্ত্র্যকে সাহিত্যক্ষেত্রে আনিতে চান বলিয়াই নাকি মুসলমান লেখকরা 'শুধু লেখক' ও 'সাহিত্যিক' না হইয়া 'মুসলমান লেখক' ও 'মুসলমান সাহিত্যিক' রূপে নিজেদের "অনপনেয় অপমানে চিহ্নিত" করিতেছেন।

আমি নিজেকে বুদ্ধদেব বাবুর মত অতটা মেয়েদের মুরুব্বী মনে করি না। "অবলা দুর্বলা" "নারী রক্ষায়" যে 'শিভালরী' ও 'নাইট ইরান্ট' মনোভাবের দরকার, আমার মধ্যে সে বীরত্বেরও অভাব দেখিতেছি। আমি মনে করি, আমাদের মেয়েদের সকলে না হোক, অন্ততঃ সাহিত্যিক মেয়েরা, আত্মরক্ষায় ও আত্মপক্ষ সমর্থনে সক্ষম। বিশেষতঃ আমি যেখানে দেখিতেছি, শ্রদ্ধেয় স্বর্ণকুমারী দেবী, অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবী প্রভৃতি 'মহিলা ঔপন্যাসিকের' উপন্যাস খোদ বুদ্ধদেব বাবুর উপন্যাসের চেয়ে কোনো অংশেই "উন্মত্ত প্রলাপ" নয়; আমি যেখানে বুঝিতেছি, শ্রদ্ধেয় গিরীন্দ্রমোহিনী, রাধারাণী, কামিনী রায় ও মিসেস সুফিয়া কামাল (পূর্বে সুফিয়া এন হোসেন)-এর কবিতা বুদ্ধদেব বাবুর কবিতার চেয়ে কোন অংশেই "দুচার লাইনের মিল" মাত্র নয়; তখন আমি কিরূপে বিশ্বাস করিব যে, "কোনো রকমে দুচার লাইন মিলাতে পারলেই 'মহিলা কবি' আখ্যা পাওয়া যায়"? অথবা, "কোনো একটি উন্মত্ত প্রলাপ ছাপার অক্ষরে বের করতে পারলেই মহিলা ঔপন্যাসিক হিসেবে মাল্যলাভের সম্ভাবনা" রহিয়াছে?

আমার ধারণা বরং এই যে, মেয়ে লেখকদের 'লেখিকা' করিয়াছে "বাঙলা ব্যাকরণ", —মেয়েরা নিজেরা নয়। এর প্রতিবাদ 'মেয়ে-নয়'—বুদ্ধদেববাবু সকলের আগে করেন নাই, করিয়াছেন স্বয়ং মেয়েরাই। শ্রদ্ধেয় সরলা দেবী অধুনালুপ্ত 'ভারতীয়' "সম্পাদক"ই ছিলেন, 'সম্পাদিকা' ছিলেন না। বুদ্ধদেববাবুর মত 'বীর' বাঙলা সাহিত্যে আর কতজন আছেন জানি না। কিন্তু এই "ব্যাকরণদ্রোহিতা"র জন্য শ্রদ্ধেয় সরলা দেবীকে তাঁর "সাহিত্যিক ভ্রাতা"দের নিকট কম গাল খাইতে হয় নাই।

বুদ্ধদেববাবু মুসলমানদিগকে মেয়েদের সঙ্গে এক কাতারে দাঁড় করাইয়াছেন, এ সম্মানের জন্য আমরা তাঁকে ধন্যবাদ দিতেছি। কিন্তু মেয়েদের পক্ষে কোনো কথা না বলিয়া আমরা নিজেদের কথাই বলিতেছি।

www.pathagar.com

বুদ্ধদেববাবু প্রতিভাশালী লেখক। তার চেয়ে বড় কথা এই যে, তাঁর মনটা আধুনিক এবং তাঁর দৃষ্টিটা উদার। সুতরাং সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর কথা আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গেই শুনিয়া থাকি। তিনি তাঁর আলোচ্য প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, তিনি রাজনৈতিক নন, এবং নন বলিয়াই "বিশাল ভারতকে অনেকগুলি খণ্ড ক্ষুদ্র 'স্থানে' বিভক্ত করবার প্রস্তাবে বিমূঢ় মৌনই" তাঁর "একমাত্র মন্তব্য"। বুদ্ধদেববাবু আমাদিগকে বুঝাইতে চাহিয়াছেন যে, "বিশাল ভারতে"র রাজনৈতিক ভাগাভাগির বেলায় তিনি চুপ করিয়া মনের দুঃখ মনেই চাপিয়া রাখিতেছিলেন, কারণ তিনি "রাজনৈতিক নন।" কিন্তু সেই "রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য"কে এতদিনে সাহিত্যে টানিয়া আনা হইতেছে দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না; তাঁর বুকে আর বরদাস্ত হইল না, কারণ তিনি "সাহিত্যিক"।

কথাটা ঠিক নয়। বুদ্ধদেববাবুর আধুনিক মন এবং উদার দৃষ্টিও তাঁকে এখানে ফাঁকি দিয়াছে। তিনি "রাজনৈতিক নন", একথা ঠিক নয়। বরঞ্চ শুধুমাত্র রাজনৈতিক চৈতন্য হইতেই তিনি 'পাকিস্তানে'র এই প্রতিবাদ করিয়াছেন, –সাহিত্যিক চৈতন্য হইতে নয়। মেয়ে সাহিত্যিকরা "মহিলা সাহিত্যিক" ও 'লেখিকা' রূপে পরিচিত হইয়া আসিতেছেন বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টি হইতেই। "মুসলমান সাহিত্যিক"রা স্বতন্ত্র্য "বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি"র প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন পঁচিশ বছর আগে। সুতরাং "এ স্বাতন্ত্র্যবোধ সম্প্রতি দেখা" দেয় নাই।

আবুল মনসুর আহমদ : *সাহিত্যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য*

১৬শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৪৯ (১৯৪২)

পাকিস্তানবাদী

ঢাকা পূর্ব–পাকিস্তান সাহিত্য–সংসদের সদস্যবৃন্দ দেশের এই সঙ্কট সময়ে এ অধিবেশনের আয়োজন করে সত্যই দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এ দুঃসাহসের মধ্য দিয়ে তাঁদের যে সাহিত্যপ্রীতি প্রকাশ পেয়েছে, তা সানন্দ অভিনন্দনযোগ্য। যুদ্ধ–পরিস্থিতির জন্য শুধু আইন–সভার সাধারণ নির্বাচন নয়, সামরিক প্রস্তুতি ব্যতিরেকে আমাদের অনেক কর্মধারা, এমন কি, সাহিত্যিক কর্মধারা পর্যন্ত, কিছুটা স্তম্ভিতগতি। কিন্তু ঢাকার সাহিত্যিক বন্ধুগণ এই দুঃসময়েও সাহিত্য–উৎসবের আয়োজন করেছেন—না করে পারেন নি। সাহিত্যের প্রতি মমত্ববোধ কতটা আন্তরিক ও আবেগময় হলে এ সম্ভব হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়।

বস্তুতঃ পাকিস্তান শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও রেনেসাঁর বাণী নিয়ে এসেছে। মুখ্যতঃ পাকিস্তান এ দেশের রাজনৈতিক সত্তাকে ঘা মেরে জাগিয়ে দেওয়ার জন্যে পরিকল্পিত হয়েছে সত্য, কিন্তু সে আঘাতের বেদনা জাতীয় সত্তার মর্মস্থল সাহিত্যেও সঞ্চারিত হয়েছে। জাতিত্বের হারা অভিমান আজ সম্বিৎহারা মুসলমানের রাজনৈতিক কর্মসাধনায় স্ফূর্ত হতে চাইছে বটে, কিন্তু সাহিত্যিক ও দার্শনিক রূপায়ণের ভিত্তির উপর তার

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা না থাকলে তা জীবনের ক্ষেত্রে দানা বেঁধে উঠতে পারে না। বড় রাজনৈতিক বিপ্লবের পেছনে তার সাহিত্যিক ও দার্শনিক ভিত্তিভূমি থাকবেই। ফরাসি-বিপ্লবের পেছনে ছিল রুশো-ভলটেয়ারের দর্শন, ভিক্টর হিউগোর সাহিত্য, রুশ-বিপ্লবের পেছনে ছিল মার্কসের দর্শন, টলস্টয়-তুর্গেনিভ-ডস্তয়তস্কী-গোর্কীর সাহিত্য। পাকিস্তান-পরিকল্পনা ভারতীয় মুসলমানের রাজনৈতিক সত্তার মূলে যখন নাড়া দিতে পেরেছে, তখন এর সাহিত্যিক দার্শনিক রূপায়ণ অবশ্যম্ভাবী।

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ
আবুল কামাল শামসুদ্দীন : *সভাপতির অভিভাষণ*
১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪২)

মহাকবি কায়কোবাদ : সমাজ চেতনা

সে আজ বহুদিনের কথা, ৭০ সপ্ততি বৎসরের কম নহে, আমি যেকালে প্রথম বাঙ্গলা ভাষার চর্চা আরম্ভ করি, সেকালে আমরা চারিজন ব্যতীত কোন মুসলমান লেখক ছিলেন না। সেই চারিজনের তিনজন কালের অতল সাগরে ডুবিয়া গিয়াছেন। মাত্র আমি একা এখন জীবিত থাকিয়া কবরের প্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। সে তিন জনের নাম শুনিতে বোধহয় আপনারা আগ্রহ প্রকাশ করিতে পারেন। একজন কুষ্টিয়া লাহিড়ী পাড়ার মীর মশাররফ হোসেন ও অন্যজন চাড়ানের পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন, ইঁহারা দুজনেই গদ্য লেখক, মাত্র আমি কবিতা লিখিতাম। ইহার কিছু পরেই শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক আসিয়া আমাদের সঙ্গে মিলিত হন। ইনিও কবিতা লিখিতেন, মাঝে মাঝে গদ্য লিখাও তাঁহার অভ্যাস ছিল।

সেকালে হিন্দু লেখকগণ আমাদিগকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন, তাঁহারা বলিতেন, মুসলমানেরা বাঙ্গলা লিখিতে জানে না। এসব শুনিয়া আমার মনে বড়ই আঘাত লাগিত, বলিতে কি হিন্দুদের ঐসব শ্লেষ উক্তি আমার হৃদয়ে বিষম বাজিত। সে সময় হিন্দুদের মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা বেশি ছিল না। মাত্র 'আর্যদর্শন', 'বঙ্গদর্শন', 'বান্ধব', 'সাহিত্য', 'ভারতী', 'বঙ্গবাসী', 'সোমপ্রকাশ', 'সঞ্জীবনী' প্রভৃতি সাত আটখানা পত্রিকা ছিল। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর "নীলদর্পণ" নাটক লিখিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গীয় সাহিত্যিক বন্ধু মীর মশাররফ হোসেন তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া লিখিয়াছিলেন "জমিদার দর্পণ" ও "বসন্ত কুমারী" নাটক। ইহা আমাদের পক্ষে কতকটা লজ্জাকর বিষয় বটে, রায় বাহাদুরই হউন, কি বিদ্যাসাগরই হউন, আমরা কেন তাঁহাদের অনুকরণ করিতে যাইব? আমরা কি লিখিতে জানি না? খোদাতালা আমাদিগকে যে শক্তি ও প্রতিভাটুকু দিয়াছেন, কেন, আমরা তাহার অপব্যবহার করিতে যাইয়া কলঙ্কের ডালি মাথায় তুলিয়া লইব? ইহার পরও তিনি "এর উপায় কি" প্রহসন লিখিয়া হিন্দু লেখকদের দ্বারা নিতান্ত লাঞ্ছিত ও অবমানিত হইয়াছিলেন, সে সময় বান্ধব সম্পাদক রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বিদ্যাসাগর C.I.E. বাহাদুর ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের সহিত লিখিয়াছিলেন, এসব আগাছা

www.pathagar.com

সাহিত্যের উদ্যান হইতে কাটিয়া ফেলাই উচিত। আরও লিখিয়াছেন, "এর উপায় কি?" শুধু মীর সাহেবকে এইরূপ বিদ্রূপ করিলে প্রাণে এত বাজিত না। মুসলমান জাতিকে লক্ষ্য করিয়া এসব কটূক্তি করাতে বড়ই মর্মাহত হইয়াছিলাম। বলিতে কি, উহারা কোন বহি হাতে লইয়া মুসলমান গ্রন্থকারের নাম দেখিলেই ফেলিয়া দিত।

আমি এই সব অবমাননার বোঝা মাথায় লইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, মুসলমান লেখক বাঙ্গালা লিখিতে জানে কি না, তাহা এই হিন্দু ভায়াদিগকে দেখাইতে হইবে। এই চিন্তা করিয়াই আমি 'অশ্রুমালা' লিখিয়াছিলাম। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে। ইহাতে এমন একটি শব্দও ছিল না যাহা পাঠ করিয়া হিন্দু ধুরন্ধরগণ মুসলমানের লেখা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন। এমনকি উহা পাঠ করিয়া সেই সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা 'বঙ্গবাসী' লিখিয়াছিল, "মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না।" মহাকবি নবীন সেন লিখিয়াছিলেন, "মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না। অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। আপনার 'আশ্রুমালা' তাহার প্রভাত-শিশির-মাত্র স্বরূপ বঙ্গ-সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।" বিক্রমপুর পণ্ডিতসমাজের মুখপত্র 'সারস্বত পত্র' লিখিয়াছিলেন, "কবি কায়কোবাদ মুসলমান, কিন্তু তাঁহার বাঙ্গালা মুসলমানি নহে, কায়কোবাদের বাঙ্গলা সুসংস্কৃত, মার্জিত ও মধুর।"

কায়কোবাদ : *উদ্বোধন*
১৬ষ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)

পূর্ব পাকিস্তান আন্দোলন

আমাদের নবস্বপ্ন-মুক্তির স্বপ্ন—পাকিস্তান, পলাশীর পর বহু বৎসর পর্যন্ত পথহারা আমরা পাকিস্তানের নবস্বপ্নের ভিতর পথের সন্ধান—জীবনের সন্ধান পাইয়াছি। এই নবস্বপ্নেরই শিশু-সন্তান পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ। আজ তাহারই প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে আমাদের চারিদিকে ঘেরা রক্তকড়ের ছায়া অন্ধকারে আজ এখানে আপনাদের এই শুভ-আগমন আমাদের এই আশঙ্কা-কম্পিত অথচ আশা-উন্মুখ চিত্তে যে কতখানি উৎসাহ ও সাহসের সঞ্চার করিয়াছে আমাদের আয়োজনের পরিসর দিয়া যেন তাহাকে পরিমাপ না করা হয়—যুক্ত করে ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

আজ পূর্ব-পাকিস্তানের চিরন্তন রাজধানী এই জাহাঙ্গীরনগরের বুকে দাঁড়াইয়া পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের আনন্দ-অধিবেশনের ভিতর দিয়া পাকিস্তানের কত স্বপ্ন-চিত্রই না দেখিতেছি। পাকিস্তানের স্বপ্ন আজ নূতন করিয়া দেখা দিয়াছে কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের অস্তিত্ব বহুদিনের বাস্তব সত্য। ইতিহাসের পাতার দিকে তাকাইলেই এই সত্য ভাস্বর হইয়া উঠে। ছায়াচিত্রের দৃশ্যপটের মত সে চিত্র একের পর এক চোখের সম্মুখে ভাসিয়া যায়।

www.pathagar.com

দেখিতে পাই, সপ্তদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে মহাবাহু বখতিয়ার অশ্ব-খুর-উত্থিত ধুলি-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া পূর্ব-পাকিস্তানের প্রথম জেহাদ—প্রথম বিজয়-অভিযান পরিচালিত করিতেছেন- উত্তরবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গ পর্যন্ত সেই অভিযানের উত্তাল তরঙ্গ বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মত উদ্বেল বেগে ছুটিয়া আসিতেছে—গৌড় লক্ষণাবতী বিক্রমপুরে কেন্দ্রীভূত পাকিস্তানবিরোধী বাধা সেই স্রোতের মুখে তৃণ-খণ্ডের মত ভাসিয়া যাইতেছে।

বেনজীর আহমদ : *অভ্যর্থনা*
১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)

সাহিত্যে সমাজ চেতনা

আমাদের সাহিত্য আমাদের জীবনের আলোচনা করবে, আমাদের প্রকৃতি ও বাইরের সমাজের ভিতর যে ভাব ও চিন্তার আলোড়ন চলছে সে আলোড়নের মধ্যে আমাদের গন্তব্যপথ নির্ণয় করবে, আমাদের জীবনকে বিবিধ চাঞ্চল্য থেকে রক্ষা করে ধ্রুব আদর্শের দিকে প্রেরণ করবে, এবং সর্বশেষে আমাদের সমাজকে নবযুগের উপযোগী নূতন শিক্ষা ও দীক্ষায় ব্রতী করবে।

সৈয়দ আলী আহসান : *সম্পাদকের বিবৃতি*
১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)

পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ : নামকরণ

পূর্ব্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদের নাম প্রথমে রাখা হয়েছিল—পূর্ব্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। বাঙলা ভাষায় সাহিত্য চর্চা যে সংসদের উদ্দেশ্য, তার নাম দেশজ হওয়াই আমরা সমীচীন বিবেচনা করি। যে-সমিতি বঙ্গদেশীয় মুসলিম সংস্কৃতিকে নবগতি প্রদান করবার আশায় সৃজিত হল তাকে ইঙ্গবঙ্গ নামে অভিষিক্ত করে এর প্রকৃত মর্যাদা ক্ষুণ্ন করবার বাসনা আমাদের নেই।

অনেকে "পূর্ব্ব" শব্দটিতে আপত্তি তুলেছেন। তাঁহারা বলেন যে, এই শব্দটির দ্বারা পাকিস্তানের অর্থ ক্ষুদ্র একটা ভৌগোলিক পরিবেশে সীমাবদ্ধ করা হয় এবং আমাদের সংসদের কর্মক্ষেত্রকেও সঙ্কুচিত করা হয়। তাঁদের প্রতিবাদ এক হিসাবে ভুল নয়, কিন্তু এটা একটা ভ্রান্তধারণা-প্রসূত বলেই মনে করি। আমাদের এই নাম ভারতের অন্য কোথায়ও এইরূপ উদ্দেশ্য ও ভাবধারায় পরিপুষ্ট কোন সাহিত্য-সংসদের সঙ্গে এই সমিতির মিলনের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে না বলেই আমাদের ধারণা। আমরা যে ভাষায় সংসদের কার্যনির্বাহ করবো তা বুঝিয়ে দেওয়াই এই 'পূর্ব্ব' শব্দ যোজনার একমাত্র উদ্দেশ্য।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন : *সমিতির সভাপতির আহ্বান*
১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)

www.pathagar.com

বাংলা উর্দু বিতর্ক

পূর্ব-পাকিস্তানের সাহিত্যের বাহন যে বাঙলা ভাষা হবে এ প্রশ্ন বহুপূর্বেই চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হয়ে গেছে। এতদিন পরে উর্দু-বাংলা প্রশ্নের উত্থাপন করা পণ্ডশ্রম ও হাস্যকর বলেই বিবেচিত হবে। ভারতের সার্বজনীন ভাষা হিসাবে উর্দুর দাবি অগ্রাহ্য করা নিষ্প্রয়োজন, এবং সেই কারণে উর্দু শিক্ষার প্রসারও আমরা বাঞ্ছনীয় মনে করি। কিন্তু উর্দুকে বহুদেশীয় মুসলমানের সাহিত্যের বাহন করে তুলবার আকাঙ্ক্ষা বাতুলতা মাত্র। পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলমানের কাছে উর্দু বিদেশী ভাষার সমতুল। এর ঐতিহাসিক পশ্চাদভূমি সম্বন্ধে তাদের কোন জ্ঞান নেই এবং এর ব্যাকরণ আয়ত্ত করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। উর্দুর স্থান ভারতে যাই হোক, এই ভাষায় উন্নতশ্রেণীর সাহিত্য-সৃষ্টি বাঙালি মুসলমানের পক্ষে সম্ভব, সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে যাঁর কোন জ্ঞান আছে তিনি এ বিশ্বাস পোষণ করবেন না।

সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন : *সমিতির সভাপতির আহ্বান*

১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)

মহাযুদ্ধ জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে

বর্তমান মহাযুদ্ধের তিন বছর শেষ হয়ে গেছে। এখন চতুর্থ বছর চলছে। সারা দুনিয়াব্যাপী আজ চলেছে এ যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা। একপক্ষে গণতান্ত্রিক শক্তি ইংলন্ড, আমেরিকা এবং বৈপ্লবিক শক্তি রাশিয়া। অপরপক্ষে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী বনাম ফ্যাসিস্ট শক্তি জার্মানী, ইতালী এবং সাম্রাজ্যবাদী জাপান। মিত্রপক্ষ, মানে বৃটিশ, আমেরিকা এবং রাশিয়া দোহাই দিচ্ছে গণতন্ত্রবাদের ও বিপ্লবের। আর শত্রুপক্ষ দোহাই দিচ্ছে জাতীয়বাদের। কিন্তু দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নজর করলে দেখা যায়, এ যুদ্ধের সত্যিকার রূপ হল International Civil War বা আন্তর্জাতিক অন্তর্দ্রোহ, সভ্যতার বিপক্ষে বর্বরতার অভিযান, বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতিবিপ্লবী শক্তির অভিযান। এক কথায় বলতে গেলে দুনিয়ার সর্বহারা জনগণের স্বার্থের বিপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণীস্বার্থের অভিযান।

আন্তর্জাতিকতায় গঠিত এক শক্তিশালী বাহিনী প্রকৃতপক্ষে আজ অভিযান চালাচ্ছে জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে। এ বাহিনী চায়—জনগণের আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অগ্রগতি দমিয়ে রাখতে। এ যুদ্ধের পেছনে শুধু জার্মানী, ইতালী ও জাপান নয়। পক্ষান্তরে দুনিয়ার সমস্ত ফ্যাসিস্ট শক্তি রয়েছে এ অভিযানের অন্তরালে।

চিন্তাধারা

ওবায়দুল্লাহ রওশনবাদী : *যুদ্ধ ও ভারতবর্ষ*

১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)

www.pathagar.com

স্বাধীনতার দাবি আত্মবিকাশের

এটা স্বীকার করতে আমার আপত্তি নেই যে, ভদ্রলোক হিন্দু ও ভদ্রলোক মুসলমানের সঙ্কীর্ণ শাসনিক স্বার্থের টক্কর লেগেছিল বলেই আজ 'পাকিস্তানে'র কথা উঠেছে। কিন্তু তাতেই 'পাকিস্তান'ও সঙ্কীর্ণ হয়ে যাচ্ছে না। কারণ ভদ্রলোকদের সে স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যেই বিপ্লবের বীজ লুকিয়ে ছিল। ডানজিগের অধিকার নিয়ে বর্তমান বিশ্বযুদ্ধ লেগেছে বলেই এই যুদ্ধের বিপ্লবী ভূমিকা ত আমরা অস্বীকার করতে পারি না। সুতরাং কী নিয়ে কোন কথা উঠলো, আর কী নিয়ে কোন সংঘাত বাধলো, এটা বড় কথা নয়। বড় কথা এই যে, সে সংঘাতটা সত্য কি না? সে সংঘাত বর্তমান পরিবেশকে ভেঙে চুরমার করে দিচ্ছে কি না? সে সংঘাতের ফলে আমরা বিপ্লবের পথে এগিয়ে যাচ্ছি কি না?

এই মাপকাঠি দিয়ে মাপলে আমরা দেখতে পাই, 'পাকিস্তান' আজ ভারতের রাষ্ট্রিক, সামাজিক, সাহিত্যিক ও কৃষ্টিক জীবনে এক বিপুল বিপ্লবের ভূমিকার অভিনয় কচ্ছে। সেটা কী করে হচ্ছে, দুচার কথায় আমি আজ তাই বুঝোবার চেষ্টা করবো।

চিন্তার দিক থেকে মানুষের সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব চিরন্তন। কিন্তু এই সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বিষয়ী রূপ সমাজবাদ। সমাজবাদের মূল কথা সকলকে আত্ম-বিকাশের সত্যিকার সুযোগ দান। সে সুযোগ দেওয়ার একমাত্র কার্যকরী ব্যবস্থা ধনসাম্য। তবেই দেখা যাচ্ছে, যে-ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও দেওয়ানী আজাদীর নামে সাম্যবাদের নিন্দা করা হয়, সেই আজাদীই সাম্যবাদের চরম লক্ষ্য। তাহলে যা কিছু মানুষের আত্ম-বিকাশের স্থায়ী প্রতিবন্ধক, অথবা সে প্রতিবন্ধকের আয়োজন, তাই প্রগতি-বিরোধী; আর যা কিছু এই আত্ম-বিকাশের সহায়ক, অথবা তার আয়োজন, তাই প্রগতিশীল।

আবুল মনসুর আহমদ : *পাকিস্তানের বিপ্লবী ভূমিকা*
১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি

এমন সময়ে পাকিস্তানের আহ্বান সমস্ত ভারতীয় মুসলমানকে সচকিত করিয়া তুলিল। রাজনীতিক্ষেত্রে স্বস্থতার বাণী লইযাই যদিও পাকিস্তান আসিল, কিন্তু এর অভাব সাহিত্যের উপরও স্বাভাবিকভাবেই পড়িল। মুসলমান সাহিত্যিকরা বুঝিতে পারিলেন, শুধু রাজনীতিক্ষেত্রে নয়, সাহিত্যক্ষেত্রেও তাঁরা এ যাবত পরানুকরণই করিয়া আসিয়াছেন। বাঙলা সাহিত্যসেবী মুসলমানগণও বুঝিতে পারিলেন : সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের যে হরিজনের মতো অবস্থা, তারও মূলে আছে তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই স্বস্থতার অভাব ও পরানুকরণের প্রভাব। এই অনুভূতি হইতেই কলিকাতায় 'পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি এবং ঢাকায় 'পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ' জন্মলাভ করিল শুধু কলিকাতায় ও ঢাকায় নয়, বাঙ্গলার অন্যান্য স্থানেও পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠনের সংবাদে মনে হয়:

www.pathagar.com

বাঙ্গলার মুসলিম সাহিত্যিক সমাজে একটা নবজাগরণের সূচনা হইয়াছে– অনুকরণ–অনুসরণের ভিতর দিয়া নয়, নব–সৃষ্টির ভিতর দিয়াই তাঁহাদিগকে সাহিত্যক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হইতে হইবে, এই ধারণা তাঁদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে।

আলোচনা : *পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য–সংসদ*
১৬শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৪৯ (১৯৪৩)

জাগরণের কবিতা

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না ? তবু তুমি জাগলে না?

সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ
অচল ছবি সে। তস্‌বির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক তুমি মিনতি আমার রাখো
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিস্তী আবার ভেসেছে সাগরজলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ–তরংগ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু তুমি জাগলে না? (আংশিক উদ্ধৃত)

ফররুখ আহমদ : *সাত সাগরের মাঝি*
১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০ (১৯৪৩)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ : পরিস্থিতি

যুদ্ধ–পরিস্থিতি মোটামুটিভাবে বর্তমানে মিত্রপক্ষের অনুকূল, এ কথা সম্ভবতঃ এখন দ্বিধাহীন চিত্তেই বলা যাইতে পারে। তিউনিসিয়ার যুদ্ধের উপরই বর্তমান মহাযুদ্ধের পরিণতি অনেকটা নির্ভর করিতেছিল। তিউনিসিয়ার যুদ্ধ মিত্রপক্ষে সুনিশ্চিত জয়ের ভিতর দিয়াই সমাপ্তির দিকে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। এরফলে ভূমধ্যসাগরে মিত্রপক্ষের অপ্রতিহত প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইবে, দক্ষিণ ইউরোপ মিত্রপক্ষের আক্রমনের একেবারে মুখে পড়িয়া যাইবে— তার প্রভাব পড়িবে রাশিয়ার যুদ্ধের উপর। জার্মানী যেরূপ বিরাট আয়োজন করিয়া রাশিয়ার

www.pathagar.com

উপর তার গ্রীষ্মাভিযান চালাইবার সংকল্প করিয়াছে, তার সে চেষ্টা এর ফলে তেমন সাফল্যলাভ করিতে পারিবে না—এমনকি, জার্মানীর চরম পতনসম্ভাবনাও এর মূলে বাস্তবে রূপায়িত হইয়া উঠা বিচিত্র কিছু নয়।

আলোচনা : *যুদ্ধ-পরিস্থিতি*
১৬শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০ (১৯৪৩)

মুসলমানদের আর্থিক দুর্দশা

প্রথমতঃ ধরা যাক, চাকুরির কথা। চাকুরি দুই রকমের : সরকারি চাকুরি ও বেসরকারি চাকুরি। বাঙলায় সরকারি চাকুরি থেকে জনসাধারণের বার্ষিক আয় ৬ কোটি টাকা। এই ৬ কোটির কত অংশ মুসলমানরা পায়? আপনারা জানেন, অনেক ধস্তাধ্বস্তি করে অনেক রেশিওর রশি টানাটানি করে মুসলমানের কোলে যে পরিমাণ চাকুরি আনতে পারা গিয়েছে, তার সংখ্যা শতকরা ২৩। এই ২৩ জনেরও অধিকাংশই অধস্তন কর্মচারি। কাজেই মাথাগণতিতে মুসলমান চাকুরিয়া শতকরা ২৩ জন হলেও টাকার দিক দিয়ে কিন্তু তাদের অংশ শতকরা ২৩ হয়নি। যথাসম্ভব দলিল দস্তাবেজ ঘেঁটে আমরা যে সংখ্যা পেয়েছি, তাতে দেখা যাচ্ছে, টাকার দিক দিয়ে সরকারি চাকুরিতে মুসলমানের অংশ শতকরা ১৫ মাত্র। ফলে সরকারি চাকুরিতে বিতরিত ৬ কোটি টাকার মধ্যে মুসলমানের ভাগে পড়ে এক কোটিরও কিছু কম।

আবুল মনসুর আহমদ কর্তৃক পঠিত : *পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যা*
১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫০ (১৯৪৩)

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের ষষ্ঠ অধিবেশন হইয়াছিল ১৯৩৯ সনে। সুদীর্ঘ চার বৎসর পর এই সপ্তম অধিবেশন। আজকের এই কর্মচাঞ্চল্যের দিনে তাঁদেরই স্মরণ করি, ৩২ বছর আগে (১৯১১ সনের ৪ঠা সেপ্টেম্বর) বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির যাঁরা গোড়াপত্তন করেছিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে বাঙ্গালি মুসলমানের প্রাণপুরুষ স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই ঘুমন্ত জাতিকে জাগাবার দায়িত্ব যেসব প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করে, তাদের মধ্যে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির নাম উল্লেখ না করে উপায় নেই। সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপারে বহুদিন ধরে এই সমিতি মুসলিম-বঙ্গের নেতৃত্ব করে এসেছে। এমন কোন সাংস্কৃতিক আন্দোলন এদেশে হয়নি যার সঙ্গে এর যোগাযোগ ছিল না। মুসলিম বঙ্গের সাহিত্যিক প্রতিভাগুলো এই সমিতির সংশ্রবে সব সময়ই অনুপ্রাণিত হয়ে এসেছে।

বাঙ্গলার নবীন প্রবীণ সব সাহিত্যিকের সঙ্গে সমিতির নাড়ির সম্পর্ক। বাঙ্গলার জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ যাঁরা সুপ্রতিষ্ঠিত—স্যর এম. আজিজুল হক, বিচারপতি নসিম আলী, মাননীয় সৈয়দ নওশের আলী, মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, নবাব

www.pathagar.com

মোশাররফ হোসেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, এঁরা সকলেই সমিতির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখনই এর উদ্দেশ্য ছিল :

(১) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বঙ্গ-সাহিত্যের আলোচনা ও তাহার পরিপুষ্টি সাধন। (২) আরবি, ফারসি ও উর্দ্দু প্রভৃতি ভাষা হইতে ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাসাদির অনুবাদ প্রচার। (৩) প্রাচীন মুসলমান বঙ্গ-সাহিত্যের সংগ্রহ ও সংরক্ষণ। (৪) বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানের পীর, সাধুপুরুষ ও অন্যান্য মহাজনের জীবনী সংগ্রহ ও প্রকাশ। (৫) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের প্রাচীন বংশাবলীর ও প্রাচীন কীর্তিকলাপের ইতিবৃত্ত ও জাতীয় ইতিহাসের অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ। (৬) বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাময়িকপত্রের প্রচার। (৭) সদগ্রন্থের প্রচারকল্পে সাহিত্যসেবীদিগকে উৎসাহ প্রদান (৮) সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন। (৯) সমিতির সংশ্লিষ্ট একটি পুস্তকাগার স্থাপন ও পাঠাগার সংরক্ষণ।

মুহম্মদ হবীবুল্লাহ : *সাহিত্য সমিতির কথা*
১৬শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫০ (১৯৪৩)

গাড়ু ও বদনা

একবার এক হিন্দু বন্ধু বলেছিলেন, কোনো মওলবী সাহেবের নাম করলেই তাঁর মনে হয় যে, মওলবী সাহেব বদনা হাতে অজু করতে যাচ্ছেন। কথাটা খুবই ঠিক। মওলবী সাহেবের সাথে বদনার যেমন নাড়ির সম্বন্ধ ঠিক তেমনই ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সাথে গাড়ুর। এই দুটি চিত্র হিন্দু ও মুসলিম বাংলার তমদ্দুনের পরিচয় ভাল করেই বহন করে—যেমন, ব্রাহ্মণপণ্ডিত গঙ্গাস্নান করে গাড়ু হস্তে ফিরছেন এবং মওলবী সাহেব বদনা হস্তে অজু করে ফিরছেন। বাংলায় গাড়ু ও বদনা অক্ষয় হয়ে আছে এবং থাকবে, এরা আমাদের বাংলার হিন্দুত্ব মুসলমানত্বের প্রতীক।

মুজীবর রহমান খাঁ : *বাংলা তামদ্দুনিক রেখাচিত্র*
১৬শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫০ (১৯৪৩)

চাকুরি ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলিম বৈষম্য

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকুরির ব্যাপারে মুছলমানের প্রতি অনাচার কিভাবে চলিয়া আসিতেছে, তার কিছুটা নমুনা নিম্নের সংখ্যা-বিবরণ হইতে পাঠকগণ পাইতে পারেন : গত ১৫ই সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদে এক প্রশ্নের উত্তরে শিক্ষামন্ত্রী মাননীয় মিঃ তমিজুদ্দীন খাঁ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে নিম্নরূপ বিবরণ প্রদাণ করেন :-

	বর্তমান সংখ্যা	মুসলমান সংখ্যা
১। আরবি, ফারসি, এছলামিক ষ্টাডিজ ও সংস্কৃত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের অধ্যাপক-	২১	১

www.pathagar.com

২।	আরবি, ফারসি, এছলামি স্টাডিজ ও সংস্কৃত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের লেকচারার–	১৮৮	৪
৩।	বিশ্ববিদ্যালয় ল'কলেজের লেকচারার–	২৪	১
৪।	আরবি, ফারসি, এছলামিক স্টাডিজ ও সংস্কৃত ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ের স্কলার–	১,৩৪৮	১৫৭
৫।	একজিকিউটিভ অফিসার–	১৪	নাই
৬।	ক্লারিকাল স্টাফ–	৩০০	৬

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আজকের নয়, বহুদিনের। এসব অভিযোগের প্রতিকারের চেষ্টাও বহুদিনের; কিন্তু সে সব চেষ্টা যে মোটেই ফলবতী হয় নাই, তার অকাট্য প্রমাণ এই সংখ্যা বিবরণ।

আলোচনা : *কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও মুছলমান*
১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫০ (১৯৪৩)

মুসলিম সমাজের খাদ্য সংকট

খাদ্যপরিস্থিতির আবর্তে পড়িয়া বাংলায় যারা সব চাইতে অধিক বিড়ম্বিত হইতেছে, তারা বাংলার মুছলমান; তারা দরিদ্র, শিক্ষায় ও ব্যবসায়–বাণিজ্যে অনগ্রসর। যুদ্ধের বাজারের লাভের সিংহের ভাগ বাংলার অমুসলমান পাইয়াছে। চাকরি–বাকরিতে তারা নানা কারণে এক প্রকার বাদ পড়িয়াছে বলিতে হয়। আগে হইতে ব্যবসায় বাণিজ্যে পশ্চাতে বলিয়া যুদ্ধের বাজারেও তারা তেমন কোনো সুবিধা পায় নাই। ফলে খাদ্য সঙ্কটের কবলে বাংলার মুসলমান আজ পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হইতে বসিয়াছে। বেসরকারি সেবা ও সাহায্যের প্রয়োজনও মুসলমানের জন্য পূর্বোল্লেখিত কারণে বিশেষ করিয়া দরকার। কলিকাতা লীগ ও মোসলেম চেম্বার অব কমার্স যেসব কাজ করিতেছেন তাকে উপেক্ষা করা যেতে পারে না কিন্তু এতে মাত্র খাদ্যাভাবের ভগ্নাংশকে আক্রমণ করা হইয়াছে।

বস্তুতঃ বাংলার এই খাদ্যসঙ্কট মুসলমানের আজ জাতীয় জীবন–মরণের সমস্যারূপে দেখা দিয়াছে। একে উপেক্ষা করিলে জাতির প্রতি অমার্জনীয় অপরাধ করা হইবে, শুধু তাই নয়, জাতির রাজনৈতিক ও তামদ্দুনিক অস্তিত্ব পর্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িবে। বাংলার মুসলমান জাতীয় চিন্তা–নায়ক কর্মীদিগকে আজ এইদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। সর্বদা মনে রাখিতে হইবে, "মুছলমানকে মুছলমান না রাখিলে কে রাখিবে?"

আলোচনা : *খাদ্য পরিস্থিতি ও মুছলমান*
১৬শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫০ (১৯৪৩)

www.pathagar.com

বাংলা-উর্দু বিতর্ক

বাঙলার মুসলানদের মাতৃভাষা বাঙলা হবে-কি উর্দ্দু হবে, এ তর্ক খুব জোরে-সোরেই একবার উঠেছিল। মুসলিম বাঙলার শক্তিমালী নেতাদের বেশির ভাগ উর্দ্দুর দিকে জোর দিয়েছিলেন। নবাব আবদুর রহমান মরহুম, স্যার আবদুর রহিম, মৌঃ ফজলুল হক, ডাঃ আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, মৌঃ আবুল কাসেম মরহুম প্রভৃতি প্রভাবশালী নেতা উর্দ্দুকে বাঙালি মুছলমানের "মাতৃভাষা" করবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মুসলিম বাঙলার সৌভাগ্য এই যে, উর্দ্দু প্রীতি যাঁদের বেশি থাকবার কথা, সেই আলেম সমাজই এই অপচেষ্টায় বাধা দিয়েছিলেন। বাঙলার আলেম সমাজের মাথার মণি মওলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফি, মওলানা মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী উর্দ্দু-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। এঁদের প্রয়াসে শক্তি যুগিয়েছিলেন মরহুম নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। সে লড়াই-এ এঁরাই জয়লাভ করেছিলেন। বাঙলার উপর উর্দ্দু চাপাবার সে চেষ্টা তখনকার মত ব্যর্থ হয়।

ভাষা হিসেবে আমরা উর্দ্দুর নিন্দুক নই। আমরা শুধু বাঙলার উপর উর্দ্দু চাপাবার প্রয়াসের বিরোধী। আমাদের এ বিরোধের কারণ এই নয় যে, বাঙলা ভাষা ভাষা-হিসেবে উর্দ্দুর চেয়ে উৎকৃষ্ট সে তর্কই আমরা এখানে তুলবো না। উর্দ্দু প্রবর্তনের চেষ্টার বিরোধী আমরা অন্য কারণে। সে কারণগুলোই এই আলোচনায় আমি দেখাবার চেষ্টা করবো।

সবচেয়ে বড় কারণ এই যে, কোনো জাতির মাতৃভাষা বদলিয়ে এক ভাষা থেকে অপর ভাষায় নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এটা একেবারেই অসম্ভব সে জাতিতে যে জাতির লোক সংখ্যা প্রায় চার কোটি। বাঙলা ভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা তাই। ওদের সকলকে বাঙলা ছাড়িয়ে উর্দ্দু শেখাবার চেষ্টা পাগলামী মাত্র।

পাকিস্তানের প্রধান রাজমিস্ত্রী 'আজাদ' সম্পাদক মৌলবী আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও রেনেসাঁ সোসাইটির সম্পাদক মৌলবী মুজিবর রহমান খাঁ সাহেবের দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করছি এবং আগে থেকে হুশিয়ার করে দিচ্ছি।

অথচ উর্দ্দু নিয়ে এই ধ্বস্তাধ্বস্তি না করে আমরা সোজাসুজি বাঙলাকেই যদি পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ও জাতীয় ভাষা রূপে গ্রহণ করি, তবে পাকিস্তান প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা মুসলিম বাঙলার শিক্ষিত সম্প্রদায় নিজেরাই পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক ও শিল্পগত রূপায়ণে হাত দিতে পারবো। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি, প্রতিভা ও জীবনাদর্শ দিয়েই আমাদের জনসাধারণকে উন্নত, আধুনিক জাতিতে পরিণত করবো জাতির যে অর্থ, শক্তি, সময় ও উদ্যম উর্দ্দু প্রবর্তনের অপব্যয় হবে, তা যদি আমরা শিক্ষা-সাহিত্যে, শিল্পে-বাণিজ্যে নিয়োজিত করি, তবে পূর্ব-পাকিস্তানকে আমরা শুধু ভারতের নয়, সমগ্র মুসলিম জগতের, এমনকি, গোটা দুনিয়ার, শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত করতে পারবো।

আবুল মনসুর আহমদ : *পূর্ব পাকিস্তানের জবান*
১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫০ (১৯৪৩)

www.pathagar.com

মৃত্যুশোক : রোমাঁ রোলাঁ

বিশ্ববিশ্রুত ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সমালোচক ও দার্শনিক রোমাঁ রোলাঁ্যা পরলোকগমন করিয়াছেন। রোমাঁ রোলাঁ্যার মৃত্যুতে সুধী ইউরোপের অন্যতম দিকপালের পতন হইল। রোমাঁ রোলাঁ্যার মৃত্যু আরো শোকাবহ এই জন্য যে, তিনি জার্মানী বন্দীশালায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

রোলাঁ্যার খ্যাতি তাঁর অমর উপন্যাস জন ক্রিস্টফারের জন্য বিশেষভাবে পৃথিবীময় ছড়াইয়া পড়ে। এটিকে ঠিক একটি উপন্যাস না বলিয়া একটি মহাকাব্য বলা চলে। ইহার সাথে শাহনামা ও মহাভারতের কিছুটা তুলনা করা যাইতে পারে। শাহনামা যেমন প্রাচীন ইরানের এবং মহাভারত অতীত ভারতের বিচিত্র জীবনকাহিনী লইয়া সম্পূর্ণ, তেমনই জন ক্রিস্টফার আধুনিক আদর্শ সংঘাতময় ইউরোপের জীবনধারার ইতিহাস। জন ক্রিস্টফারের জন্যই রোমাঁ রোলাঁ্যা ১৯২৫ সনে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

রোমাঁ রোলাঁ্যা ছিলেন এক আদর্শবাদী মানুষ। বিশ্বজোড়া মানুষের সমাজ যে ভাই-এরই সমাজ, একথা তিনি অনুভব করিতেন, প্রচার করিতেন এবং এরই জন্য তিনি জীবনপণ করিয়া লড়িয়াছেন। বস্তু-সর্বস্ব, শোষণধর্মী ইউরোপীয় সভ্যতার ছিলেন তিনি কঠোর সমালোচক। তিনি ক্ষমাহীন ভাষায় বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার স্বরূপ পৃথিবীবাসীর নিকট উদঘাটিত করিয়া দিয়াছিলেন।

আলোচনা : *পরলোকে রোমাঁ রোলাঁ্যা*
১৭শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫০ (১৯৪৩)

সমাজ-সাহিত্য বিতর্ক

"আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, রাজনৈতিক কিংবা সামাজিক বিচার-বিবেচনা যেন আমাদের সাহিত্য বা কৃষ্টি-সাধনাকে সাম্প্রদায়িক, সংকীর্ণ বা ব্যাহত না করে।" -সম্প্রতি লিখিত একটি প্রবন্ধে আবুল হাসানাৎ সাহেব এই আরজ পেশ করেছেন।

আবুল হাসানাৎ সাহেব সাহিত্যের শাহীতখ্‌তের দাবিদার নন।...তিনি সাহিত্যসেবক পদের উমেদার। নিজের পরিচয়ে তিনি বলেছেন, "আমি সাহিত্যসেবক।"-অর্থাৎ তিনি সাহিত্যস্রষ্টা নন। কিন্তু এই পরিচয়ে তাঁর গৌরব ক্ষুণ্ন হবার কথা নয়। শুনেছি, তিনি জেলা পুলিশ সাহেব। ইংরেজ-রাজসরকারের ওটা বড় চাকরি। বাংলার মুসলিম সমাজে ছোট বড় সবাই যে-যুগে য়্যাংলো-মুসলিম বনে যেতে ফেদা, সেই যুগে একজন বড় পুলিশ সাহেব নিজেকে বাংলা সাহিত্যের সেবক বলতে গৌরব অনুভব করছেন, এ শুধু তাজ্জবের কথা নয়, আশার কথাও বটে।

বাংলার এই আজব চীজ 'য়্যাংলো-মুসলিম' শ্রেণীর চোখে বাংলা সাহিত্যসেবী "লোফার" অথবা কৃপার পাত্র আর "Bengali journalism is a begger's profession"—

www.pathagar.com

আমার এই উক্তির মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই। "মুসলমান সমাজে কতকগুলো অক্ষম ও অনুপযুক্ত লোক বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেন" বলে যাঁরা আজ অনুযোগ করেন, তাঁদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে, এ অবস্থার জন্য দায়ী অক্ষম ও অনুপযুক্ত লোকগুলো নয়, দায়ী তাঁরাই, যাঁরা সক্ষম হয়েও দায় এড়িয়ে সরে পড়েছেন।

কাজী মোহাম্মদ ইদ্‌রিস : *সাহিত্যসেবীর বিপদ*
১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫০ (১৯৪৩)

দুর্দশার কারণ

পাকিস্তান আজ ভারতীয় মুসলমানের ভরসা ও লক্ষ্যবস্তু। সমগ্র মুসলিম জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষা আজ পাকিস্তানের নিবদ্ধ। নিখিল ভারতীয় মুসলিমগণ আজ যেরূপভাবে তাহাদের লক্ষ্য একটিমাত্র নির্দিষ্ট গতিপথে একমাত্র কায়েদে-আজমের অধীনে কেন্দ্রীভূত করিতে পারিয়াছে, তাহাতে তাহাদের ইপ্সিত বস্তু লাভ না হইয়াই যায় না। এই একতার বাঁধনে তাহাদের সফলতার বুনিয়াদকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে।

এই পাকিস্তানে মুসলমানের জন্য নিহিত আছে অনন্ত সম্ভাবনার বীজ। তাহা ফুটিয়া উঠিবে তাহাদের জাতীয় শিক্ষায়, কৃষ্টিতে এবং ঐতিহ্যে। বস্তুতঃ ইহাই হইল মুসলমানের প্রাথমিক প্রয়োজন। ইহা হইতে বঞ্চিত হইযাই আজ তাঁহাদের এই দুর্দশা।

আবুল মালেক বি.এ. : *পাকিস্তান ও মুসলমানের শিক্ষাব্যবস্থা*
১৭শ বর্ষ,৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫০ (১৯৪৩)

জাতীয়তাবাদ ও ফ্যাসিবাদ

জাতীয়তাবাদের আদর্শ জাতীয় একত্ববাদ। দেশের এবং জাতির মঙ্গলের জন্য সর্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকার করাই হইল জাতীয়তাবাদের মূলনীতি। জাতীয়তাবাদের উন্নতির চরম সীমা হইল ফ্যাসিবাদ। এই জাতীয়তাবাদ বনাম ফ্যাসিবাদের দোহাই দিয়াই আজ বিশ্বব্যাপী জনগণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যুদ্ধের তাণ্ডবলীলা চলিতেছে। ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জাতীয়তাবাদের প্রতি নজর করিলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, জাতীয়তাবাদের প্রতি স্তরেই ফ্যাসিবাদের বীজাণু রহিয়াছে। বৈপ্লবিক ধারণা সমন্বয় জাতীয়তাবাদের আবির্ভাব গোড়াতে হইলেও অন্তিমে ইহা প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রতি-বিপ্লবী আন্দোলনে পরিণত হয়, -ইহাই জাতীয়তাবাদের স্বভাবধর্ম।

দেশের মুক্তি-সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদের প্রয়োজন হইলেও বহিঃশত্রু বিতাড়িত হইবার পর এই জাতীয়তাবাদ হয় বিভীষিকাময়। সাধারণতঃ দেখা যায় একবার একটি আদর্শবাদ জনসাধারণের অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে তাহার মূলোৎপাটন করা মোটেই সহজ নহে। আজ হয়ত বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

www.pathagar.com

পরিচালনা করিবার জন্য ভারতীয় জাতীয়তাবাদের কিছুটা প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু আমাদের ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এই জাতীয় একত্ববাদের জোরালো মতই ফ্যাসিবাদের মৌলিক শিক্ষা। এই ফ্যাসিবাদ আজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়িতেছে না, বরং ইহা দুনিয়ার সর্বহারা জনগণের স্বাধীনতা হরণ ও তাহাদের স্বার্থ পদদলিত করার উদ্দেশ্যেই আজ দেশের পর দেশে অত্যাচারের নির্মম অভিযান চালনা করিয়া দুনিয়া গ্রাস করিতে উদ্যত। এইরূপ একজাতিত্বের পূজারীরাই আজ স্বদেশের আভ্যন্তরীণ সর্বপ্রকার প্রগতিশীল বাহিনীকে দমননীতির সাহায্যে অংকুরে বিনষ্ট করিতে মোটেই ত্রুটি করিতেছে না।

ফ্যাসিবাদের দর্শন গণতন্ত্রবাদের সম্পূর্ণ বিপরীত। দুনিয়ার সকল মানুষ পরস্পর সমান নহে; বিধাতা নির্বাচিত কতিপয় মানুষই দুনিয়া শাসন করিবে; আর সকল মানুষ তাহাদের অভিপ্রায় মানিয়া লইয়া তৃপ্ত থাকিবে—ইহাই ফ্যাসিবাদের মূলনীতি। ফ্যাসিবাদের প্রবর্তক জার্মান দার্শনিক নিটশে বলিতেন,—ধনিক ও সমাজ প্রভুরাই বিধাতার নির্বাচিত নায়ক। সুতরাং তাহারাই দেশ শাসন করিবে এবং তাহা হইলেই ধনিক ও অভিজাত সম্প্রদায়ের ইচ্ছানুযায়ী দেশের বাকি সকলের জীবন নিয়ন্ত্রিত হইবে। তাহা হইলে সকলেই ইচ্ছা ও কর্মধারা এক হইয়া 'জাতি'কে বলীয়ান করিবে।

জাতীয় অথবা জাতির সমবেত স্বার্থই সর্বোচ্চ স্বার্থ—ইহাই জাতীয়তাবাদের আদর্শ। 'জাতি' বলিতে যদি ধনিক ও অভিজাতশ্রেণীর মুষ্টিমেয় কয়েকজনকে বুঝায়, তবে এই জাতীয় সমৃদ্ধির যত কিছু অর্জিত হইবে সেই সব কিছু 'বিধাতা-নির্বাচিত' কয়েকজন ধনিকের ভাগ্যেই পড়িবে। যেই সর্বহারা গরিষ্ঠদল—যাহারা অনাহারে ও অর্দ্ধাহারে মৃত্যু আলিঙ্গন করিতেছে, সেই হতভাগাদের ভাগ্যে কিছুই পড়িবে না। জাতির নামে, দেশের নামে, দেশের কল্যাণের নামে বিলাইয়া দেওয়ার বেলায় কেবল এই হতভাগারা। এই জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়াই আজ জার্মানী, ইটালী ও জাপানে কোটি কোটি জনগণের উপর দমননীতি, অবিচার ও অনাচারের নির্মম অভিযান চলিতেছে। এই সমস্ত দেশে আজ জাতীর নামে কোটি কোটি মানবসন্তানকে গোলাবারুদের সম্মুখে নিক্ষেপ করা হইতেছে। কিন্তু তাহাদের অবস্থার উন্নতি মোটেই পরিলক্ষিত হইতেছে না। ইহাদের জীবনোৎসর্গে মাত্র কয়েকজন ধনিক ও কলের মালিক—যাহারা জাতির প্রতিনিধিত্ব করিবার দাবি করিতেছে তাহাদেরই পরমোন্নতি হইতেছে। বাকি শতকরা নব্বইজন গরীবের কোনই উপকার হইতেছে না। জাতির নামে এইরূপ উৎসর্গে শতকরা দশজনের অট্টালিকার চূড়া উচ্চ হইতে উচ্চতর হইতেছে; পক্ষান্তরে বাকি নব্বইজনের পর্ণকুটিরেরও সংস্থান হইতেছেনা।

ওবায়দুল্লাহ রওশনাবাদী : *জাতীয়তাবাদের স্বরূপ*
১৭শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫০ (১৯৪৩)

www.pathagar.com

কায়কোবাদ - সংবর্ধনা

সম্বর্দ্ধনাপত্র

কবিবর, যে যুগে আমরা পরানুকরণ করিয়া বাঁচিবার সাধনা করিয়াছিলাম, সেই যুগেই তোমার অভ্যুদয়। তুমি আমাদের মধ্যে প্রাণসঞ্জীবন করিয়াছিলে, সঙ্কট-মুহূর্তে আমাদের শিরে পরাইয়াছিলে জয়ের মুকুট। আশাহীন দিনগুলি নূতন চেতনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

গৌরবময় পূর্বকথা ভুলিয়া আমরা গতানুগতিক হইয়াছিলাম, তুমিই প্রথম আমাদের অন্তরে আনিলে ঐতিহাসিক চেতনার উন্মেষ। তোমার 'মহাশ্মশান' কাব্যে মুসলিম গৌরবের শেষ কাহিনী ভাস্বর হইয়া আছে। তোমার 'মহরম শরীফ' আমাদের পাষাণ-কঠিন হৃদয়েও করুণার প্রস্রবণ প্রবাহিত করিবে।

বাংলা সাহিত্যে মহাকাব্য স্রষ্টাদের মধ্যে তোমার আসন অক্ষয় হইয়া থাকিবে। তোমার পূর্বগামীদের সঙ্গে তোমার পার্থক্য এই যে, তাঁহারা লিখিয়াছিলেন দেবতাদের কথা তাঁহারা অন্বেষণ করিয়াছিলেন অপৌরুষের বাণী; আর তুমি লিখিয়াছ ধরণীনিবাসী মানুষের কথা। সুখ-দুঃখ-সম্বলিত, হাহাকার-আনন্দ-উদ্বেলিত বিচিত্র জীবনের সকল কাহিনী তোমার তুলির আখরে স্বর্ণাভ হইয়া রহিয়াছে।

তোমার দিকে চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের অন্ত নাই। অন্ধকার যুগে মুসলমান সাহিত্যিকদের জন্য তুমি নূতন পথনির্দেশের বাণী আনিয়াছিলে।

যুগে যুগে নূতন সাহিত্য-ব্রতীদের মনে তোমার কবি-জীবন যেন উৎসাহের অক্ষয় উৎস হিসাবে বর্তমান থাকে, ইহাই আমাদের শেষ প্রার্থনা।

তোমার গুণমুগ্ধ—

১৯ শে মার্চ, ১৯৪৪ পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদের

সদস্য ও সদস্যাগণ

কায়কোবাদ - সম্বর্দ্ধনা : *ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য-সংসদ*

১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫১ (১৯৪৪)

কবির বক্তব্য

চিরদিন অপরের কথা শুনিয়া আমরা নিজেদের পরিচয় ভুলিয়া গিয়াছিলাম, একবার চেষ্টা করিয়া দেখা গেল আমাদের ভাণ্ডে পরিচয় দিবার উপযোগী অমূল্যরত্ন যথেষ্ট রহিয়াছে। এতদিন শুধু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পরের নিকট হাত পাতিয়াছি। এইভাবে প্রতিনিয়ত অকল্যাণ ও সর্বনাশের পথে অগ্রসর হইতেছিলাম। এই অকল্যাণ হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য যাহারা চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই সাধুবাদ পাইবার যোগ্য। আমরা

www.pathagar.com

গুটিকয়েক দীন সাহিত্যসেবক যথেষ্ট অক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও খোদাতালার অনুগ্রহে এই কাব্যে হাত দিয়াছিলাম। জয়যুক্ত হইয়াছিলাম কিনা তাহা আপনারা বিচার করিবেন।

কায়কোবাদ - সম্বর্দ্ধনা
কায়কোবাদ : কবির উত্তর
১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫১ (১৯৪৪)

মুসলিম কৃষক ও জমিদার-মহাজন

বাংলাদেশের মুসলিম কৃষক জমিদার ও মহাজনের অত্যাচারের মরণোন্মুখ হইয়া পড়িয়াছে। একদিন রাশিয়াতে এইরূপ দুরবস্থার সৃষ্টি হইলে রুশ সাহিত্যিকগণ যাহা করিয়াছিলেন—টলস্টয়, টুর্গেনেভ, গোর্কি প্রভৃতি যাহা করিয়াছিলেন—শক্তি থাকিলে আপনারাও সেইরূপ করুন। জারের সিংহাসন যদি ও-সব বিশ্ববরেণ্য সাহিত্যিকদের রচনার ফলে ধূলায় লুটাইতে পারে, তবে আপনাদের শক্তি থাকিলে আপনারাও এদেশের জমিদার ও মহাজনদের অত্যাচার কাহিনী আপনাদের রচনায় ফুটাইয়া তুলিয়া উহার অবসান ঘটাইতে পারেন। দুঃখের বিষয়, আমাদের কঙ্কালসার কাঙ্গাল কৃষকদের এই দুরবস্থার কাহিনী আমরা অনুসন্ধান করিয়া বাহির করি নাই।

সৈয়দ এমদাদ আলী : *জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ*
১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫১ (১৯৪৪)

ঐতিহাসিক সাহিত্য ও ইতিহাস চেতনা

ঐতিহাসিক সাহিত্য রচনার প্রতি আমাদের তেমন আগ্রহ দেখা যায় না। কিন্তু আমাদের সব কিছুকে আবার নির্দিষ্ট পথে সুপরিচালিত করিতে হইলে ইতিহাসের আলোচনা আমাদের পক্ষে ফরজ। কোনো পতিত জাতি নিজের উত্থান ও পতনের ইতিহাস না জানিলে, জগতের সকল জাতির উত্থান ও পতনের ইতিহাস তাহার জানা না থাকিলে তাহার পুনরুত্থান অসম্ভব। আমি আমাদের তরুণ সাহিত্যিকদের ঐতিহাসিক সাহিত্য সৃষ্টির জন্য একান্তভাবে অনুরোধ জানাইতেছি।

এ পর্যন্ত আমরা মুসলিম বাংলার জাতীয় ইতিহাসও রচনা করিতে পারি নাই। এক্ষেত্রে বিশেষ সাধনার দরকার। হিন্দু বাংলা তাঁহাদের জাতীয় ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। আপনারা জানেন সে জন্য তাঁহারা কি অপরিসীম অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন। আমাদের ইতিহাস রচনার জন্য মাল-মসলার অভাব নাই, অভাব কেবল সাহিত্য সাধকের। সেই অভাব আপনারা পূরণ করিয়া জাতির মহদুপকার সাধন করুন। সাহিত্যের নানা বিভাগে আপনাদের সাধনা বিস্তার লাভ করুক।

ঢাকা পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ : দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন
সৈয়দ এমদাদ আলী : জাতীয় সাহিত্যের স্বরূপ
১৭শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫১ (১৯৪৪)

www.pathagar.com

দুর্ভিক্ষের কারণ

গত ১৯৪৩ সালে আমাদের এই শস্যশ্যামলা বাংলাদেশ যে দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে প্রাণ হারাইয়াছে তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে প্রথমতঃ মহাসমরের অজুহাতই মনে জাগে। দ্বিতীয় গুরুত্ব আরোপিত হয় বাংলাদেশে খাদ্য শস্যের প্রয়োজনের চেয়ে ন্যূনতর উৎপাদনের উপর। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সঠিক তথ্য আবিষ্কার করিতে গেলে ইহাদের আনুসংগিক আরও অনেকগুলি কারণের কথাই মনে জাগে। ধনতান্ত্রিক যুগে দেশের শাসনব্যবস্থা, গভর্ণমেন্টের বাণিজ্যনীতি, মুদ্রানীতি ও খাদ্যশস্য বন্টন ও জোগান ব্যবস্থাও ইহার জন্য প্রায় সমান দায়ী। .

চিন্তাধারা
রওশন ইজদানী : *বাংলা দুর্ভিক্ষের কারণ ও তাহার প্রতিকার*
১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ (১৯৪৪)

দুর্ভিক্ষে মৃতের সংখ্যা ৩৫ লক্ষাধিক

বাংলার বক্ষের উপর দিয়া ১৯৪৩ সনে যে মহা দুর্ভিক্ষের তাণ্ডব লীলা চলিয়া গিয়াছে, কিছুদিন পূর্বে সেই বিষয়ে কাগজে একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে—"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক ১০টা জেলায় তথ্যানুসন্ধান কার্য চালান হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৮টি জেলার তথ্য সংগ্রহ শেষ হইয়াছে। এ সম্পর্কে উক্ত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মিঃ কে. পি. চট্টোপাধ্যায় মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, স্বাভাবিক সময়ে বাংলার মৃত্যু হার বৎসরে হাজার করা ৩০; কিন্তু নমুনা হিসাবে যে তথ্যানুসন্ধান কার্য চালান হইয়াছে তাহাতে দেখা গিয়াছে যে, এই মৃত্যুর হার বৃদ্ধি পাইয়া হাজার করা ৮৫ পর্যন্ত উঠিয়াছে। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে বাংলায় কমবেশি দুই তৃতীয়াংশ অধিবাসী দুর্ভিক্ষের প্রকোপ ভোগ করিয়াছে বরিয়া উল্লেখ করিলে তাহা অতিশয়োক্তি হইবে না। সেই হিসাবে স্বাভাবিক অপেক্ষা সম্ভাব্য মৃত্যুর সংখ্যা ৩৫ লক্ষের অধিক বলিয়া ধরা যায়। শিশু মৃত্যুর হারই বেশি। উহা স্থলবিশেষে সমগ্র মৃত্যু সংখ্যার শতকরা ৩০ হইতে ৫০ ভাগ। বয়স্কা স্ত্রীলোকের তুলনায় বয়স্ক পুরুষের মৃত্যু হার অনেক বেশি।" সরকারি হিসাবে দেখা যায় যে, বাংলার এই গত দুর্ভিক্ষে ৬ লক্ষ ৭৯ হাজার নরনারী অনশনে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে। ইহা বাস্তবিকই বাংলার ও বাংগালির কলংক।

চিন্তাধারা
রওশন ইজদানী : *বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণ ও তাহার প্রতিকার*
১৭শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫১ (১৯৪৪)

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্য ও বাংলার সমাজ

সাহিত্যে জাতির ও সমাজের জীবন প্রতিফলিত হয়। লোকে কেন প্রত্যাশা করিবে না যে, বাংলা সাহিত্যেও বাংলার জাতীয় ও সামাজিক জীবন প্রতিফলিত হইয়াছে? বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে গণ্য, জগতের আধুনিক বর্ধিষ্ণু ও প্রগতিশীল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে বাংলা সাহিত্য অন্যতম : আর কোনোদিকে না হউক, অন্ততঃ সাহিত্যরস আস্বাদনের ক্ষেত্রে কালা-গোরার পার্থক্য পাতলা হইয়া আসিয়াছে; আজ গোরা জাতি কালো বাঙ্গালিকে ঘৃণা করিতে পারে, কিন্তু তার সাহিত্যকে অবহেলা করিতে পারে না। বাঙালি জীবনের সহিত অপরিচিত কোনো অভারতীয় যদি আজ বাংলা সাহিত্যের রস আস্বাদনে ইচ্ছুক হয় এবং বাংলা সাহিত্যেরই মধ্য দিয়া বাংলার সামাজিক ও জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি ধারণায় উপনীত হইতে চায়, তবে আমাদের মনে এই একটা কৌতূহলী প্রশ্ন জাগে : বাঙালি জীবন সম্বন্ধে কেমন ধারণা তার মনে গড়িয়া উঠিবে? তার এই ধারণা হইবে যে, বাংলায় একটা জাতি বাস করে এবং সে জাতি হইল হিন্দু জাতি। সেখানে মুসলমান বলিয়া এক ধরনের জীব আছে বটে কিন্তু তারা আর্দালীর জাতি, পাচকের জাতি; যখন কোন বিলাত ফেরত অথবা উগ্র আধুনিকপন্থী হিন্দু তার সমাজকে টেক্কা মারিয়া চলিতে চায় অথবা সমাজ তাকে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন সেই মহাপুরুষের চা-টা তৈয়ার করিবার জন্য ডিমটা সিদ্ধ করিবার জন্য কিংবা মুরগীটা রাঁধিবার জন্য তার ডাক পড়ে।

মোহাম্মদ আবদুল হক : *সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা*
১৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫১ (১৯৪৪)

নজরুল : জাতীয় কবি

কবি কাজী নজরুল ইসলামকে পূর্ব পাকিস্তানের আদি জাতীয় কবি বললে অনেকেই হয়ত বিস্মিত হবেন এবং বলবেন—এ কেমন করে হয়? নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন। তিনি বলেছেন—পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলা ঠিক হয় না, বলা উচিত আল্লা জিন্দাবাদ। সুতরাং নজরুল ইসলামকে পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি বলা যায় না। কিন্তু নজরুল ইসলাম নিজে পাকিস্তানের নিন্দা করুন, আর সমর্থন করুন—আসলে তাঁর লেখায় যাকে বলা হয় পাকিস্তানবাদ, তাবই জয়গান ঘোষিত হয়েছে। মুখের নিন্দা এবং প্রকৃত কাজের ভিতর এরূপ ব্যবধান থাকা বিচিত্র হলেও অসম্ভব কিছু নয়। বিখ্যাত ইংরাজ কবি শেলী ছিলেন নাস্তিক। তিনি তাঁর নাস্তিকতা বড় গলায় প্রচার করেও আনন্দ পেতেন কিন্তু শেলী সম্বন্ধে বলা হত—খ্রিষ্টের পর এত বড় ক্রিস্টান বড় একটা দেখা যায় না। আদর্শবাদী শেলীর মর্মের যে কথা তাঁর কাব্যে ধরা দিয়েছে, তাতে রয়েছে সত্যিকার খ্রিষ্টানোচিত স্বাপ্নিক মনের পরিচয়। এ পরিচয়কে ভুল বোঝবার কোনো উপায় নেই। নজরুল ইসলাম সম্বন্ধেও একথা খাটে। নজরুল ইসলাম তাঁর সাংবাদিক ও রাজনৈতিক জীবনের তাগিদে যে কথা বলেছেন, সেখানে তাঁর বড় পরিচয় মিলে না। কবির পরিচয় তাঁর কাব্যেই ভাল করে

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। নজরুল ইসলাম তাই সব চাইতে ভাল করে ধরা দিয়েছেন তাঁর গানে ও কবিতায়।

মুজীবর রহমান খাঁ : *পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় কবি*
১৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫১ (১৯৪৪)

বঙ্কিম-বিতর্ক

আনন্দমঠ নাকি বাঙ্গালির তথা ভারতবাসীর মুক্তি আন্দোলনের উৎস। বাঙ্গালি নাকি আনন্দমঠ হইতে জাতীয়তার পয়লা ছবক শিখিয়াছে। তাই ত আনন্দমঠের বিদ্রোহী সন্তানদের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত "বন্দেমাতরম" সারা ভারতের (অবশ্য হিন্দু ভারতের) জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদা পাইয়াছে। মুসলমানেরা বন্দেমাতরমকে জাতীয় সঙ্গীতরূপে স্বীকার করে নাই। ইহার ফলে কত কি যে কাণ্ড ঘটিয়াছে, তাহার তিক্ত ইতিহাস আজো মলিন হয় নাই এবং তাহার জেরও মিটে নাই। মুসলমানেরা আনন্দমঠকে সুনজরে দেখিতে পারে নাই এবং এই কারণে তাহাদের উপর যথেষ্ট কটূক্তি বর্ষিত হইয়াছে। কিন্তু কেন দেখে নাই বা দেখিতে পারে না, সে কথাটা আমাদের হিন্দু-ভ্রাতৃবর্গ মোটেই তলাইয়া দেখিতে চান না। বরং তাহাদের দৃষ্টিতে এই জন্য মুসলমানেরা অপরাধী সাব্যস্ত হইয়াই রহিয়াছে। আজ সর্বপ্রথম একজন হিন্দু ভদ্রলোক অকাট্য যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আনন্দমঠকে নিয়া কোন বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীরই গৌরব করিবার কথা নয়। মুসলমানের ত নহেই।

চিন্তাধারা
মোহাম্মদ আবদুল বারী : *"আনন্দ মঠ কি স্বদেশী গ্রন্থ?"*
১৭শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫১ (১৯৪৪)

আজাদী লাভের সংগ্রাম

আজাদী মানুষের জন্মগত অধিকার। এ অধিকার লাভের জন্য মানুষ দরকার হলে জীবনভর সংগ্রাম করে। আমরাও সংগ্রাম করে চলেছি। কিন্তু এখনো আজাদী আমাদের মিলেনি। আজাদী লাভের সর্বপ্রচেষ্টা আমাদের এ যাবত ব্যর্থতা বহন করেই এসেছে। কিন্তু ব্যর্থ হলেও সে ব্যর্থতার অভিজ্ঞতা আমাদের শিখিয়েছে : আমাদের চেষ্টায় গলদ আছে, আমরা ঠিক পথে সংগ্রাম চালাতে পারিনি—তাই আজাদী আমাদেব থেকে দূরে সরে গেছে। আমরা শিখেছি : স্বকীয়তার উপর দাঁড়ানো ব্যতিরেকে আজাদী মেলে না—পরানুকরণে পরবশতাই শিকড় গেড়ে বসে। অনুকরণে সৃষ্টি সম্ভব নয়—আত্মশক্তির উদ্বোধন ব্যতিরেকে আজাদী লাভ অসম্ভব। আজাদী একটা সৃষ্টি—আজাদী স্বকীয়তা সাপেক্ষ।

আবুল কালাম শামসুদ্দীন : *অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির অভিভাষণ*
১৭শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

www.pathagar.com

পাকিস্তানের গোড়ার কথা

পূর্ব-পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর মর্মকথা বুঝতে হলে 'পাকিস্তান' ও 'রেনেসাঁ' দুটি কথারই তাৎপর্য গওর করে বুঝতে হবে।

পয়লা ধরা যাক 'পাকিস্তানের' কথা। 'পাকিস্তান' মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দাবি। মুসলিম লীগই মুসলিম ভারতের জাতীয় প্রতিষ্ঠান ও মুখপাত্র, এ কথায় যাঁদের সন্দেহ রয়েছে তাঁদেরও নিশ্চয় এটা জানা আছে যে, মুসলিম লীগ ছাড়া আর যেসব রাজনৈতিক দল মুসলমান সমাজে রয়েছে, তাঁরাও প্রকারান্তরে ও ভাষান্তরে পাকিস্তানেরই কথা বলছেন। সুতরাং পাকিস্তান-দাবিকে নিঃসন্দেহে মুসলিম-ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শ বলা যেতে পারে। তবু এই পাকিস্তান নিয়ে রাজনীতিক মহলে তর্কবিতর্কেরও সীমা নেই; রাগারাগি-গালাগালিরও অন্ত নেই। কিন্তু এ হল্লা অস্বাভাবিকও নয়। কারণ এটা একটা নয়া কথা। নতুন যতই দরকারি ও স্বাভাবিক হোক, বিনা প্রতিবাদে বিনা হল্লায় কেউ কখনো তাকে গ্রহণ করেনি।

সংস্কৃতির ব্যাপারটাও এই। মূলতঃ শুধু হিন্দু-মুসলিমের নয়, তামাম দুনিয়ার সকল জাতির সংস্কৃতিই এক। তবু জাতিতে-জাতিতে সংস্কৃতিগত পার্থক্য কত সুস্পষ্ট। হরেক জাতির রাজনৈতিক আজাদী নিশ্চয়ই হবে অদূরাগত ভবিষ্যতের যুগবাণী। কিন্তু সে রাজনৈতিক স্বরাজের সার্থকতা হবে জাতির স্বাধীন স্বকীয় নিরঙ্কুশ বিকাশে। এই বিকাশের মর্মবাণীই হচ্ছে তমদ্দুনী আজাদী বা কালচারেল অটনমী। এরই নাম পাকিস্তান। কৃষ্টিগত পরসহিষ্ণুতা পাকিস্তানের বুনিয়াদ। 'লাকুম দিনুকুম ওলিয়াদিন', তোমার ধর্ম তোমার, আমার ধর্ম আমার, কোরআনের এই উদার বাণীই পাকিস্তানের গোড়ার কথা।

আবুল মনসুর আহমদ : *মূল সভাপতির অভিভাষণ*
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

ধর্ম ও সংস্কৃতি

ভারতের হিন্দু ও মুসলমানরা এক জাত নয়, তাদের সংস্কৃতিও এক নয়, এটা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু হিন্দুরা বা মুসলমানরাই কি এক-একটা আস্ত জাত? অথবা তাদের সংস্কৃতি এক-একটা আস্ত কৃষ্টি? তা নয়। আরবি, তুর্কি, ফারসি, আফগানীরা এক মুসলমান হয়েও এক জাত নয়। ইংরাজ ফরাসী ইটালী জার্মান এক খ্রিস্টান হয়েও এক জাত নয়। এদের ধর্ম এক হলেও তমদ্দুন এক নয়। গাছ ও বীজের মধ্যে যা সম্পর্ক, ধর্ম ও সংস্কৃতির সম্পর্কও তাই। ধর্ম থেকেই সংস্কৃতির জন্ম, বীজ থেকেই গাছের জন্ম। গাছের মধ্যেও বীজ রয়েছে; সংস্কৃতির মধ্যেও ধর্ম লুকিয়ে আছে। তবু গাছ ও বীজ এক নয়; ধর্ম ও সংস্কৃতিও এক জিনিস নয়। ধর্ম ভূগোলের সীমা ছাপিয়ে উঠতে পারে; কিন্তু তমদ্দুন ভূগোলের সীমা এড়াতে পারে না। বরঞ্চ সে সীমাকে আশ্রয় করেই সংস্কৃতির পয়দায়েশ। এইখানেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সরহদ্দ। এইখানেই পূর্বপাকিস্তান একটা ভৌগোলিক সত্তা। এই জন্যই

www.pathagar.com

পূর্বপাকিস্তানের বাসিন্দারা ভারতের অন্যান্য জাত থেকে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ধর্মীয় ভ্রাতাদের থেকে একটা স্বতন্ত্র আলাহিদা জাত।

আবুল মনসুর আহমদ : *মূল সভাপতির অভিভাষণ*
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

বাঙালি মুসলমান ও আজাদী লাভের সংগ্রাম

আজও বাংলার সঠিক ও বিস্তৃত ইতিহাস প্রণয়ন করা সম্ভব হলো না, এটা আমাদের পক্ষে কিছু গৌরবের কথা নয়। আমি পূর্বেই বলেছি যে, ভারত সম্রাট Provincial autonomy'র প্রবর্ত্তন করার সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মুসলমানরা বাঙলার শাসনতন্ত্রের কর্ণধার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, বাঙলার আজাদী লাভ কেবল বাঙালি মুসলমানের হাতেই সম্ভব। এজন্য আমি বাংলার এই সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়কে আত্মচেতনাবোধ ও আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্য অন্য মনে সাধনা করতে আহ্বান করি। তাদের বলি, তোমার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাও, তোমার গৌরবোজ্জ্বল মহিমময় পুরাবৃত্তি আলোচনা ও উপলব্ধি করো।

আবদুল মওদুদ : *ইতিহাস শাখার সভাপতির অভিভাষণ*
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১(১৯৪৪)

ভাষা সংস্কারের নমুনা

আমরা বাঙ্গালি। বাংলাই আমাদের মাতৃভাষা। এ যে শুধু বাংলারই সন্তানদের ভাষা তা নয়। আসাম-বিহার-উড়িষ্যারও কোটি কোটি নরনারী আমাদের মতই এ ভাষাতে কথাবারতা বলে ও চিন্তাভাবনা করে আরাম পায়-গৌরব বোধ করে।

'সুজলা-সুফলা শস্যশ্যামলা' বলে বাংলার যে সুনাম এক কালে ছিল তা সত্ত্বেও বাংলার অভাব অনটনের মর্মান্তিক দূরাবস্থার কথা বর্তমানে সারা দুনিয়া জেনেছে; এর মধ্যেও সাহিত্যের চর্চা বা কৃষ্টির আলোচনা করতে যে বাঙালি আগুয়ান এ তার মনের সবলতারই পরিচয় দেয়। 'আজ বাঙালি যা ভাবে কাল সারা ভারত তা ভাবে' বলে যে কথা রয়েছে তা যে মিথ্যে নয় এ বলে বাঙালি দাবি করতে পারে। ভারতরাজ্যে বাঙগালির আধিপত্য সারা ভারতে সর্ববিদিত। আজকের অনুষ্ঠান, এর বিভিন্ন অধিবেশন বাঙগালির মনে সাড়া দিক নাড়া দিক, এর প্রভাব স্থায়ী হোক—এই আশা রেখে এখন আলোচনা শুরু করা যাক।

আবুল হাসানাৎ : *ভাষাবিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ*
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

www.pathagar.com

সর্বজনীন শিক্ষা

... সেই জন্যে ইংরেজি শিখে যারা বিশিষ্টতা পেয়েছেন তাদের মনের মিল হয় না সর্বসাধারণের সঙ্গে, দেশে সকলের চেয়ে বড়ো জাতিভেদ এইখানেই, শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা।

যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, যেমন সমাজজীবনে, তেমনি শিক্ষার ব্যাপারেও তরুণ বাঙ্গলার কর্তব্য 'জাতিভেদ'—'শ্রেণীতে শ্রেণীতে অস্পৃশ্যতা' দূর করা; –'তীর্থের পাণ্ডার' অধিকার থেকে মুক্ত করে শিক্ষাকে সর্বজনীন দেশের অভিমুখে প্রবাহিত করা।

জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা দূর করবার ব্যাপারে এদেশে যেসব মতবাদ সবচেয়ে বেশি কার্যকরী হয়েছে তার মধ্যে সকলের আগে উল্লেখ করতে হয় ইসলামের নাম। ইসলামের তওহীদ, ইসলামের সমাজব্যবস্থা, ইসলামের মুক্তবুদ্ধি ইউরোপের চিন্তায় বিপ্লব ঘটিয়েছে যার ফলে জন্ম নিয়েছে বর্তমান মহাসভ্যতা।

মুহম্মদ হাবীবুল্লাহ (বাহার) : *শিক্ষা-বিজ্ঞান শাখার সভাপতির অভিভাষণ*
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি : পল্লী সংস্কৃতি

বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি বলতে এই নাগরিক কালচার বোঝায় না। ইংরেজ বিজয়ের পরবর্তী যুগে এই কালচারের অভ্যুদয়। ইংরেজ বিজয়ের আগে এর অস্তিত্ব ছিল না, এবং বাংলার জনজীবনের মধ্যে থেকেও এর জন্ম নয়। বাংলার নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল, যার পরিচয় আজ জানবার বিশেষ প্রয়োজন ঘটেছে। এই সংস্কৃতির একটা ইতিহাস আছে। ইংরেজ বিজয়ের পরেও কিছুকাল বাংলার পল্লীতে এর পরিবেশন চলেছে। কিন্তু দেশের জনগণের সঙ্গে সম্পর্কহীন শাসকদের শাসনব্যবস্থায় পল্লীর কোনো কদর কোনো মর্যাদা নাই। তাই তাদের শাসনব্যবস্থার দৌলতে বাংলার সংস্কৃতি অনাদৃত পল্লীর কোলে অনাদরের মধ্যে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

বাংলার এই সংস্কৃতি পল্লী-সংস্কৃতি। পল্লীজীবন তথা পল্লীর কৃষক-জীবনের উৎস থেকেই এই সংস্কৃতির মুঞ্জরণ। বাংলার শিল্প, বাংলার সঙ্গীত এই পল্লীসংস্কৃতিরই অন্তর্গত। বাংলার নিরক্ষর কৃষকেরাই এই শিল্প-সঙ্গীতের রচয়িতা। পূর্ব বাংলা ও উত্তর বাংলাতেই এই সংস্কৃতির সমৃদ্ধ বিকাশ।

মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য : *শিল্প ও সঙ্গীত শাখার সভাপতির অভিভাষণ*
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

আজাদ ও রেনেসাঁ সোসাইটি

পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সম্মিলনীর অধিবেশন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মাত্র কয়েক মাস পূর্বে আমার নওজোয়ান ভাই জনাব মুজিবর রহমান খাঁ, জনাব আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও

www.pathagar.com

জনাব খায়রুল আনাম খাঁ ছাহেবানের নেতৃত্বে 'আজাদ' দফতরে যে পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি গঠন করা হয়, তাহা ইতিমধ্যেই ভারতের চিন্তাজগতে এক ইনকেলাব আনয়ন করিয়াছে। এই রেনেসাঁ সম্মিলনীই বোধহয় ভারতে এইরূপ একটি সর্বপ্রথম তামদ্দুনিক প্রতিষ্ঠান। কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিকেরাই দুনিয়ার সবযুগে ও সবদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের অগ্রদূত। বাস্তবিকই অদূর ভবিষ্যতে ভারতে পাকিস্তানের ইতিহাস যখন লিখিত হইবে, তখন মোছলেম ভারতের এই নব জাগরণে আজাদ ও রেনেসাঁ সমিতির কথা সোনার হরফে লিখিত থাকিবে। এইরূপ একটি ঐতিহাসিক সম্মিলনীর উদ্বোধনের জন্য সিলেটের সুদূর এক গ্রাম হইতে আনিয়া অভ্যর্থনা সমিতি আমার মত নগণ্য লোকের মাথায় ইজ্জতের তাজ পরাইয়া দিলেন, তজ্জন্যে আমি আন্তরিক শুকরিয়া জানাইতেছি।

দেওয়ান আহবাব চৌধুরী : উদ্বোধন বক্তৃতা
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

অন্ধকার যুগ : ১৭৫৭-১৯০৬

আমাদের পাকিস্তানের ইতহাসের মধ্যে ভারতীয় মোছলেমের উত্থান-পতনের করুণ কাহিনী নিহিত আছে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ হইতে ১৯০৬ সনের এই দেড়শত বৎসরকে আমাদের পতনের অন্ধকার যুগ বলা যাইতে পারে। পলাশীর যুদ্ধ ও সিপাহী বিদ্রোহের পরাজয়ের পর মুসলমান নিজের খুদীকে (self) হারাইয়া ফেলিলেন। প্রতিবেশী ভারতীয় হিন্দু ও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর চাপে কেবল শাসনক্ষেত্রে নহে, রাজনীতি, শিক্ষা, কালচার ও অর্থনীতি প্রভৃতির কোথাও মুসলমানেরা টিকিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই সুযোগে ভারতীয় বর্ণহিন্দু সম্প্রদায় নবাগত ইংরেজ বন্ধুর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়া শাসনতন্ত্রের সব কলকব্জা দখল করিয়া ভারতে একটি Intermediate Ruling Race-এ পরিণত হইলেন।

দেওয়ান আহবাব চৌধুরী : উদ্বোধন বক্তৃতা
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

কলকাতার পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির প্রভাব

আমাদের সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পরই ঢাকার পূর্বপাকিস্তান সাহিত্য সংসদ গঠিত হয়। বাংলা ও আসামের বহু স্থান হতে পূর্বপাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি বা অনুরূপ নাম দিয়ে নূতন নূতন সমিতি গঠনের সংবাদ আমরা পাই। তাদের মধ্যে অনেকগুলির কাজ এখন ভাল ভাবেই চলছে। এসব সমিতির অনেকগুলি আমাদের নিকট মনোনয়ন লাভের জন্যও আবেদন করেছিলেন। কিন্তু আমরা এখনও এভাবে বাংলা ও আসামকে সংগঠন করার

www.pathagar.com

দায়িত্ব গ্রহণ করতে সাহস করি নাই। ইনশা আল্লাহ শক্তি ও সুযোগ মত আমরা এ কাজে আস্তে আস্তে হাত দিব।

মুজিবুর রহমান খাঁ, কনভেনর : *পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি কার্যবিবরণী*
১৭শ বর্ষ, ১০ম ও ১১শ সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩৫১ (১৯৪৪)

হিটলার-মুসোলিনীর মৃত্যু

১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাস বিশ্বের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হিসেবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। কারণ এই দুই মাসে যথাক্রমে মুসোলিনী ও হিটলার—বর্তমান জগতের দুইজন শ্রেষ্ঠ রণ-পিপাসু, শ্রেষ্ঠ সংগঠক ও দুনিয়ার শান্তি ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠ দুশমনের মৃত্যু ঘটেছে। হিটলারের মৃত্যু স্বাভাবিকতার পর্যায় ছাড়িয়ে বেশি উর্ধ্বে উঠতে পারেনি; কারণ কেউ বলেন, তিনি আত্মহত্যা করেছেন, কেউ বলেন, বার্লিন রক্ষার জন্য যুদ্ধ করতে তিনি প্রাণ দিয়েছেন, আবার কেউ বলেন, তাঁর মৃগীর ব্যারামটি তাঁর মৃত্যুর কারণ। আবার কোনো কোনো মহলের অভিমত এই যে, তিনি মোটেই মরেননি। তবে মোটের উপর ওয়াকেফহাল মহলের অভিমত এই যে, হিটলারের যে মৃত্যু হয়েছে তাতে সন্দেহ করার কোন কারণ নেই। তবে তাঁর মৃত্যুর যে কয়টি কারণ দেখান হল, তার মধ্যে অস্বাভাবিকতা বিশেষ কিছু নেই। তবে মুসোলিনীর মৃত্যু সাধারণ পর্যায়ের নয়। যে মুসোলিনী একদিন পতিত, পশ্চাদপদ ইতালীর জাতি ও ইতালীয় সাম্রাজ্যকে অবসাদ ও নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন, পপোলো দ্য ইতালীয়ার সম্পাদকের লেখনী ছেড়ে তরবারী ধরেছিলেন জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে; জাতিকে ভুল পথে পরিচালিত করার ফল তাঁকে অদ্ভুত রকমে পেতে হল। তাঁর দেশবাসীই তাঁকে হত্যা করলো। জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা হলেই যে তাকে ভুল পথে চালাবার অধিকার তাঁর আছে—এ ধারণা মুসোলিনী জীবন দিয়ে ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন। ইতালীর জনগণকে রোমক সাম্রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠার প্রলোভন দেখিয়ে যে দুঃখভোগের মধ্যে টেনে আনা হয়েছিল, তার ফল ফললো মুসোলিনীর মৃত্যুর রূপ নিয়ে। তাঁর দেশবাসী প্রকাশ্যভাবে তাঁকে এবং তাঁর অনুচরদের হত্যা করে ফ্যাসিস্ট জুলুমের অদ্ভুত প্রতিশোধ নিয়েছে। একজন রাষ্ট্রনায়কের সাধারণ দস্যু-তস্করের ন্যায় এই মৃত্যু জগতের ইতিহাসের একটি বিস্ময়কর ঘটনা হয়ে থাকলো।

মোহাম্মদ মোদাব্বের : *বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতি*
১৮শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫২ (১৯৪৫)

মন্বন্তরের বিষক্রিয়া : ম্যালেরিয়া

বৎসরের পর বৎসর ধরিয়া বাংলাদেশের উপর ম্যালেরিয়ার যে একাধিপত্য চলিতেছে তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফলে আমরা দেখিতে পাইতেছি কেমন করিয়া সমগ্র দেশ বিরাণ হইয়া যাইতেছে। মন্বন্তর-ক্লিষ্ট জাতির উপরে সেই চাপ এত মারাত্মক হইয়া পড়িয়াছে যে, তার

www.pathagar.com

প্রকোপ সহ্য করার মত শক্তি বাঙ্গালির আর একটুও অবশিষ্ট নাই। লক্ষ লক্ষ লোক এই ব্যাধির প্রকোপে পড়িয়া চরম অসহায় অবস্থায় মওতের কোলে ঢলিয়া পড়িতেছে। অবশ্য এই মৃত্যু অপমৃত্যুরই সামিল।

গত মন্বন্তরের মর্মান্তিক পেষণে অস্থিচর্মসার বাঙ্গালির রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই বিনষ্ট হইয়াছে। এই যুদ্ধাবস্থার মধ্যে ম্যালেরিয়া দমনের শ্রেষ্ঠ ঔষধ কুইনাইনের অভাব যে কি ভীষণ পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে তাহা ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন। সম্প্রতি ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিলের সভাপতি ডাঃ বি. সি. রায় কুইনাইনের অভাব এবং ম্যালেরিয়ার আসন্ন প্রাকোপ সম্বন্ধে দেশবাসীকে সজাগ করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে আমলাতন্ত্রের সর্বময় কর্তৃত্ব সেখানে এই হুশিয়ারী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে, কিনা অচিরেই আমরা তাহা দেখিতে পাইব।

আলোচনা
ম্যালেরিয়া ও বাংলাদেশ
১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫২ (১৯৪৫)

দুর্নীতি

সারাদেশ জুড়িয়া দুর্নীতির যে কলুষিত স্রোত বহিতেছে তার বিষাক্ত আবেষ্টনী হইতে অব্যাহতি পাওয়া বর্তমানে অসম্ভবের পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। সরকারি ও বেসরকারি আম ও খাস কেহই বাদ যাইতেছে না। দুর্নীতির ছাপ জীবনের প্রত্যেক স্তরে সমান তারে রেখায়িত হইতেছে।

সর্বশ্রেণীর চোরা কারবারী, গুণ্ডা ও বদমায়েশদের তেজারত নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতেছে। এই ত গেল এক দিকের কথা কিন্তু আর এক দিকে অগণিত জনগণের জীবন এই সমস্ত দুষ্কৃতকারীর পাল্লায় পড়িয়া অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। সম্ভ্রম, শীলতা, স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি দুষ্কৃতকারীদের পায়ের তলায় এমনভাবে পিষ্ট হইতেছে যে, আইন ও শৃঙ্খলার কর্ণধারগণ যদি কঠোর হস্তে অচিরে এই সমস্ত দুর্নীতি নিবারণ না করেন তাহা হইলে প্রকারান্তরে মানবতাকেই হত্যা করা হইবে।

আলোচনা
১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫২ (১৯৪৫)

পতিতা-সমস্যা

বাঙলা সরকার প্রাথমিক উদ্যম হিসাবে কলিকাতার বিভিন্ন পল্লী হইতে পেশাদার পতিতদের ঘাঁটিগুলি উঠাইয়া দিয়াছেন। বলাবাহুল্য ঐ আড্ডাগুলিই যৌন রোগের প্রধান কেন্দ্র, ঐ সমস্ত আড্ডা হইতেই সমাজদেহে যৌন রোগ ছড়াইয়া পড়ার বাধাহীন অবকাশ

www.pathagar.com

পাইয়াছিল। বাঙলা সরকার পুঞ্জীভূত পাপের এই বাসাগুলিকে ভাঙ্গিয়া সৎ উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সমারোহকর পতিতা উচ্ছেদের যবনিকা অন্তরালে বিরাট সমস্যা রহিয়াছে বাংলা সরকার কি ভাবে তাহার সমাধান করিবেন তাহাই হইবে আমাদের লক্ষ্য করিবার বিষয়। কেন যে সমস্ত পতিতা তাহাদের ঘাঁটি হইতে উঠিতে বাধ্য হইল। তাহাদের হালাল রুজীরোজগারে এবং বৈধ জীবন-যাত্রার জন্য এমন মহৎ কিছু করা হয় নাই যাহার জন্য তাহারা সৎ জীবন নির্বাহ করার সুযোগ পাইবে। সুতরাং বাধ্য হইয়াই মুখোশের অন্তরালে থাকিয়া ভদ্র ও অভদ্র পল্লীর বুকে বসিয়াই এই সময় পণ্যনারী তাহাদের ব্যবসা চালাইয়া যাইবে। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হইবে আগের চাইতেও অনেক বেশি। আমরা জানি ছাত্র-সমাজের মধ্যে কিভাবে এই ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। পতিতা-বৃত্তিই যে ইহার প্রায় ষোলআনা কারণ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পতিতাগণ যদি সমাজের মধ্যেই তাহাদের ব্যবসা আরম্ভ করে তাহা হইলে আমাদের ভবিষ্যৎ সমাজ স্বাস্থ্যহীন হইয়া কোন জাহান্নামে নামিয়া আসিবে তাহা ভাবিতেও ভয় হয়।

আলোচনা
১৮শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫২ (১৯৪৫)

ফিলিস্তিনী সমস্যা

ফেলিস্তিনও মধ্যপ্রাচ্যের আর একটি অগ্নিকুন্ড। প্রথম মহাযুদ্ধের পর বৃটেনে ইহুদী জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের মধ্যদিয়ে যে অশান্তির বীজ বপন করে, তা এখন ডালপালা মেলে বিরাট মহীরুহের আকার ধারণ করেছে। নানা অশান্তি ও আন্দোলনে ১৯৩৯ সালে বৃটিশ গভর্ণমেন্টের এক শ্বেতপত্রের বলে ফেলিস্তিনে ইহুদী আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়। এই শ্বেতপত্রে ঘোষণা করা হয় যে "মহামান্য সম্রাটের গভর্ণমেন্ট এক্ষণে সুস্পষ্টরূপে ঘোষণা করিতেছেন যে, ফেলিস্তিনকে ইহুদী রাষ্ট্রে পরিণত করার কোন নীতি তাঁদের নাই।"

কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হতে না হতে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, ফেলিস্তিনে যত অধিক সংখ্যায় সম্ভব ইহুদীদের স্থান দেওয়া হবে। প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের এই ঘোষণা সমগ্র আরব জগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। নবগঠিত আরব লীগের সেক্রেটারী জেনারেল স্পষ্ট ভাষায় বলে দিয়েছেন যে, ফেলিস্তিনে আরবদের অধিকার যদি হরণ করা হয়, তাহলে মোছলেম জগত তার বিরুদ্ধে জেহাদ করতেও পিছপাও হবে না। এই প্রসঙ্গে তিনি আরবদের প্রতি প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রুজভেল্ট তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পূর্বে ছোলতান এবনে ছউদের হাত ধরে বলেছিলেন যে, ফেলিস্তিনে আরবদের বিরুদ্ধে তিনি ইহুদীদের স্বার্থকে কিছুতেই সমর্থন করবেন না।

মোহাম্মদ মোদাব্বের : *যুদ্ধ ও শান্তি*
১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫২ (১৯৪৫)

www.pathagar.com

যুদ্ধের অবসান অশান্তির অবসান নয়

পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছিয়াও যখন যুদ্ধ বিরতির কথা অনেকের নিকট সদূর স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইতেছিল তখন দুইটি ঘটনায় যুদ্ধের মোড় ফিরিয়া গেল। আণবিক বোমা এবং রুশ আক্রমণের দুর্নিবার চাপে পড়িয়া জাপানকে এত তাড়াতাড়ি আত্মসমর্পণ করিতে হইল যাহা অনেকে ভাবিতেও পারে নাই।

প্রায় ছয় বৎসর কাল ধরিয়া যে যুদ্ধ আকাশ, মাটি ও দরিয়ার বুক মৃত্যু-মুখর করিয়া তুলিয়াছিল, পৃথিবীর প্রত্যেকটি জনপদে অশান্তির বন্যা আনিয়াছিল যুদ্ধ-বিরতির সঙ্গে সঙ্গেই সেই সকল স্থানে শান্তি, স্বাস্থ্য ও মানব-কল্যাণের মুক্তধারা নির্বাধ হইয়া নামিতে পারে নাই। অনেক পাপ, অনেক গলদ এই কয় বৎসরের ইতিহাসকে কলংকিত করিয়া রাখিয়াছে। যতদিন পর্যন্ত সেই সমস্ত অনাচার-অত্যাচার ও জুলুমের অবসান না করা হইবে ততদিন পর্যন্ত শান্তির স্বপ্ন শুধু দুরাশায় পর্যবসিত হইবে। সেই জন্যই এই মহাযুদ্ধের অবসান পৃথিবীব্যাপী অশান্তির অবসান নয়।

আলোচনা
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান
১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫২ (১৯৪৫)

আণবিক বোমা আবিষ্কার আতঙ্কের কারণ

যে ভয়াবহ বোমার কল্যাণে পৃথিবী যুদ্ধের দুঃস্বপ্ন হইতে মুক্তি পাইয়াছে তাহাকে বর্তমান যুদ্ধের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিলে অন্যায় হয় না। কিন্তু মানুষের চরম সংকটের বিষয় বিবেচনা করিয়া এই বোমা সম্পর্কে পৃথিবীব্যাপী একটি বিষণ্ন মনোভাব আতংক ও বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। অবশ্য এই বিতর্কের মূলে রহিয়াছে সেই চিরাচরিত সংশয় যা কোনদিন মারণাস্ত্রের আবিষ্কার বিশ্বাসের চোখে দেখিতে পারে নাই। ইহার সমর্থনে ঐতিহাসিক সত্যও রহিয়াছে প্রচুর। ঠিক এই কারণেই আণবিক বোমার আবিষ্কারে পৃথিবীর অধিকাংশ মানব-কল্যাণকামী ব্যক্তিই চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

আলোচনা
আণবিক বোমা
১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫২ (১৯৪৫)

মন্বন্তরক্লিষ্ট দেশ থেকে চাউল রফতানি

বাংলাদেশ হইতে চাউল রফতানির সংবাদ সরকার কর্তৃক স্বীকৃত হওয়ায় সারা দেশব্যাপী যে উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার কারণ সহজেই অনুমেয়। বস্তুতঃ মন্বন্তরক্লিষ্ট প্রদেশে এই সংবাদ বিভীষিকার মত এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে যাহা বর্ণনা করা কঠিন। মোট

www.pathagar.com

১৬৫০০ টন চাউল রফতানির ব্যবস্থা হইয়াছে, তাহার ৩০ হাজার টন ফেরৎ পাইবার ব্যবস্থাও নাকি সঙ্গে সঙ্গে করা হইয়াছে।

আলোচনা
বাংলাদেশ হইতে চাউল রফতানি
১৮শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫২ (১৯৪৫)

দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস

১৩৫০ সালে বাংলার বুকের উপর দিয়া দুর্ভিক্ষের যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে, যে দুর্ভিক্ষের ফলে লক্ষ লক্ষ নরনারী ও শিশু অনাহারে কুকুর বিড়ালের ন্যায় প্রাণ দিয়াছে, তার স্মৃতি সহজে ভুলিবার নয়। কলিকাতার রাজপথে ও নর্দমার পার্শ্বে যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখিয়াছি, তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। একদিকে রাজধানীর ধনিক সম্প্রদায়ের বিলাস-ব্যসন, অনাচার, অন্যদিকে অনাহারক্লিষ্ট নরনারী ও শিশুর কাতর ক্রন্দন, মর্মভেদী হাহাকার, অসহায় ফরিয়াদ। এ দৃশ্য বড়ই করুণ, বড় মর্মস্পর্শী। এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমাদের দরিদ্র মধ্যবিত্তদের চিত্তকে দোলা দিলেও কুকুর বিড়ালের জন্য যাদের গৃহে প্রতিদিন ঘি-ভাত ও মাংসের বরাদ্দ আছে, তাদের হৃদয়ে এতটুকু করুণার সঞ্চার হয় নাই। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে যারা লক্ষ লক্ষ মণ খাদ্যশষ্য মওজুদ রাখিয়াছিল, নিরন্ন ও বুভুক্ষুর দল এক ফোঁটা ফ্যান চাহিতে গিয়া তাদের দরজা হইতে না-উমেদ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। অর্থগৃধ্নু নরপিশাচের দল বাংলার সেই মর্মান্তিক দৃশ্য ও দুঃখ-দুর্দশার চিত্র নির্বিকার ঔদাসিন্যে প্রত্যক্ষ করিয়াছে এবং সময় সময় ফেরাউনী অহমিকায় মত্ত হইয়া অসহায় নরনারী বা শিশুর উপর দিয়া তাদের দানবীয় রথ হাঁকাইয়া বিজয়গর্বে চলিয়া গিয়াছে।

আবদুল হাই : *পঞ্চাশের* দুর্ভিক্ষ
১৯শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, পৌষ ১৩৫২ (১৯৪৫)

পাকিস্তান দাবি

ভারতীয় রাজনীতিক-ইতিহাসে পাকিস্তান-দাবি বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। পাকিস্তান-প্রস্তাব সর্বসাধারণ্যে প্রচারের পর হইতে নানামুখী বাদ-বিসংবাদ সারা ভারত-ভূমি ছাইয়া ফেলে। আজ সমস্ত বাধা-বিঘ্ন সম্পূর্ণ উৎসাদিত করিয়া সর্বভারতীয় মুছলমানের পাক-পাকিস্তান দাবি সার্থক হইতে চলিয়াছে। আসাম প্রাদেশিক লীগ-সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান পাকিস্তান-দাবি-বিরোধীদের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করিতে গিয়া বলিয়াছেন : 'ঈমান আর আদর্শ সম্বল করে আমরা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। একদিকে পাকিস্তানের আদর্শ-আরেক দিকে মুছলমান জাতির ঈমানের জোড় : এ দুটো মিলে আজ মুছলমানকে অজেয় করে তুলেছে। ... আজ মুছলমান এ-সত্য প্রমাণিত করবে, জগৎকে

www.pathagar.com

জানিয়ে দেবে যে, আমরা পাকিস্তান চাই—পাকিস্তান অর্জন করতে আমরা দৃঢ়সংকল্পবদ্ধ। বৃটিশ কিংবা হিন্দু কারুর গোলামীই আমরা বরদাশত করবো না'।

আলোচনা
পাকিস্তান : মোছলেম জাতি
১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫২ (১৯৪৬)

মুসলিম লীগ : বিজয়োৎসব

মোছলেম লীগের অভূতপূর্ব সাফল্যে এই উৎসব উদযাপিত হইয়াছে। পাকিস্তানের সর্বৈব অনুকূলে জনমতের প্রতিধ্বনি এইবার যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে মোছলেম-রাজনীতির ইতিহাসে তার আখ্যায়িকা বহুকাল উজ্জ্বল থাকিবে। লীগের দাবির প্রতি মোছলেম-ভারতের রায়-দানের এই পরিপূর্ণ নবোদ্যম দেখিয়া মোছলেম লীগ গভর্ণমেন্ট কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করিয়াছেন : 'আমাদের অভূতপূর্ব সাফল্যে আনন্দ প্রকাশের জন্যে আমি নিখিল ভারত মোছলেম লীগের সেক্রেটারিকে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক জেলা ও প্রাথমিক লীগ অফিসে (১৯৪৬-এর ১১ই জানুয়ারি শুক্রবার অনুষ্ঠিত) বিজয়োৎসব উদযাপন করতে বলেছি।'

আলোচনা
১১ই জানুয়ারি বিজয়োৎসব
১৯শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, মাঘ ১৩৫২ (১৯৪৬)

আণবিক বোমা ও হিরোশিমার ধ্বংসলীলা

১৯৪৫ সালের ৫ই আগষ্ট; "এনোলা তো" নামে বি-২৯ সুপার-ফরট্রেস বিমান থেকে জাপানের হিরোশিমা শহরে একটি আণবিক বোমা ফেলা হল। নিমেষের মধ্যে শহরটি হয়ে গেল নিশ্চিহ্ন—চারদিকে দশ মাইল পর্যন্ত বাড়িঘর ধ্বংস্তূপে পরিণত হল। মানুষ মারা গেল একসঙ্গে প্রায় দেড় লক্ষ; -আর সঙ্গে সঙ্গেই মরল না, অদৃশ্য পরমাণু শক্তির প্রভাবে মুহূর্তের মধ্যেই তাদের জীবনীশক্তি হ্রাস পেল—দেহের শ্বেত কণিকার প্রায় শতকরা ৮৬ ভাগই নষ্ট হয়ে গেল —তার পরে তারা মৃত্যুমুখে পতিত হল। প্রথম বোমা পড়বার কিছু পরে নাগাসাকি শহরের উপর ফাটল দ্বিতীয় বোমা,—এর ধ্বংসকার্য আরও ব্যাপক; আরও মারাত্মক। ধ্বংসের বিবরণ পড়ে সমগ্র জগৎ স্তম্ভিত হল।

আবদুল্লাহ আলমুতী শরফুদ্দীন : *পরমাণু শক্তির আবিষ্কার ও ব্যবহার*
১১শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫২ (১৯৪৬)

www.pathagar.com

কর বৃদ্ধির কষ্ট

সরকারের মহিমার সীমা পরিসীমা নেই। অভাব-অনটন সর্বব্যাপী আজো। আজো নূতন দুর্ভিক্ষের আশঙ্কা অত্যন্ত বেশি। আজো খাদ্যাভাব চরমেই রহিয়া গিয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রাদির বিলি-ব্যবস্থারও কুৎসিত অব্যবস্থা। মোটকথা সমগ্রভাবে এখন দেশে সম্পূর্ণ বিপর্যয় সংকুল অবস্থা, তখনো দেশের সরকারের নূতন-নূতন বিপর্যয়করী উদ্ভাবন-শক্তির প্রকাশ দেখিয়া আমাদের কেবলমাত্র স্তকিত-নীরব থাকিতে হইতেছে। -কলিকাতা গেজেটের এক বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত সরকারি বিজ্ঞপ্তি হইতে জানা যায় যে, বিক্রয়-কর তিন পয়সা হইতে এক আনায় বর্ধিত করা হইয়াছে। এই নূতন কর বৃদ্ধির অজুহাত দেখাইতে গিয়া সরকার যেসব যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে মুখ্য বিষয় একটি। তাহা সম্প্রতি ভারত গভর্ণমেন্ট অর্থনৈতিক আর সামাজিক পুনর্গঠনের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কার্যকরী করিবার পথে বাংলা অতিঅবশ্যই তাহার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালন করিবে। বাংলা ঘাটতি প্রদেশ। খাদ্যাভাব এখানে প্রচণ্ড। দুর্ভিক্ষের করালছায়া আবার পক্ষ বিস্তার করিয়াছে। আজ এই করবৃদ্ধির আয়োজন।—আমাদের হাসিবার দিন শেষ হইয়াছে, অনেক আগে : আজ নূতন করিয়া কোমর বাঁধিয়া কাঁদিবার পালা আসিলো কি।

আলোচনা
করবৃদ্ধি
১৯শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫২ (১৯৪৬)

জাগরণের বাণী

নূতন জাগরণ

আজ সর্বত্র মোছলেম মহিলাদের মধ্যে নূতন জাগরণ দেখা দিয়াছে। আমার ধারণা : মহিলাদের সাহায্য ব্যতীত কোন কওমই কোন উল্লেখযোগ্য কাজ করিতে পারে না। যদিও আপনারা পর্দানশীন, তবুও আজ আমি দেখিতে পাইতেছি যে, এই পর্দার অন্তরালেও আপনাদের কানে মোছলেম লীগের আওয়াজ পৌঁছিয়াছে। এখন আমি দেখিতে পাইতেছি যে, মুছলমান খাওআতীনগণও সকল বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পরিয়াছেন। ইহা সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। মুছলমানগণ বিগত দুইশত বৎসর পর্যন্ত খাবে-গফলতে বিভোর ছিল। মাত্র কয় বৎসরের মধ্যে মুছলমান পুরুষ-নারী প্রত্যেকের মনেই এই সঙ্কল্প জাগিয়াছে যে, তাহারা পাকিস্তান লাভ করিবেই।

পাকিস্তান ও এছলাম

পাকিস্তান ব্যতীত ভারতবর্ষের মুছলমান জাতি এবং এছলাম ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহাই একমাত্র পথ। ইহা ছাড়া ভারতীয় মুছলমানদের অন্য কোন পথ নাই।

www.pathagar.com

লড়াইয়ের আহ্বান

আমার বিশ্বাস, আমরা নিশ্চয়ই পাকিস্তান লাভ করিব। পাকিস্তান আমরা আদায় করিবই। ইহা আমাদের জীবন মরণ সমস্যা। ইহা একটি রাজনৈতিক লড়াই। প্রত্যেক মুছলমানের কর্তব্য, যথাসাধ্য এই লড়াইয়ে অংশগ্রহণ করা। আমাদিগকে আজ এই কথা ভুলিলে চলিবে না যে, আমরা পাকিস্তান লাভ করিয়া কি করিয়া তাহা রক্ষা করিব। আমাদিগকে স্থির-নিশ্চিত জানিয়া রাখিতে হইবে যে, পাকিস্তান রক্ষা করার জন্য সবচেয়ে জরুরি বস্তু হইতেছে : শিক্ষা। শিক্ষাই জাতীয় বুনিয়াদ।

আলোচনা
মহিলা-সভায় কায়েদে-আজম
১৯শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫২ (১৯৪৬)

মুসলিম সমাজে নারী শিক্ষার অভাব

আসল কথা—আজকের দিনে পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গিনী তাঁরা হোন বা না হোন সমাজের অর্দ্ধাঙ্গ তাঁরা নিশ্চয়ই। মুসলিম ভারতে সমাজের সেই অর্দ্ধাঙ্গের শিক্ষার কি প্রকারের ব্যবস্থা ছিল তাই বলবো। শিক্ষা-ব্যতিরেকে মানুষের কল্যাণ নেই, অন্ধকার থেকে মুক্তিও নেই, স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করা ত দূরের কথা তা পাওয়ার অধিকারও তার নেই। ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আমরা যে শিক্ষা পেয়েছি এবং দিচ্ছি তা কোনদিনই সমষ্টিকে পূর্ণ মানুষ কোরে তোলেনি এবং এ শিক্ষা যদি এমনিভাবেই এদেশের লোককে দেওয়া হতে থাকে তাহলে কোনদিনই তা বহুর কল্যাণে আসবে না। যে স্বল্পসংখ্যক ধনী ও মধ্যবিত্ত সন্তান এ শিক্ষা পেলো তার কয়জনই বা সত্যকার জ্ঞানপুষ্ট মানুষ হতে পারলো? এত বছরের শিক্ষার যে প্রবহমান ধারায় দেশের তথাকথিত শিক্ষাপ্রাপ্ত পুরুষগুলোই মানুষ হতে পারলো না, সেই শিক্ষাই যদি স্ত্রীজাতিকে দেওয়া হয়, তাদের কোন কল্যাণে আসবে? তবু তাঁদের যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা যতদিন না হচ্ছে ততদিন যদি তাঁরা প্রচলিত শিক্ষালাভ থেকে একেবারেই বঞ্চিত থাকেন তবে এ জাতির অন্ধকার অমানিশার ঘোর কোনদিনই কাটবে না। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত শিক্ষিত পুরুষের সংখ্যাই বা ক'জন? সে পরিমাণে শিক্ষিতা স্ত্রীলোকের সংখ্যা আরও নগণ্য।

অধ্যাপক মুহম্মদ আবদুল হাই এম. এ. : *মুসলিম ভারতে স্ত্রীশিক্ষা*
১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (১৯৪৬)

তরুণের দায়িত্ব

দুদিন পরে গণ-সংগ্রামের নেতৃত্ব তরুণদেরই নিতে হবে—কিন্তু গণমনকে সেই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করতে না পারলে আমাদের নেতৃত্বের কথা উঠতেই পারে না। মুসলমান তরুণদের মধ্যে কতো বিচিত্র রকম প্রতিভা রয়েছে। এদের মধ্যে কেউ হয়তো

www.pathagar.com

রাজনীতিক—কেউ সাহিত্যিক—কেউ গায়ক বা শিল্পী—কেউবা হয়তো সামাজিক কর্মী। প্রত্যেক তরুণের বিশিষ্ট যোগ্যতা—বিভিন্ন শিল্পীর সমবেত প্রয়াস—আজ আসন্ন পাকিস্তান-বিপ্লবের জন্য গণমনকে প্রস্তুত করতে নিয়োজিত হোক, এই কামনাই আমরা করবো।

শাহেদ আলী : *তরুণ মুসলিমের ভূমিকা*
১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (১৯৪৬)

পল্লী কবির কর্তব্য

গ্রাম্য কবি এবং জারি-লেখকদের আমাদের খোঁজ নিতে হবে। তাঁদের বুঝাতে হবে আজকার কর্তব্য কী? পাকিস্তান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলের মুক্তি কামনা করছে—সেই মুক্তির বন্দনা আমরা গ্রাম্য কবির মুখেও শুনতে পাবো—যদি আমরা তাদেরকে বুঝাতে পারি... কী আমাদের দেশ চায় ... কোন্ পথে আমাদের মুক্তি। তার বাউল আর ভাটিয়ালী সুরে আজ শুধু সন্ধ্যার ঘুমেলা ভাব আর আত্মকেন্দ্রিক উদাসীনতাই প্রকাশ পাবে না ... বিদ্রোহের ভৈরবীতে আজ ধ্বনিত হবে জনগণের অন্তরের আকাঙ্ক্ষার সুর... পাকিস্তানের বন্দনার ভেতর দিয়ে উচ্ছসিত হয়ে উঠবে আজাদীর তীব্র আকাঙ্ক্ষা।

শাহেদ আলী : *তরুণ মুসলিমের ভূমিকা*
১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (১৯৪৬)

সমাজকর্মীর কর্তব্য

আমাদের সামাজিক কর্মীদেরও তাদের দায়িত্ব ভুলে গেলে চলবে না। সমাজের দোষ-ত্রুটি, অবনতির প্রতি নজর রাখা যেমন দরকার...তেমনি তাদের প্রয়োজন বিপর্যয়ের দিনে...দুর্ভিক্ষ, বন্যা, মহামারী যখন জনগণের মধ্যে তাণ্ডব লীলা চালাতে থাকে—তখনো আমাদের কর্মীদের আমরা দেখতে চাই সকলের আগে। নিঃস্বার্থ সেবাপরায়ণতার ভেতর দিয়ে জনগণের চিত্ত জয় করতে হবে। এবং আমাদের এই সেবাপরায়ণতার মধ্যে দিয়েই জনগণ বুঝতে পারবে—পাকিস্তানে আমরা কী চাই? কাদের জন্য চাই। তাছাড়া, তাদের বুঝাতে হবে... কেন দুর্ভিক্ষ হলো, ... বন্যা হলো ...কেন মহামারী তাণ্ডব নৃত্য করে চলে গেলো তাদের ওপর দিয়ে। এসব রুখবার দায়িত্ব কার? গোলামের দেশ আমাদের ... এদেশের উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা শ্বেতাংগ সরকার করেনি... সাম্রাজ্যবাদী শয়তানরা আজো প্রতি একশত গাঁয়েও একটা হাসপাতাল গড়বার চেষ্টা করেনি... বাঁধ তৈরি করা, জল সেচনের ব্যবস্থা...চাষে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগ ইত্যাদি গুরত্বপূর্ণ কৃষি ব্যবস্থার কোনোটাই তারা করতে রাজী নয়। কৃষকের গরুর পালে যখন মড়ক লেগে গ্রামকে গ্রাম সাফ হয়ে যায়... যখন দেশের সমস্ত শকুন আর হাড়গিলা মাসের পর মাস ধরে মেহমানী

www.pathagar.com

খেয়েও নিঃশেষ করতে পারে না...তখনো কৃষকের চোখের জল ফেলা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। কারণ, শহরে যদিও বাবুদের দুধালো গাভীর জন্যে গো-চিকিৎসালয় আছে... কৃষিসর্বস্ব হাজার হাজার গ্রামের মধ্যে একটা পশু-চিকিৎসালয়ও খুঁজে পাওয়া যাবে না,... অথচ, এখন পর্যন্ত গো-মহিষই আমাদের দেশে কৃষির শ্রেষ্ঠতম সম্বল। পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে এসব সমস্যারই মীমাংসা হবে সকলের আগে।

শাহেদ আলী : *তরুণ মুসলিমের ভূমিকা*
১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (১৯৪৬)

দেশবন্ধু সি. আর. দাশ

পণ্ডিত জহরলাল কখনো-কখনো মুছলমানদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে প্রচণ্ড উৎসাহী ও দাতাকর্ণ হইয়া উঠেন। সময়ে আবার যে-কে সেইরূপ। পণ্ডিতজী আবার গর্জন করিয়া তড়পাইয়া উঠেন। মিঃ প্যাটেল তো ইংরেজদের বলিয়াই রাখিয়াছেন, তোমরা সব ছাড়িয়া ছুড়িয়া চলিয়া যাও, আমরা তাহার পর কি করিয়া মুছলমান-সাধারণকে শায়েস্তা করিতে হয়, তাহা দেখিব। 'জয় হিন্দের' যুগে স্বাধীন ভারতে মুছলমানদের উপর কেমন কর্তৃত্ব চলিবে তাহার উদাহরণ এখনই পাওয়া গিয়াছে। 'জয় হিন্দের' জন্মস্থান সিঙ্গাপুরের সংবাদেই প্রকাশ : 'সিঙ্গাপুরে জয়-হিন্দ না বলায় কয়েক স্থানে মুছলমানদের প্রহার করা হইয়াছে'। -শুধু তাহাই নহে। পুলিশের সংবাদে প্রকাশ পাইয়াছে যে, কতোকগুলি টাইপ করা কাগজপত্র উদ্ধার করা হইয়াছে। উহাতে মুছলমানদের পাকিস্তান-ধ্বনি বন্ধ করিতে আদেশ দেওয়া হইয়াছে এবং নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে যে, রাজনৈতিক-ধ্বনি হিসাবে একমাত্র 'জয় হিন্দ' ব্যবহার করিতে হইবে। দেশবন্ধু সি. আর. দাশের কথা মনে পড়িতেছে। দেশের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনায় এই মহান পুরুষ হিন্দু-মুছলমানের সম্মিলিত সৌহার্দ সহযোগিতা জীবনের শ্রেষ্ঠ কামনার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ১৯২৩-এ, দীর্ঘ তেইশ বছর পূর্বে হিন্দু-মুছলমানে চুক্তিবদ্ধ হওয়ার কথা উঠে।

আলোচনা
মুছলমান ও হিন্দু
১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩ (১৯৪৬)

শিক্ষা পরিবেশ

সৈয়দ আহমদ খান বলিতেন, ভারতের মুছলমানদের জীবন শিক্ষায় ভরপুর করিয়া তুলিতে হইবে। সত্যকার শিক্ষা-জীবন-গঠনে সহায়তা করে। জীবন-গঠনে যেমন শিক্ষার প্রয়োজন, জাতি গঠনেও তেমনি তা প্রয়োজনীয়। তিনি বলিয়াছেন, রাজনীতিতে শ্রেষ্ঠ স্থান পাইবার অধিকারীও সত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সৌন্দর্যবান সম্প্রদায়। গোখলের কথা মনে পড়ে,

www.pathagar.com

তিনি বলিতেন : সবই মিলিবে। তবে, মিলিবে শিক্ষার দৌলতে। বাস্তবমুখীন জ্ঞানে ও শিক্ষায়; দেশপ্রেম আর সত্যকার রাজনীতিজ্ঞানে। ইকবাল বলিতেন : রাজনীতির ভিতর দিয়াই জাতির জাগরণ। সত্যকার দাবি চাই। সত্যকার শিক্ষা চাই। জাতির অগ্রগতি কেহ রোধ করিতে পারে না।—আজ মোছলেম বাংলার অগ্রগতির দিন। দিকে দিকে নূতনের সাড়া। অভূতপূর্ব যুগ-চেতনা প্রত্যেকটি মুছলমানের মনে। আমরা আজ রাজনীতির এমনি স্রোতের আবর্তে প্রতিমুহূর্তে ডুবিতেছি-জাগিতেছি যাহা বাংলার রাজনৈতিক-ইতিহাসে নূতন অধ্যায়ের যোজনা করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। মনে রাখিতে হইবে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক-জ্ঞানই জাতির সর্বপ্রকার ক্রমোন্নতির ভিত্তি সুদৃঢ় করিতে পারে না। রাজনীতির জয়ে অধিকার আসে। অধিকার নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার অধিকারী সেই আত্মা, যে আত্মা নির্মল শিক্ষায় উদ্ভাসিত। রাজনীতির আগের ধাপে শিক্ষা। এই শিক্ষার দিক দিয়া আমরা বাংলার মুছলমানরা পশ্চাৎপদ। এখনো সময় আছে। যুগের ইঙ্গিত যেন আমরা হেলায় নষ্ট না করি, সেদিকে জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার সময় আসিয়া পড়িয়াছে।

আলোচনা
জাতীয় জাগরণে শিক্ষা
১৯শ বর্ষ, ১০শ সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৩ (১৯৪৬)

খাদ্য সংকট

দেশের খাদ্য সংকটের সংবাদ পরিবেশন করিলাম। আরেকটি নূতন খবর আছে : বাংলা-আসাম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বন্যার ঢল দুর্বার বেগে আঘাত করিয়াছে। দেশের ক্ষেতে ও খামারে যাহা কিছু শস্য-সামগ্রী ছিলো, বন্যার পানিতে তাহাও নিঃশেষিত হইলো। এইবার আসিবে মহামারী। তাহারও উপরে রহিয়াছে সরকারের অব্যবস্থা। চাউলের অভাবে মানুষ যেখানে একটানা অনশনে কাল কাটাইতেছে...স্তূপ-স্তূপ চাউল নির্বিঘ্নে সেইখান হইতেই চালান যাইতেছে। ইহাও সংবাদ। আমরা ভাবিতেছি, চাউল রফতানি হয় কী করিয়া? দেশবাসী কি করিতেছে? গতবারের মন্বন্তর তাহাদের কিছুই কি শিখায় নাই? তিলতিল করিয়া মৃত্যু বরণ করার সত্যতার কোনো হেতু আছে ?

আলোচনা
দেশবাসী ও দুর্ভিক্ষ
১৯শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৩৫৩ (১৯৪৬)

নারীর সাধনা

বিশ্ব জুড়ে আজ যে আলোড়ন উঠেছে তাতে আমাদের মুসলিম জগৎকে জাগাবার জন্য আমাদের প্রত্যেক মুসলিম নর নারীরই সচেষ্ট হওয়া যে একান্ত কর্তব্য একথা আশা করি

www.pathagar.com

সকলেই স্বীকার করবেন। নারীর সাধনা ছাড়া যে এ কর্তব্য-কার্যে কদাপি সফলতা লাভ করা যাবে না—তা উপলব্ধি করার সময়ও আজ এসে উপস্থিত হয়েছে। তাই আমাদের মুসলিম জগৎকে জাগাতে গিয়ে প্রথমেই যে আজ আমাদের নারীশিক্ষা কতদূর প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, তা-কি আমাদের সমঝদার মুসলমান ভাইরা আজও এই দুর্দিনেও নেহায়েৎ না বুঝারই ভান করে থাকবেন? নিছক নিজ নিজ স্বার্থ নিয়ে কি তাঁরা এখনও পাগল থাকতে চান? সমাজের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া কি তাঁরা আদৌ প্রয়োজন মনে করবেন না?

চিন্তাধারা
বেগম আহসানউন্নিসা : *নারীশিক্ষা*
১৯শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ভাদ্র ১৩৫৩ (১৯৪৬)

উন্নতির অন্তরায়

গোটা ভারতবর্ষ থেকে পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাসাধন এবং পাকিস্তানকে সার্বভৌম ক্ষমতাযুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা মুসলিম ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিণত হলেও স্বাধীনতালাভের পর এই নয়ারাষ্ট্রের উন্নতিসাধন যে কিভাবে সম্ভব হবে, তা নিয়ে ভারতীয় মুসলমানদের মনে কম আলোড়নের সৃষ্টি করে নি। জনসাধারণের অত্যধিক চাপ, খনিজ সম্পদের অভাব, শিল্পোন্নতিসাধনের প্রয়োজনীয়তা উপরন্তু আহার্যাভাব ভারতবর্ষের উৎকট সমস্যায় পরিণত। দেশ, তথা, দেশবাসীর উন্নতিবিধানের দাবিও ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে কম উঠছে না। তবুও উন্নতির ধারা এ পর্যন্ত মন্থর ও মৃদুগতিই থেকে গেছে। রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বাকবিতণ্ডাই অবিশ্যি এর মূল কারণ।

ডাঃ মোহাম্মদ ইউনুস পিএইচ. ডি : *পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ*
২০শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৩ (১৯৪৬)

মুসলিম রাষ্ট্র

মোছলেম লীগের প্রস্তাবে ভারতের উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব অংশে মোছলেম রাষ্ট্র গঠনের দাবি করা হয়েছে। এ সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে, উত্তর পশ্চিম ভারত বলতে বিপুল মোছলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পাঞ্জাব এবং বিপুল মোছলেম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশীয় রাজ্য কাশ্মীর ও জম্মুকে ধরা হবে। বৃটিশ ভারতের চারিটি প্রদেশের ক্ষুদ্রতর দেশীয় রাজ্যগুলিকে এর সাথে যুক্ত করা যাক। সম্পূর্ণ অঞ্চলটিকে এখন একটি মোছলেম রাষ্ট্রে পরিণত করা যায়।

আবার আমাদের এই বিরাট উপ-মহাদেশের পূর্বাংশে অবস্থিত বাংলা-আসামের অধিবাসীদের অধিকাংশ মোছলেম। এই দুটি বৃটিশ ভারতীয় প্রদেশের মধ্যে মণিপুর ও আর

www.pathagar.com

কয়েকটি ছোটখাট দেশীয় রাজ্য এর সাথে যুক্ত হোলে সম্পূর্ণ অঞ্চলটি দিয়ে আর একটি বিরাট মোছলেম রাষ্ট্র গঠিত হয়। এই দুটি মোছলেম রাষ্ট্র ভারতীয় মুছলমানের পূর্ণ সন্তোষ বিধান করবে? বস্তুতঃ লাহোরে মোছলেম লীগ অধিবেশনের প্রস্তাবে এই রাষ্ট্রদ্বয়েরই পরিকল্পনা রয়েছে, পূর্ব অঞ্চলকে বলা যায় পূর্ব মোছলেমস্তান আর পশ্চিম অঞ্চলটিকে বলা যায় পশ্চিম মোছলেমস্তান।

সংকলন
বালসুন্দর নায়কর বি-এ, এল-টি : *ভারত বিভাগের রাজনৈতিক যুক্তি*
২০শ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ফাল্গুন ১৩৫৩ (১৯৪৭)

জাতীয়তাবাদের দোষত্রুটি

বিগত পঞ্চাশ বৎসরের এই তথাকথিত "জাতীয়তাবাদী রাজনীতি" আজ ভারতবর্ষের দরিদ্র জনসাধারণের জীবন, ধন, মান, শান্তি পদে পদে বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছে। আজ জনসাধারণকে অতর্কিত আঘাতজনিত মৃত্যুর জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতে হয়। এতদোপরি এই "জাতীয়তাবাদী" রাজনীতি আজ পর্যন্ত ভারতের জনসাধারণের সম্মুখে এমন কোনও কল্যাণকর কার্যসূচি রাখেন নাই, যেজন্য এই রাজনীতিকে প্রশংসা করা যায়। এই রাজনীতি আজ ধনিক-বণিকের কুক্ষিগত হইয়া গিয়াছে এবং এই রাজনীতি চোরা বাজারে কারবারের অংশীদারকে সচিব হিসাবে গ্রহণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই। এই রাজনীতি ক্ষমতা পাইয়াই শ্রমিকদিগকে শাঁসাইয়াছে।

জাতীয়তাবাদ ইতিহাসের এক অধ্যায় এবং প্রত্যেক দেশেই কোনো না কোনো সময়ে দেখা দিবেই, একথা স্বীকার করিলেও, যে-জাতীয়তাবাদ দেশের অভ্যন্তরে সামাজিক গণতান্ত্রিকতার সৃষ্টি করে না, দেশ হইতে ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কার দূর করে না, সেরূপ জাতীয়তাবাদকে সমর্থন করা যায় না কিছুতেই। তাহা ছাড়া ভারতের এই রাজনীতিকে সত্যিকার জাতীয়তাবাদী রাজনীতি হিসাবেও অভিহিত করা যায় না, যদি তাহাই হইত তবে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের প্রচেষ্টায় ইহা নিশ্চয়ই ধর্মকে রাজনীতি হইতে পৃথক করিতে সমর্থ হইত এবং ভারতের সর্বসাধারণকে সত্যিকার একটা জাতিতে—যে জাতিতে বর্ণভেদ নাই, খাওয়া দাওয়া চলাফেরা ও বিবাহ ও অন্যান্য ক্রিয়াকর্মে বাধাবিঘ্ন নাই তাহাতে পরিণত করিতে সমর্থ হইত। ইউরোপে শ্রেণী আছে : শোষক ও শোষিত। এবং ইহাদের মধ্যে সামাজিক ক্রিয়াকর্ম খুব কমই হয় তাহা জানা কথা, কিন্তু তাহার কারণ ধর্ম বা বর্ণভেদ নহে—তাহার কারণ আর্থিক।

আবু জাফর শামসুদ্দীন : *জাতীয়তাবাদের দার্শনিক ভিত্তি*
২০শ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, চৈত্র ১৩৫৩ (১৯৪৭)

www.pathagar.com

ধর্মের অঙ্গীকার

মনে হতে পারে, ভবিষ্যতে ধর্ম হয়ত লুপ্ত হয়ে যাবে। ধর্মের মধ্যে চিরন্তনতা যদি না থাকে, ধর্ম যদি সমাজের কোন অবস্থাবিশেষের পরিবর্তন সাধনের মাত্র যন্ত্রস্বরূপ হয়, তবে বলতে হবে, তার যেটুকু কাজ সেটুকু শেষ হয়ে গেলেই তার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে। ধর্মের কোনো অস্তিত্ব আর থাকবে না।

কিন্তু ইতিহাসে দেখা গেছে, ধর্মের অনেক উত্থান পতন অতীতে হয়ে গেছে। ধর্ম যখন লুপ্ত হয়ে গেছে, মানব সমাজ যখন নষ্ট হয়ে গেছে, তখনই নতুন কোনো ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর মানব জাতির এমনি এক লাখ চব্বিশ হাজার ভ্রষ্টতম স্তরে আবির্ভূত হয়েছেন।

মোহাম্মদ আবদুল হক : *প্রগতি ও ধর্ম*
২০শ বর্ষ, ৭ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫৪ (১৯৪৭)

স্বাধীনতা দ্বারপ্রান্তে

বড়লাটের ৩রা জুনের ঘোষণার পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনের কাজ অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তান ডোমিনিয়নকে বাস্তবে রূপায়িত করার প্রচেষ্টাও দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও দফতর, তাদের চাকুরিয়া সম্পত্তি এবং পাওনা-দেনার ভাগ বাটোয়ার কাজ ঝড়ের বেগে অগ্রসর হইতেছে। লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন বিদ্যুতগতিতে সকল কাজ আগস্ট মাসের পূর্বে সম্পন্ন করিয়া দুইটি ডোমিনিয়ন চালু করার জন্য জোর তাগিদ দিয়া চলিয়াছেন। পার্লামেন্টে এজন্য আগস্ট মাসেই একটা আইন পাশ হইয়া যাইবে, আশা করা যায় এবং সাময়িকভাবে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান ডোমিনিয়নের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হইবে।

আলোচনা
পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের বুনিয়াদ
২০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৪ (১৯৪৭)

বিভক্ত বাংলা

বর্ণহিন্দুদের জেদের ফলে এবং লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের ঘোষণানুসারে 'আন্দাজী' বিভাগ অনুযায়ী মুছলমান সংখ্যাগুরু ও মুছলমান সংখ্যালঘু জেলাগুলির প্রতিনিধিরা ২০শে জুন তারিখে যে প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন তার ফলে বাংলাদেশ বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যুক্ত বৈঠকে অধিক সংখ্যক সদস্য অখণ্ড বাংলার পাকিস্তানভুক্তি সমর্থন করিয়াছিলেন কিন্তু বিভক্ত

www.pathagar.com

আইন সভায় কংগ্রেসী জেদের জয় হইয়াছে। কংগ্রেসী পশ্চিম বাংলাকে সেখানে খণ্ডিত করিয়া লওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে সম্মত হইয়াছেন।

আলোচনা
বাংলা ও পাঞ্জাব বিভাগ
২০শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যা, আষাঢ় ১৩৫৪ (১৯৪৭)

বাংলা ভাষা প্রশ্ন

পশ্চিমবঙ্গের সরকারি দফতরের প্রধান কর্মসচিব সম্প্রতি এক হুকুমনামায় বাংলা ভাষাকে সরকারি দফতরী ভাষা রূপে ব্যবহার করিবার আদেশ দিয়াছেন। সরকারি নথিপত্রসমূহে অতঃপর ইংরাজি ভাষায় মন্তব্য ও নির্দেশ লেখা যাইবে না। অবশ্য যেখানে বাংলা ভাষায় সম্যক ভাব প্রকাশিত হইবে না সেখানে ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কর্মসচিব শুধু হুকুমই দেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে নিজে তাঁহার নথিপত্রে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় নোট দিয়াছেন এবং তাঁহার পরিচয় হিসাবে চিফ একসিকিউটিভ অফিসার না লিখিয়া বাংলা অক্ষরে প্রধান কর্মসচিব লিখিয়াছেন। কর্মসচিবের এই কর্মপন্থা সর্বজন প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। বাংলা ভাষাকে ইহাতে যে তাহার বহুদিনের অস্বীকৃত মর্যাদাকে পূর্ণ সম্মান দেওয়া হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ। এইরূপে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ভাষার ইতিহাসে এক গৌরবের যুগের সূচনা করিয়াছেন। আমরা আশা করি, পূর্বপাকিস্তান সরকারও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া আমাদের মাতৃভাষা বাংলাকে সরকারি ভাষার সম্মান দান করিয়া তথাকার সাড়ে চার কোটি বাংলা ভাষা-ভাষীর নাগরিক জীবনের প্রতি সম্মান দেখাইবেন এবং বাংলা ভাষার গৌরবময় এক অধ্যায়ের সূচনা করিবেন।

আলোচনা
দফতরী ভাষারূপে বাংলা
২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪ (১৯৪৭)

স্বাধীনতার পরও অসম্প্রীতি

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নিকট হইতে বিনা রক্তক্ষয়ে যেরূপ ঐতিহাসিক উপায়ে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করিয়াছি, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত নাই। আমরা ভাবিয়াছিলাম অতঃপর আমরা ভারতের এই দুই বৃহৎ রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন করিয়া জগতে আর এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করিব। কিন্তু আজও সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি এবং মনুষত্ববোধ বর্জিত দাঙ্গা-হাঙ্গামা ভারত ও পাকিস্তানের জনসাধারণের নৈতিক অধঃপতন ঘটাইতেছে। উভয় রাষ্ট্র হইতে হিন্দু ও মুসলিমগণ যেভাবে স্থান পরিবর্তন করিতেছে তাহাতে উভয় রাষ্ট্রে ব্যাপক অর্থনৈতিক সংকটের কারণ ঘটিয়াছে। ইতিমধ্যেই পাকিস্তানের রেল বিভাগে আশাতীত

www.pathagar.com

ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এইরূপ চলিতে থাকিলে শীঘ্রই উভয় রাষ্ট্রে বর্তমান খাদ্য সংকটের মাত্রা অপরিসীমভাবে বাড়িয়া যাইবে। অথচ উভয় রাষ্ট্রের কর্ণধারদের আকুল আবেদনেও কোন ফল হইতেছে না।

আলোচনা
সাম্প্রদায়িক অসম্প্রীতি
২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪ (১৯৪৭)

অখণ্ড ভারত

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষ দুইটি পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। একটি হিন্দু সংখ্যাগুরু, অন্যটি মুসলিম সংখ্যাগুরু, অন্যটি মুসলিম সংখ্যাগুরু। যুগযুগান্তরের হিন্দু-মুসলিম রাজনৈতিক অনৈক্যের দ্বন্দ্ব আজ এই পথে আসিয়া মিটিয়া গিয়াছে বলিয়াই আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু যাঁহারা অখণ্ড ভারতের স্বাপ্নিক, তাঁহারা আজ বাহিরে আইনসঙ্গতভাবে বর্তমান ব্যবস্থা মানিয়া লইলেও অন্তরে যেন কিছুতেই ইহাকে সায় দিতে পরিতেছেন না। কেহ কেহ প্রকাশ্যেই বলিয়া বেড়াইতেছেন যে—ভারত আবার নিশ্চয়ই এক হইবে এবং ইহাকে এক করাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠ সাধনা। ভারত ডোমিনিয়নের নেতৃস্থানীয়দের মুখেই এইরূপ অনিষ্টকর উক্তি শোনা যাইতেছে।

আলোচনা
গোড়ায় গলদ
২০শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা, আশ্বিন ১৩৫৪ (১৯৪৭)

সম্পাদকের নিবেদন

আজ হইতে ২৫ বৎসর পূর্বে মোছলেম বাংলার জ্ঞান-বিশ্বাস, সংস্কার-ঐতিহ্য এবং তাহার সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে আরম্ভ করিয়া দেওয়া হয় একটা গুরুতর রকমের সাংস্কৃতিক অভিযান। সুযোগ ও সুসময় মনে করিয়া মোছলেম সমাজের পঞ্চম বাহিনীও এই অভিযানের সহায়তা করার জন্য পূর্ণ উদ্যমে কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পড়েন। বিশ বৎসর পূর্বে মাসিক মোহাম্মদীর আবির্ভাব হইয়াছিল, প্রধানতঃ এই অভিযানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইবার জন্য।

গত দশ বৎসর এদিক হইতে অবসর নিয়া আমাকে নিজের সম্পূর্ণ সময় ও শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছে রাজনীতি ক্ষেত্রে। বার্ধক্য, স্বাস্থ্যভঙ্গ ও পারিবারিক শোক সন্তাপ সত্ত্বেও এক্ষেত্রে, আল্লার দেওয়া তওফিক অনুসারে, যতটা পারিয়াছি, নিজের কর্তব্য পালন করিয়া আসিয়াছি।

আজ আবার ডাক আসিয়াছে—মুক্ত ভারতে মুক্ত এছলামকে প্রতিষ্ঠা করার একটা অভূতপূর্ব সুযোগ ও সম্ভাবনা আজ আমাদিগের সম্মুখে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। এই

www.pathagar.com

সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে হইবে, এই সম্ভাবনাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়া নিতে হইবে। পাকিস্তানের বহু প্রকার ভিত্তি সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বহু জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। হওয়ার দরকারও আছে খুবই। কিন্তু দুঃখের সহিত ইহাও বলিতে হইতেছে যে, এগুলি আনুসঙ্গিক উপকরণ হইলেও, পাকিস্তানের মৌলিক ভিত্তি ইহার কোনটাই নয়। আমার জ্ঞান-বিশ্বাস মতে পাকিস্তানের মূল ভিত্তি হইতেছে মনস্তাত্ত্বিক। মুছলমানের মন ও মস্তিষ্কে এমন একটা পুলক, এমন একটা প্রেরণা এবং এমন একটা ভাবাবেগ জাগাইয়া তুলিতে হইবে, যাহার অপরিহার্য নির্দেশে বাংলা মুছলমান আদর্শ সাধনার জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করিতে স্বতঃপ্রবৃত্তভাবে প্রস্তুত হইয়া যাইবে—মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি বলিতে মোটামুটিভাবে এই জিনিসটাকেই বুঝাইতে চাহিয়াছি।

এই সাধনায় জাতির অগ্রনায়কগণের সহায়তা করার জন্য মাসিক মোহাম্মদীকে অবলম্বন করিয়া আবার এই কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আশা ছিল, নূতন বৎসরের প্রথম সংখ্যা হইতেই এই সাধনার সূচনা করা সম্ভব হইবে। তাহা সম্ভব হইল না। আশা করিতেছি, মাসিক মোহাম্মদীর এই বৎসরের দ্বিতীয় সংখ্যা, দারুল-হিজরাৎ জাহাঙ্গীরাবাদ হইতে প্রকাশিত হইতে পারিবে।

মোহাম্মদী
২১শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, কার্তিক ১৩৫৪ (১৯৪৭)

বিনীত
মোহাম্মদ আকরম খাঁ

www.pathagar.com